সংকোচের বিহ্বলতা

আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া
১৮৪৯-১৯০৫

গোলাম মুরশিদ



সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমী ॥ ১৯৮৫

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

আমার স্ত্রী
এলিজাকে

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থটি আমার *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905* গ্রন্থের অনুবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশ তাঁদের মহিলাদের কিভাবে আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং মহিলারা কিভাবে তার প্রতি সাড়া দেন এ গ্রন্থ তা বিশ্লেষণ করার বিনীত প্রযত্ন মাত্র। পুরুষদের পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে মহিলারা কতোটা আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, এ গ্রন্থে তা-ও নিরূপণ করার প্রয়াস পেয়েছি। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারাকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ সংস্কারক 'পদদলিত' মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে কী অবদান রেখেছিলেন, সে বিষয়ে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, এই সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলারা নিজেরা কতোটা সাড়া দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান গ্রন্থে এ যাবৎ অবহেলিত এই দিকটির প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাকে দু বছরের জন্যে একটি পোস্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ ফেলোশিপ (১৯৭৮-৮০) এবং বিদেশ থেকে গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে একটি অনুদান দেওয়ার জন্যে আমি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়ের নির্দেশনায় আমি এই গবেষণা করি। আমার চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ করার জন্যে তিনি যে সাহায্য করেন তার জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমি প্রফেসর ডেভিড কফ, ডক্টর মেরিয়ান ম্যাডার্ন, ডক্টর এলেন ম্যাক-ইউয়ান এবং ডক্টর মেরেডিথ বোর্থউইকের কাছে বিশেষ ঋণী। এঁরা আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে রচনাটি উন্নত করার জন্যে নানা উপদেশ দেন। জেমস ওয়াইজ, প্যাট্রিক উল্ফ্, প্রফেসর জোন হোসেন, প্রফেসর আলী আনোয়ার এবং মিসেস পলেন রুলের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

মূল ইংরেজি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য করেছিলো। এজন্যে আমি এ ফাউণ্ডেশনের নিকট খুবই ঋণী। এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে ফাউণ্ডেশনের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি মিজ এ. জার্মেইন খুব আগ্রহ দেখান।

পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ লেখার এবং বর্তমান গ্রন্থ রচনার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আমি দীর্ঘকাল আমার কন্যা অমিতা গার্গী, পুত্র অন্তু পাণিনি এবং স্ত্রী এলিজার প্রতি যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতে পারি নি। তা ছাড়া, এলিজা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেন। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আমার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ডক্টর গোলাম কিবরিয়া এবং জনাব গোলাম কবির আমাকে অনেক সহায়তা দান করেন। তাঁদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের জন্যে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর রমাপ্রসাদ দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মনজুরে মওলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ বুকইন্টারন্যাশনালের মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ প্রধান। এঁদের উৎসাহ ছাড়া অনুবাদের নীরস কাজ শেষ করতে পারতাম না। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

অনুবাদকালে বন্ধুবর হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা এবং আবদুল হালিমের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন শ্রীস্বরোচিষ সরকার। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় — গোলাম মুরশিদ

সূচীপত্র

সূচনা

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যদি বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, তা হলে তা উনবিংশ শতাব্দী। তাঁদের কৌতূহলের সুনির্দিষ্ট এলাকা হলো বাংলার জাগরণ। আলোচ্য শতাব্দীর গোড়া থেকে আধুনিকায়নের যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়[১] এবং পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদের যে-উদ্ভব ঘটে[২]—উভয়ই এই জাগরণের অঙ্গ। এই জাগরণকে 'রেনেইসান্স'

১. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য: Asiatic Society, **Renascent Bengal** (Calcutta: Asiatic Society, 1972); N.S. Bose, **The Indian Awakening and Bengal** (3rd ed.; Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1969); K K. Datta, **Renaissance Nationalism and Social Change in Modern India** (Calcutta : Bookland Private Ltd., 1965); A.C. Gupta (ed), **Studies in the Bengal Renaissance** (Jadavpur: National Council of Education, 1958); D. Kopf, **British Orientalism and the Bengal Ranaissance** (Berkeley: University of California Press, 1969); D Kopf, **The Brahmo Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind** (Princeton: Princeton University Press, 1979); R.C. Majumdar, A.K. Majumdar & D. K. Ghosh, **British Paramountcy and Indian Renaissance** (Bombay: Bharatiya Bidya Bhaban, 1965); A. Mukherjee, **Reform and Regeneration in Bengal** (Calcutta: Rabindra-Bharati University, 1968); A. Poddar, **Renaissance in Bengal : Search for Identity** (Simla : Indian Institute of Advanced Study, 1977); S. Sarkar, **Bengal Renaissance and Other Essays** (New Delhi : People's Publishing House, 1970); এবং বিনয় ঘোষ, **বাংলার নবজাগৃতি** (কলকাতা: ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৪৮)।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত জীবনীমূলক গ্রন্থেও বঙ্গীয় 'রেনেইসান্স' সংক্রান্ত বহু তথ্য আছে: শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ** (কলকাতা: এস কে লাহিড়ী, ১৯০৪); বিনয় ঘোষ, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** (প্রথম ওরিএণ্ট লংম্যান সং; কলকাতা: ওরিএণ্ট লংম্যান, ১৯৭৩); এবং N. Mukherji, **A Bengal Zamindar: Jaykrisna Mukherji of Uttarpara and His Times** (Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1974).

২. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিকাশ নিয়ে রচিত সব গ্রন্থেই এ বিষয়ে কম বেশি আলোচনা আছে—বিশেষ করে যে সব গ্রন্থে এ দেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ নিয়ে আলোচনা আছে,

বলা যায় কি না, তাও একটি প্রবল বিতর্কের বিষয়। উনিশ শতকীয় বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও অনেকগুলি গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে।[৩] বঙ্গদেশীয় সমাজ বহু স্তরে বিন্যস্ত হওয়ায়, আধুনিকায়ন সম্পর্কেই হোক অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কেই হোক,[৪] সব গবেষণাই অবশ্য একদেশ-দর্শী হয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভদ্রলোক[৫] বলে পরিচিত একটি শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশই ঊনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার প্রধান বিষয়বস্তুরূপে গণ্য হয়েছে। এই এলিট শ্রেণী

সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে অধিকতর উপযোগী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য: S N. Banerjea, **A Nation in the Making** (London : Oxford University Press, 1925); L. A Gordon, **Bengal: The Nationalist Movement** (New York: Columbia University Press, 1974); and B.B. Majumdar, **History of Political Thought from Rammohan to Dayananda** (Calcutta ; Calcutta University, 1934).

৩. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য : A.F.S. Ahmed, **Social Ideas and Social Change in Bengal** (Leiden : E J. Brill, 1965); R.C. Majumder, **Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century** (Calcutta: Firma K.L Mukhopadhya, 1960) S Sastri, **History of the Brahmo Samaj** (2nd ed.; Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj, 1974); P Sinha, **Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History** (Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1965); নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী** (তৃতীয় সং; কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭১); বিনয় ঘোষ, **বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা** (কলকাতা: লেখক, ১৯৬৮)।

৪. বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ওপর তেমন কোনো ভালো গবেষণা হয়নি। এর মধ্যে B.B. Misra রচিত **Indian Middle Classes** (London : London Univ. Press, 1961) গ্রন্থখানিই সর্বোত্তম। আরো দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ রচিত **বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা** এবং N.K. Sinha's **The Economic History of Bengal**, Vol. 3 (Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1970).

৫. 'ভদ্রলোক' শব্দের বিস্তৃত সংজ্ঞার জন্যে দ্রষ্টব্য: J.H. Broomfield, **Elite Conflict in a Plural Society** (Berkeley: Univ. of California Press 1968), pp. 5-7.

অনিল শীলও তাঁর **The Emergence of Indian Nationalism** (Reprint; Cambridge Univ. Press, 1970) গ্রন্থে এবং ডেভিড কফ্ তাঁর **The Brahmo Samaj and The Shaping of Modern Indian Mind** গ্রন্থে ব্যাপকভাবে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানসহ শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থে 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

স্থানগত দিক দিয়ে ছিলেন মূলত কলকাতাবাসী, ধর্মীয় দিক দিয়ে হিন্দু, এবং বর্ণের দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য। এই তিন বর্ণের লোকেরা ছিলেন তখনকার বঙ্গদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৫ ভাগ।[৬] কলকাতাবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের সংখ্যা অবশ্যই অনেক কম ছিলো এবং, অনুমান করি, তাঁরা মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগও ছিলেন না। সুতরাং ভদ্রলোক সম্পর্কিত ইতিহাস-রচনা সম্ভবত সেকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হলেও, এ ইতিহাস আংশিক মাত্র। ঐতিহাসিকগণ শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর অর্ধেক অর্থাৎ তাঁদের মহিলাদের কথা বিবেচনা না করায় এ ইতিহাস আরো বেশি মাত্রায় একপেশে হয়েছে। বঙ্গীয় জাগরণের ইতিহাস আরো ভালোভাবে বোঝার জন্যে পরিবর্তনশীল বাঙালী সমাজে মহিলাদের ভূমিকা কী ছিলো, তা অধ্যয়ন আবশ্যক বলে গণ্য হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে বাঙালী মহিলাদের সম্পর্কে যে-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি প্রধানত দ্বৈতীয়িক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে যেন-তেন প্রকারে রচিত। এগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ মহিলাদের দ্বারাই লিখিত। মহিলাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রধান প্রধান কী কী ঘটনা ঘটে—এ সব গ্রন্থে তার উল্লেখ এবং আলোচনা আছে।[৭] কখন এবং কেমন করে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয় এবং তা ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, কখন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট এবং চিকিৎসক উত্তীর্ণ হন, মহিলারা প্রথম কখন তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন, কখন থেকে পর্দা প্রথা

৬. **Report on the Census of India, 1901,** Vol. VI, pt. 1 (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902), p. 459

৭. এ সব গ্রন্থের মধ্যে আছে যোগেশচন্দ্র বাগলের **জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী** (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫৪) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বঙ্গসাহিত্যে নারী** (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫১) ও **সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী** (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫১): চিত্রা দেবের **ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল** (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০); প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলির **বাংলার নারী জাগরণ** (কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৪৬) ; J. C. Bagal's **Women's Education in Eastern India** (Calcutta: World Press, 1956) ; U. Chakravarty's, **Condition of Bengali Women Around the Second Half of the Nineteenth Century** (Calcutta : Author, 1963) ; M. Raoy's, **Bengali Women** (Chicago : Chicago University Press, 1975) ; S. Sen Gupta's **A Study of Women in Bengal** (Calcutta : Indian Publications, 1970) ; and M.M. Urquhart's **Women of Bengal** (London : Y.M.C.A , 1925) ।

ভাঙার চেষ্টা চলে এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচ্য গ্রন্থ সমূহে সংকলিত হয়েছে। এ যাবৎকাল অজ্ঞাত এই তথ্যগুলি উদ্‌ঘাটনের এবং জনসমক্ষে তুলে ধরার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বলা বাহুল্য, এর ফলে মহিলাদের ইতিহাস বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু পুরুষ ঐতিহাসিকদের মতো মহিলা ঐতিহাসিকগণও এই ঘটনাসমূহের এমন বিশ্লেষণ করেছেন যেন এ সব ঘটনা ইতিহাসের সাধারণ ধারা থেকে আলাদাভাবে ঘটেছে এবং এগুলি যেন পুরুষ নির্ধারিত জগতের দ্বারা প্রভাবিত নয় অথবা সে জগৎকে প্রভাবিত করেনি। তা ছাড়া, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ সব গ্রন্থে আদৌ উত্থাপিত হয়নি : যেমন, মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদা কিভাবে পাল্টে গেলো, বিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাব কেমন করে ধীরে ধীরে নতুন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মহিলাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিকাশের ফলে পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কিভাবে প্রভাবিত হলো। যা-ই হোক কি পটভূমিকায় পুরুষরা প্রথমে মহিলাদের আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং পরে মহিলাদেরকে কিঞ্চিৎ অবাধ্য এবং অ-রক্ষণশীল হতে দেখে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন—এ জানা না-থাকলে উনিশ শতকীয় বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বোঝা অসম্ভব না-হলেও, শক্ত হয়। সর্বোপরি, এ-ও জানা আবশ্যক মহিলারা নিজেরা আধুনিকতার প্রতি কিভাবে সাড়া দেন এবং নিজেদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয়।

বঙ্গদেশে সামগ্রিকভাবে যে-আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ছিলো, তার অভিঘাতে মহিলারা কতোখানি আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, তা নিরূপণ করা বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ মহিলারা পরিবারে তাঁদের ন্যূনতম মর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন কি না অথবা তাঁদের কর্ম এবং সামাজিক-ভূমিকাকে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বিবেচনা করতেন কি না, সে প্রশ্ন নিয়ে নয়, ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষদের একাংশ উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলেন মেয়েদের খানিকটা প্রাথমিক শিক্ষা দান করে তাঁদের কিঞ্চিৎ আধুনিক করে তোলার জন্যে। কারণ, তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, মেয়েদের অবস্থা উন্নত না-করে সমাজকে এগিয়ে নেওয়া অথবা নিজেদের জীবনকে পরিপর্ণতা দান করা অসম্ভব।

সুতরাং তাঁরা এমন একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা একই সঙ্গে মহিলাদের উন্নত করবে এবং তাঁদের নিজেদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করবে। এই আন্দোলন এবং সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য উপাদান মিলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদার এমন কি নিজেদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটায়। পুরুষদের উদ্যোগে যে আন্দোলন সূচিত হয়, তা বিংশ শতাব্দীতে এসে কী করে feminist আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, তার প্রতি

অঙ্গুলি নির্দেশ করাও এ গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। অংশত মহিলাদের আচার-ব্যবহারের আদর্শ এবং মূল্যবোধ পাল্টে যাওয়ার জন্যে, এবং অংশত জাতীয়তাবোধের উদ্ভবহেতু পুরুষরা কিভাবে তাঁদেরই প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন, তা-ও আলেচিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত মহিলারা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সাড়া দেন, বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে আছে এই প্রসঙ্গ।

এ গ্রন্থে যেভাবে 'আধুনিকায়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা অনেকের মনঃপূত না-ও হতে পারে। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক আধুনিকতার যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা বিভিন্ন রকমের।—বস্তুত কোন দুটি সংজ্ঞাই সমার্থক নয়। **Modernization : The Dynamics of Growth** গ্রন্থে (M. Weiner সম্পাদিত) যেমন C. Black, D. McClelland, E. Shils, A. Inkeles এবং অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকগণ আধুনিকায়নের যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য দুস্তর। তাঁরা, প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকায়নের দিকে তাকিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। Cyril Black-এর কাছে নতুন জ্ঞানের বিকাশ এবং মানুষের কাজে তার প্রয়োগই আধুনিকতার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য। David Mc Clelland-এর কাছে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হলো আত্মনির্ভরতা ও অর্জনমুখিতা (achievement orientation)। Edward Shils কলাকৌশলের বিকাশ এবং সৃজনশীলতার ওপর অধিকতর মূল্য আরোপ করেন। Alex Inkeles সকল আধুনিক মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করেন : ১. নতুন ধারণা গ্রহণ করার এবং নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করার প্রবণতা ; ২. মত প্রকাশের ইচ্ছা ; ৩. অতীতের পরিবর্তে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ ; ৪. সময়নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ ; ৫. পরিকল্পনা, সংগঠন ও দক্ষতার প্রতি অধিকতর আগ্রহ ; ৬. পৃথিবীকে পরিমাপযোগ্য গণ্য করার প্রবণতা ; ৭. বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় আস্থা ; এবং ৮. প্রত্যেকের জন্যে সুবিচারে বিশ্বাস। তদুপরি, ধরা যাক, আধুনিকতা সম্পর্কে একজন অর্থনীতিকের ধারণা এবং একজন শিক্ষাবিদের ধারণায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমি অবশ্য ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যে-পরিবর্তন হয, তা বোঝাতেই আধুনিকায়ন শব্দটি ব্যবহার করেছি।

পূর্বোক্ত মহিলাদের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাকে, অন্তত Inkeles-এর সংজ্ঞানুসারে, আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অন্য সমাজতাত্ত্বিকরা যথাযথ অর্থে এই পরিবর্তনকে আধুনিকতা বলে স্বীকার করুন অথবা নাই করুন, এই পরিবর্তনের পরিমাণ ছিলো যথেষ্ট। বাংলা সাহিত্য ও

সাময়িকপত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মহিলাদের যে-পরিচয় বিধৃত আছে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কিছু মহিলার যে-পরিচয় পাই—তাঁদের জীবনধারা, ব্যবহারের ধরণ, মূল্যবোধ ও নিজেদের সম্পর্কিত ধারণা এতো আলাদা যে, এ পরিবর্তন অনুধাবন করা শক্ত। শিক্ষায় ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীতে; স্বামী, শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় এবং পরিবারের প্রতি তাঁদের মনোভাবে; গৃহকর্ম ও সামাজিক ভূমিকায় আধুনিকারা সেকালের ঐতিহ্যিক মহিলাদের থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছিলেন। নতুন ধারণার আলোকে এই মহিলারা তাঁদের জীবনের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁদের নিজেদের একটা মতামত ছিলো এবং সে মতামত প্রকাশ করতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন,—এই মনোভাবই তাঁদের ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছিলো। আমি এই পরিবর্তন বোঝাতেই 'আধুনিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

আমার কাছে 'emancipation' বা 'মুক্তি' শব্দটি যথাযথ মনে হয়নি; কারণ, গোড়াতে এ শব্দের অর্থ যা-ই থাক না কেন, এ শব্দের দ্বারা এখন মহিলাদের এমন এক ধরণের আধুনিকতা বোঝায়, যা এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী মহিলারা আয়ত্ত করতে পারেননি। সন্দেহ হয়, এখনো তাঁরা সে পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন কি না। তবে মুষ্টিমেয় বাঙালী মহিলা থাকতে পারেন, যাঁদের সত্যিকার অর্থে মুক্ত বা emancipated বলা যেতে পারে। 'Liberation' বললে অনেক ফেমিনিষ্ট আরো বেশি বৈপ্লবিক পরিবর্তন বোঝেন। দীর্ঘদিন ধরে আধুনিকতার সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও, শিক্ষিত বাঙালী মহিলারা এখনো কোনো কোনো বিষয়ে বেশ ঐতিহ্যিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তাঁরা লৈঙ্গিক দিক দিয়ে (Sexually) 'লিবারেটেড' নন। এমন কি, তাঁদের বেশির ভাগ এমন একটি ধারণা সম্পর্কেও বোধ হয় সচেতন নন। এখনো বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনতা খুবই অসাধারণ বলে বিবেচিত হয়। তাঁদের যৌন অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও গুণগত মান যেমনই হোক না কেন, বিবাহিত মহিলারা সম্ভবত তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অন্তত, তাঁরা অন্যের কাছে অভিযোগও করেন না অথবা অন্যত্র তৃপ্তিও খোঁজেন না। খুব সম্ভব তাঁরা এ-ও জানেন না যে, অধিকতর আনন্দদায়ক যৌন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। সুতরাং এ কথা বললে ভুল হবে না যে 'sexual liberation' দূরে থাক, তাঁরা তাঁদের যৌন অধিকার সম্পর্কেই সচেতন নন। অনুরূপভাবে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত অধিকার-তত্ত্ব পুরুষদের সমান হলেও, তাঁরা কুচিৎ এ সব অধিকার প্রয়োগ করেন। এ কারণে বাঙালী মহিলাদের পরিবর্তন বোঝানোর জন্যে 'emancipation' এবং 'liberation' শব্দ দুটির কোনোটিই আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। তাই এ দুটির বদলে

'আধুনিকায়ন' শব্দটিকেই বেছে নিয়েছি। তা ছাড়া, এ শব্দটি আপেক্ষিক এবং এর অভিধাও ব্যাপক।

প্রাচীন সংস্কৃত উপকরণ থেকে মনে হয়, কিছু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহিলা সে কালে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া, হিন্দু শাস্ত্রেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো বিধান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পূর্ববর্তীকালে যদি নিষিদ্ধ না-ও হয়ে থাকে, অন্তত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে গোপনে বাড়ির মেয়েদের খানিকটা শিক্ষা দিতে শুরু করলেও, ১৮৪৯ সালের আগে পর্যন্ত ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের জন্যে কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং এর পরেও, পর্দা প্রথা অমান্য করে কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো যায় কি না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভদ্রলোকরা বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিলেন। এ জন্যেই ১৮৭০-এর দশকের আগে মেয়েদের যথেষ্ট সংখ্যক রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি। যে-মহিলারা ১৮৬০-এর দশকে তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন অন্তঃপুরে শিক্ষিত। খুবই লাজুক এবং আত্মবিশ্বাসহীন, এই মহিলারা তাঁদের রচনা প্রকাশ করা দূরে থাক, তাঁদের মতামতই প্রকাশ করতেন না। কিন্তু বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩-১৯২৩), অবলাবান্ধব (১৮৬৯-৭৩), বঙ্গমহিলা (১৮৭৫-৭৭), ভারতী (১৮৭৭-১৯২৬) এবং মেয়েদের রচনা নিয়মিত প্রকাশ করতো এমন অন্যান্য সাময়িকপত্র লেখা প্রকাশের জন্যে মহিলাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। তা ছাড়া, কৈলাসবাসিনী দেবীর মতো ব্যতিক্রমও ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণার উৎস ছিলেন তাঁর স্বামী, যিনি ছিলেন একাধারে মুদ্রক ও প্রকাশক।

যতোদিন মহিলাদের রচনা প্রকাশিত হয়নি, ততোদিন পর্যন্ত দ্বৈতীয়িক সূত্র ছাড়া জানার উপায় ছিলো না যে, পরিবার ও সমাজে নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মহিলাদের মনোভাব কেমন ছিলো অথবা তাঁদের উন্নতির জন্যে ভদ্রলোকেরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রতি তাঁদের সাড়া কেমন ছিলো। অবশ্য আলোচ্য রচনাসমূহে তাঁদের যে-মনোভাব প্রকাশ পায়, তা কতোটা সত্যিকারভাবে তাঁদের নিজেদের অকৃত্রিম মনোভাব তা স্পষ্ট নয়। এমন কি, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে লিখলেও, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা দেননি অথবা অনেক ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেননি। অন্তত, মহিলাদের এ সব রচনা যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষ-নির্ধারিত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অধিকতর আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন এবং নিজেদের

অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ করতে শুরু করেন। আলোচ্য কালের শেষ দিকের রচনায় তাঁদের মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তন কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে।

উনিশ শতকীয় বাঙালি মহিলাদের বিষয়ে বেশি সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। রামমোহন রায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডিঙ্ক ওআটার কীটন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, প্রমুখ পুরুষ মানুষ স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও বিস্তারের জন্যে কী করেন, ঐ সব গ্রন্থে প্রধানত তারই বিবরণ আছে। প্রধান প্রধান লেখিকা সম্পর্কেও কোনো কোনো গ্রন্থে জোড়াতালি দেওয়া বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। এ সব গ্রন্থ মূলত দ্বৈতীয়িক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে রচিত কেন এবং এতে মহিলাদের রচনা কেন ব্যবহৃত হয়নি, সে কারণ অজ্ঞাত। তবে আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার প্রতি মহিলাদের সাড়া নিরূপণ করতে গিয়ে আমার স্বভাবতই আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত মহিলাদের রচনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এ রচনা-সমূহের একটা বড়ো অংশই আমি খুঁজে বের করি এবং প্রথম বারের মতো ব্যবহার করি।

মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদা, বিশেষত তাঁদের আত্ম-উপলব্ধি, কেমন ছিলো, তা বোঝার জন্যে এ রচনাগুলি আমাকে অধিকতর সুযোগ দিলেও, এগুলির একটা সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। যে-সাময়িকপত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে-মহিলারা এ সব পত্রিকায় লিখতেন, উভয়েরই ব্রাহ্ম-চরিত্র অভ্রান্ত। বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, পরিচারিকা, ভারতী, ভারতী ও বালক, দাসী এবং অন্তঃপুর পত্রিকার সম্পাদকরা ছিলেন রীতিমতো দীক্ষিত ব্রাহ্ম; আর বঙ্গমহিলার সম্পাদক ভুবনমোহন সরকার ছিলেন ব্রাহ্ম-প্রভাবিত। যে-মহিলারা এই পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করেন, তাঁদের প্রধান ভাগই ছিলেন ব্রাহ্ম। কিছু ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো ইংরেজি শিক্ষিত এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হিন্দু। সুতরাং এ-গ্রন্থে বস্তুত ভদ্রলোক পরিবারের, বিশেষত ব্রাহ্ম পরিবারের মহিলাদের কথাই আলোচিত হয়েছে। কিছু ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলা এবং তাহেরননেসা ও রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের মতো স্বল্প সংখ্যক মুসলমান মহিলার মতামতও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ গ্রন্থে যাঁদের রূপান্তর বিশ্লেষিত হয়েছে, তাঁরা বাঙালী মহিলাদের একটি ক্ষুদ্রাংশ—হয়তো সমগ্র মহিলাদের শতকরা একভাগও নয়। তবে বিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মহিলা আধুনিক হয়ে উঠলেও, তাঁরা পূর্ববর্তী মহিলাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেন এবং পূর্ববর্তী মহিলাদের আদর্শে জীবন গড়ে তোলেন। তা ছাড়া, তাঁদের আধুনিকতার চরিত্রও ভিন্ন প্রকৃতির নয়। অতএব এর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এ-গ্রন্থ বাঙালী মহিলাদের বৃহত্তর একটি অংশের পরিবর্তনের ওপর আলোকপাতে সহায়তা করতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবার ও মহিলাদের সম্পর্কে যে-নতুন সচেতনতা জন্ম নেয়, প্রথম অধ্যায়ে আমি তা খুঁজে বের করার প্রয়াস পেয়েছি। এই সচেতনতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভদ্রলোকরা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করেন। কারণ একেই তাঁরা মহিলাদের আধুনিকায়নের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করেন। এর ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে-দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এ দ্বন্দ্ব যেভাবে মহিলাদের মনোভাবে প্রতিফলিত হয় – তাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে পুরুষরা প্রথমে অন্তঃপুরের বন্দীদশা থেকে মহিলাদের মুক্ত করেন এবং তারপর তাঁদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিজড়িত করেন। স্বল্প সংখ্যক মহিলাকে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করার অনুমতিও তাঁরা দিয়েছিলেন। ঐতিহ্যিক সমাজ এই প্রচেষ্টায় তীব্র বাধা দান করে। ঐতিহ্যবাদীরা মনে করেন, আধুনিকায়নের ফলে মহিলারা তাঁদের নারীসুলভ গুণাবলী হারিয়ে ফেলছিলেন। আধুনিকায়নকে তাঁরা পাশ্চাত্যায়ন ছাড়া আব কিছুই বিবেচনা করতে পারেন নি। পর্দা প্রথার কড়াকড়ি হ্রাস পাওয়ায় এবং অন্তঃপুরের চতুর্দেয়ালের বাইরে নতুন ভূমিকা পালন করতে পারায়, মহিলারা সীমিত পরিমাণ 'মুক্তি' বা 'emancipation'-এর আস্বাদ লাভ করেন।

পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা কিভাবে উন্নীত হয় এবং তাঁদের কর্ম ও সামাজিক-ভূমিকা এবং আত্ম-উপলব্ধি কিভাবে বিবর্তিত হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের সাড়া নিরূপণ করা হয়েছে। উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন যেহেতু আধুনিকতার কারণ ও ফলাফল উভয়ই, সেহেতু সমাজ সংস্কারের প্রতি মহিলাদের মনোভাব কেমন ছিলো তাঁর মূল্যায়ন না-করে সামগ্রীকভাবে আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব বোঝা যায় না। জাতীয়তাবোধের উম্মেষের ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কেমন করে ভাঁটা লাগে এবং পরোক্ষভাবে মহিলাদের অগ্রগতিকেও ব্যাহত করে, তা-ও এ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। তদুপরি সকল অধ্যায়েই পুরুষদেব দ্বারা প্রবর্তিত নারীমুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, বিশেষত, একটা পর্যায়ের পর মহিলাদের অগ্রগতিতে পুরুষদের প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। সবশেষে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, সকল বাধা সত্ত্বেও, মহিলারা কেমন করে ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে আধুনিক হতে থাকেন।

প্রথম অধ্যায়

"অন্ধজনে দেহো আলো" : বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা এবং শিক্ষার প্রতি ভদ্রমহিলাদের মনোভাব

ইংরেজদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বঙ্গ দেশ বিদেশী শাসনাধীন ছিলো। সুতরাং বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের যদি কোনো অভিনবত্ব থেকে থাকে তা হলে তা বৈদেশিক বলে নয়; সে অভিনবত্ব ছিলো নতুন ধারণার। সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম আমলে যে-দেশের পরিবর্তন হয় সামান্যই এবং চিন্তার ক্ষেত্রে যে-দেশের মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, সেই বঙ্গদেশই ইংরেজ আমলে দ্রুতগতিতে আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে কেবল যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাই নয়; এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণী অথবা ভদ্রলোকদের মনোভাবই যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে যায়। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী ভদ্রলোকরা তাঁদের দৃঢ়মূল মূল্যবোধ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন সংজ্ঞা দান করেন।

নীচের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, পরিবার ও মহিলাদের সম্পর্কে ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রথমে নতুন একটি সচেতনতা কী করে গড়ে ওঠে এবং পরে শিক্ষা দানের মাধ্যমে কিভাবে তাঁরা তাঁদের মহিলাদের অংশত আধুনিক করে তোলার প্রয়াস পান। মহিলারা পুরুষদের এই প্রয়াসের প্রতি কিভাবে সাড়া দেন এবং তাঁদের মূল্যবোধ, মনোভাব এমন কি তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের ধারণা কেমন করে বিবর্তিত হয়, তা-ও এ আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য।

নতুন একটি সচেতনতার উন্মেষ

১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর বঙ্গদেশে, বিশেষত কলকাতা এবং তার আশেপাশে, ধীর গতিতে কিন্তু যথেষ্ট মাত্রায় সমাজ-পরিবর্তন আরম্ভ হয়। মুসলমান সুলতান ও সুবেহদারগণের আমলেও মুরশিদাবাদ এবং ঢাকার মতো কয়েকটি শহর বঙ্গদেশে ছিলো। তবে এ শহরগুলির চরিত্র ছিলো প্রধানত প্রশাসনিক। কলকাতায় যে-ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য জমে ওঠে, এ সব শহরে তার অস্তিত্ব ছিলো না। তা ছাড়া, কলকাতা ও তার আশেপাশে ধীরে ধীরে বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে, কিছু শিল্পও গড়ে ওঠে। এ সবের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন

পল্লীসমাজ থেকে বিপুল সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী মানুষ কলকাতায় এসে ভিড় জমায়। ১৮২০-এর দশকের নাম-করা সাহিত্যিক ও সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতাকে সম্পদ ও সৌভাগ্যের কেন্দ্র অথবা কমলালয় বলে অভিহিত করেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে পৈত্রিক ভিটায় ফিরে যাওয়ার আশা নিয়ে যে-বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী অজানা শহর কলকাতায় আসতেন, তাঁদের সুবিধে হবে মনে করে ভবানীচরণ তাঁর **কলিকাতা কমলালয়** (১৮২৩) গ্রন্থে কলকাতা ও সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহারের বিস্তৃত পরিচয় দেন।[১]

কলকাতায় আগত এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক আদান-প্রদানের ফলস্বরূপ কিছু সমাজ-সচলতা এবং ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তদুপরি, আরো কিছু কারণ নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রভাবিত না-করে পারেনি। খৃস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের প্রয়াস এমনি একটি কারণ। সেকালের শিক্ষিত বাঙালীরা ধর্মান্তর করার এই প্রয়াসের নিন্দা করেন; কিন্তু মিশনারিগণ দেশীয় ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমালোচনা করেন, তার আংশিক সত্যতা অস্বীকার করতে পারেননি। তা ছাড়া, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের প্রাচীন ভারতের 'গৌরবোজ্জ্বল অতীত'কে আবিষ্কারের চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সমকালীন ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাচীন রীতিনীতির বর্বর বিকার বলে আখ্যাদানও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সচেতন করে তোলে। অতঃপর এই ব্যক্তিরা নিজেদের সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ এবং পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[২] সর্বোপরি ব্রিটিশ এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া বহু শতাব্দী ধরে শোষিত বাঙালীর মূল্যবোধে গভীর পরিবর্তনের সূচনা করে। এই মিথস্ক্রিয়ায় অবশ্য শাসকদের সংস্কৃতি হিসেবে ব্রিটিশ সংস্কৃতিই প্রাধান্য লাভ করে।[৩]

১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, **কলিকাতা কমলালয়** (১৮২৩), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (পঞ্চম সং: কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০), গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৪।

কমলালয় কথাটির মানে ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী যেখানে বাস করেন।

কলিকাতা কমলালয় জনপ্রিয় হয়েছিলো কিনা জানা নেই। কিন্তু এরূপ একটি গ্রন্থের প্রকাশ প্রমাণ করে যে, কলকাতা সম্পর্কে অজ্ঞ প্রচুর লোক তখন কলকাতায় আসছিলেন।

2 D. Kopf, **British Orientalism and Bengal Renaissance**, pp. 22-42, 178-214.

3. J. N. Gray, "Bengal and Britain : Culture Contact and the Reinterpretation of Hinduism in the Nineteenth Century" in **Aspects of**

আলোচ্যকালে বাঙালী সমাজে মহিলাদের মর্যাদা ছিলো খুবই নগণ্য। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় বলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।[৪] পুরুষদের তুলনায় মহিলারা নিকৃষ্ট—এ বিশ্বাস অবশ্য তখন কেবল ভারতবর্ষে নয়, কম বেশি সারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয় ছিলো। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রাশিয়ার একটি সরকারী প্রতিবেদনে মহিলাদের নিকৃষ্টতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় এভাবে :

> প্রকৃতিই নিম্নশ্রেণীর জীব হিসেবে মহিলাদেরকে অপরের ওপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছে। অতএব মহিলাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শাসন করা নয়, স্বামীর বশ্যতা স্বীকারই তাঁদের জন্যে নিয়তি-নির্ধারিত। তাঁদের আরো মনে রাখতে হবে যে, পরিবারের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেই তাঁরা পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে ও তার বাইরে সুখী হতে পারেন এবং ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেন।[৫]

বাঙালী মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ছিলো এমন-ই বা এর চেয়েও অবনত।

সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হিসেবে সেকালের বঙ্গদেশে মুষ্টিমেয় মহিলাই ছিলেন শিক্ষিত। এরা ছিলেন হয় জমিদার, নয়তো সন্তানহীন বিধবা। মহিলা-জমিদারগণ লেখাপড়া শিখতেন হিসেব রাখার উদ্দেশ্যে এবং সন্তানহীন বিধবারা শিখতেন ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্যে।[৬] মহিলাদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা পুরুষরা আদৌ স্বীকার করতেন না। তার চেয়েও খারাপ কথা, তাঁরা মনে করতেন মহিলাদের আদপেই কোনো বোধশক্তি নেই এবং সে কারণে তাঁদের লেখাপড়া শেখানো

Bengali History and Society, ed. by R.V.M. Baumer (Hawaii : The Univ Press of Hawaii, 1975). pp 93 103.

৪. **রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি**, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত (কলকাতা : আদি ব্রাহ্ম সমাজ, ১৮৭৩-৭৪), পৃ. ২০৫।

5. Quoted in R T. Evans, **The Feminists : Women's Emancipation Movement in Europe, America and Australia** (London ; Croom Helm. 1977), p. 114

6. W. Adam, **Report on the State of Education in Bengal 1835 & 1838**, ed. by A. Basu (Reprint ; Calcutta : Calcutta University, 1941), p. 147 ; কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি** (কলকাতা : গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৫) পৃ. ১৩-১৪।

অসম্ভব।[৭] মহিলাদের বোধশক্তি সম্পর্কে এ ধরণের হীন ধারণা অবশ্য কিছু অসাধারণ ছিলো না। ইংলণ্ডে মেয়েদের এতোটা নিকৃষ্ট বিবেচনা না-করলেও, জনপ্রিয় মত খুব উঁচু ছিলো না। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ তারিখের *The Times* পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে তখনকার একজন নাম-করা শল্য চিকিৎসক Sir A. E. Wright দাবি করেন যে, মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম এবং তাঁদের মানসচিত্র বিকৃত।[৮] ইংলণ্ডের মতো সুশিক্ষিত এবং উদারনীতিতে বিশ্বাসী সমাজ যদি মেয়েদের সম্পর্কে এমন হীন ধারণা পোষণ করতে পারে, তবে সেকালে বঙ্গদেশে মেয়েদের সম্পকে শ্রদ্ধাবোধ কতোটা থাকা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে মহিলাদের বিষয়ে একটি সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। সমাজের এ অংশ মহিলাদের হীন দশার ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। য়োরোপীয় মহিলাদের সঙ্গে দেশীয় মহিলাদের তুলনা করে এঁরা দেখলেন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। যে-দুটি পার্থক্য প্রথমেই তাঁদের চোখে পড়লো, তা হলো, য়োরোপীয় মহিলারা বাঙালী মহিলাদের মতো অন্তঃপুরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী নয় অথবা জ্ঞানের আলোক থেকেও বঞ্চিত নয়। বরং, তাঁরা দেখলেন, ইংরেজ মহিলাদের কেবল পুঁথিগত লেখপড়াই শেখানো হয় না, নাচ-গানের মতো সাংস্কৃতিক গুণাবলী আয়ত্ত করতেও উৎসাহিত করা হয়। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা কম এমন জনমত প্রচলিত থাকলেও, ইংরেজ সমাজে এ কথা কেউ মনে করতেন না যে, মহিলাদের সাধারণ লেখাপড়াও শেখানো যাবে না। এভাবে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে তুলনা করে এ দেশের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা মহিলাদের হীন দশা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হন এবং তাঁদের সমুন্নতির জন্যে প্রথমে সসঙ্কোচে একটি আন্দোলন শুরু করেন।

বাঙালী মহিলাদের হীনাবস্থার কথা রামমোহন রায়ই সবার আগে সোচ্চার কণ্ঠে বলেন। এবং সে কেবল সতীদাহ প্রথার অমানুষিকতা প্রসঙ্গেই নয়। ঠিক কিভাবে তিনি মহিলাদের দুর্দশা বিষয়ে সচেতন হন, বলা শক্ত। তিনি জেরেমি বেন্থাম[৯]

৭ রামমোহন কঠোর ভাষায় এই মনোভাবের নিন্দা করেন। **রাজা রামমোহন প্রণীত গ্রন্থাবলি** পৃ. ২০৫-০৬।

৪. C. Rover, **Love, Morals and the Feminists** (London : Routledge & K. Paul, 1970), p. 149.

৯. রামমোহন ও বেন্থাম যে পত্রাদি বিনিময় করেন, তা থেকে বোঝা যায়, তাঁদের একজনের অন্যজনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। রামমোহন বিলেত গেলে বেন্থাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, যদিও বেন্থাম তার আগে প্রায় ১৫ বছরের মধ্যে কারো সঙ্গে দেখা

এবং রবার্ট আওএনের[১০] বন্ধু ছিলেন। হতে পারে নারীমুক্তির ধারণা তিনি এদের রচনায় পেয়েছিলেন। অন্তত বেন্থাম এবং আওএন উভয়ের রচনায়ই মহিলাদের দুর্দশার কথা আছে। তা ছাড়া, তিনি জেমস মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ *History of British India* (১৮১৮) পাঠ করেছিলেন।[১১] এ গ্রন্থে মিল বলেন, "...অসভ্যদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা সাধারণত নিকৃষ্ট; সভ্যদের মধ্যে উন্নত। ...সমাজ আনন্দ ও সুখ সম্পর্কে যতো মার্জিত হয়ে ওঠে এবং সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ...মহিলাদের অবস্থা ততোই উন্নত হতে থাকে।"[১২] রামমোহন প্রভূত অধ্যয়ন করতেন তাতে এটা খুবই সম্ভব যে, তিনি সেকালের নারীমুক্তি সম্পর্কিত বিতর্কের কথাও হয়তো পড়েছিলেন। ১৭৯২ সালে মেরী ওল্‌স্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ লিখিত *Vindication of the Rights of Woman* নামক বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রকাশের পর থেকেই এ বিতর্কের সূত্রপাত।[১৩] রামমোহনের অনুপ্রেরণার উৎস যা-ই হোক

করতে যাননি। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: S.D. Collet, **The Life and Letters of Raja Rammohan Roy** (3rd ed.; Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1962), pp. 313, 488-93.

১০. আওএনের পুত্রকে রামমোহন যে-পত্র লেখেন, তা থেকে মনে হয় তিনি আওএনের সামাজিক ধারণাসমূহের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই চিঠির পূর্ণ পাঠের জন্যে দ্রষ্টব্য: Collet, pp. 494-95.

আওএন মহিলাদের সমান অধিকার এবং সহজ বিবাহ-আইনের পক্ষে ওকালতি করেন। ১৮৪০-এর দশকে আওএনের শিষ্যরা, বিশেষত Emma Martin এবং Catharine Watkins, বৈপ্লবিক নারী মুক্তিকামী হিসেবে পরিচিত হন। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: C. Rover, **op. cit.**, p. 23; and B. Taylor, "The Women-Power", in **Tearing the Veil**, ed. by S. Lipshitz (London: Routledge & K. Paul, 1976), pp. 127-32.

১১. রামমোহন তাঁর **Preliminary Remarks—Brief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of India** (১৮৩২) গ্রন্থে মিলের বই-এর উল্লেখ করেন।

12. J. Mill, **The History of British India**, Vol. 1 (2nd ed.; London: Baldwin, Cradock and Jay, 1820), p. 383, 385.

১৩. ১৭৯২ সালের আগেই Dr. J. Gregory প্রণীত **A Father's Legacy to His Daughters** এবং তাঁর নিজের লেখা **Thoughts on the Education of Daughters** (1787) গ্রন্থের মতো অনেকগুলি বই প্রকাশিত হলেও, ওল্‌স্টোনক্র্যাফটের **Vindication of the Rights of Woman** গ্রন্থই সর্বপ্রথম একজন মহিলার তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদী রচনা। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ইংরেজ মহিলাদের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হয়।

না কেন, তিনি পুরুষ-শাসিত হিন্দু সমাজের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই সমাজ স্বার্থপর ও ভণ্ড। সে কারণেই এ সমাজ মহিলাদের 'প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে অস্বীকার করেছে।'[১৪] তিনি যখন ইংলণ্ডে যান তখন সেখানকার মহিলাদের 'গুণাবলী ও উৎকর্ষ দেখে' মুগ্ধ হন।[১৫] বস্তুত, শিক্ষা দান করে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির আবশ্যকতা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী প্রথম পাদের শেষ দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ রামমোহনের বন্ধুরাও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১৬] ঐতিহ্যবাদী হিন্দুদের প্রধান নেতা রাধাকান্ত দেবও আলোচ্য সময়ে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন হন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তিকা রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকার ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও, রাধাকান্ত দেবই এ পুস্তিকা রচনার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন, এ পুস্তিকা হয়তো স্ত্রীশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করবে।[১৭] রাধাকান্ত দেবের মতো ঐতিহ্যবাদী হিন্দুরা স্ত্রীশিক্ষা প্রদান করে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করতে চান অথবা না-ই চান, নারীমুক্তি সম্পর্কিত সচেতনতা বাঙালী সমাজে আলোচ্য কালেই প্রথম উন্মেষ লাভ করে।

১৮২০-এর দশকের শেষ দিকে হেনরী ভিভিআন লুই ডিরোজিও-র যে ছাত্ররা ইয়ং বেঙ্গল নামে বৈপ্লবিক একটি দল হিসেবে পরিচিত হন, তাঁরা ছিলেন বিপুলভাবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত। নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাসী, সোচ্চার কণ্ঠে তাঁরা মহিলাদের জন্যে সমমর্যাদার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এঁরা টম পেইনের মতো দার্শনিকের চিন্তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। মেরী ওল্‌স্টোনক্র্যাফটের সঙ্গে পেইনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো এবং তিনি যুক্তিবাদে

14. **The English Works of Raja Rammohan Roy**, Vol. 2, ed. by J. C. Ghose (Calcutta : S. Roy, 1901), p. 177.

15. **Ibid** , p. 9.

16. B. B. Kling, **Partner in Empire : Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise** (Berkeley : Univ. of California Press, 1976), p. 183.

প্রসন্নকুমার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**, দুই খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭১-৭৭), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৬৮। অতঃপর এ গ্রন্থ স. সে. ক নামে উল্লিখিত হয়েছে।

১৭. J.E.D. Bethuneকে লেখা রাধাকান্ত দেবের চিঠি (২০ মার্চ ১৮৫১) দ্রষ্টব্য: For full text see, J. C. Bagal's **Women's Education in Eastern India** (Calcutta : World Press, 1956), pp. 102-04.

বিশ্বাসী ছিলেন—উভয় সূত্রেই নারীদের সমানাধিকার-চেতনা ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো।[১৮] এই তরুণ ছাত্ররা রিচার্ড কার্লাইলের রচনার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। কার্লাইলও নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। সেই কালেই তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। বস্তুত তাঁর **Every Woman's Book** (1826) William Thompson **Appeal of One Half the Human Race Women against the Pretensions of the Other Half Men** (1826) নারীমুক্তি আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলো। পরবর্তী আন্দোলনের ওপর এ গ্রন্থদ্বয়ের প্রভাব ছিলো ব্যাপক এবং গভীর।[১৯] বেন্থাম, আওএন এবং রোম্যানটিক কবিদের এস্টাবলিশমেণ্ট-বিরোধী আন্দোলন থেকেও ইয়ং বেঙ্গলগণ নতুন নতুন ধারণা লাভ করেছিলেন—এমন অনুমানও সঙ্গত।

সেকালের বঙ্গদেশের ওপর ইউনিটারিআন আন্দোলনের প্রভাবও কম পড়েনি। কলকারখানার শ্রমিক এবং নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে তখনকার ইউনিটারিআনগণ যে জোরালো আন্দোলন করেন, তার দ্বারা প্রথমে রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা[২০] এবং পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী. এমন কি, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত হন। তা ছাড়া, উইলিআম অ্যাডম এবং কয়েক দশক পরে মেরী কার্পেণ্টার এবং অ্যানেট অ্যাক্রএড-এর মতো ইউনিটারিআন এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

এই সব কিছুর প্রভাবে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে সভ্যতা সম্পর্কে একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং মহিলাদের সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে। যে-পুরুষ সম্প্রদায় ইতিপূর্বে অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে আদৌ ভাবত ছিলেন না, তাঁরা, এই প্রথমবারের মতো স্ত্রীদের সঙ্গে

18. Paiticularly **Age of Reason** became very popular among them. See, A.F. S. Ahmed, **Social Ideas and Social Change in Bengal**, p. 42.

১৯. C. Rover, **Love, Morals and the Feminists**, pp. 21-23, 27.

২০. রামমোহন ১৮১৭ সালের আগেই ইউনিটারিআন ভাবধারার দ্বারা আকৃষ্ট হন। উইলিআম অ্যাডাম এবং তাঁর দুই বাঙালী বন্ধু—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সহায়তায় তিনি কলকাতায় একটি ইউনিটারিআন সভা স্থাপন করেন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। ইউনিটারিআনদের ধর্মীয় আদর্শই নয়, মহিলাদের উন্নতি করার আদর্শও তাঁকে প্রভাবিত করবে—এই ছিলো স্বাভাবিক। See D. Kopf, **The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind**, Ch. 1.

তাঁদের যোগাযোগের একটা অভাব অনুভব করলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়ের কথা বলা যায়। উদারনীতিতে এমন ঐকান্তিক আস্থা এবং সংস্কারে এমন আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর দু স্ত্রীর কাউকেই শিক্ষিত করতে পারেন নি অথবা করতে হয়তো চানও নি। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে যে-স্ত্রী বাস করতেন, রামমোহনের আধুনিক চিন্তা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তাঁকে মোটেই প্রভাবিত করে নি। উল্টো তিনি বরং স্বামীর সঙ্গে সযত্নে এমন দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন যাতে তাঁর ধর্মীয় পবিত্রতা বিনষ্ট না-হয়।[২১] দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী-ও স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁর ভয় ছিলো 'অনাচারী' স্বামীর সাহচর্যে তিনি হয়তো তাঁর 'জাত' হারাতে পারেন। এর ফলে দ্বারকানাথের পারিবারিক জীবন বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হয়।[২২] তিনি অতঃপর বাইরের বাড়িতে বসবাস করতে বাধ্য হন এবং একাধিক য়োরোপীয় মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[২৩] পারিবারিক জীবন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও সুখের ছিলো না। নারী জাতিকে দুর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি তাঁর কর্মোদ্যমের প্রধানাংশ ব্যয় করলেও, নিজের স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি অথবা তাঁর জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার সঙ্গেও তাঁর স্ত্রীকে একাত্ম করতে পারেন নি। হতাশ ও অসুখী বিদ্যাসাগর একবার তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেবল অর্থ দিয়ে তাঁকে ভরণপোষণের।[২৪] প্রসন্নকুমার ঠাকুরও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের অপ্রতুলতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অবশ্য স্ত্রীকে শিক্ষা দান করে এ সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন।[২৫]

বস্তুত নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই সংসারে এই অভাব অনুভব করেন। ১৮৩৮ সালে সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত একটি পত্রে চুঁচুড়ার একজন ব্রাহ্মণ পাঠকদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেন:

> এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচচ ও উত্তমকার্যে বড় হইবেন।...পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের

২১. সমাচার দর্পণ, ৩ নভেম্বর ১৮৩২, সসেক ২, পৃ. ৪৮৫-৮৬।

২২. B. B. Kling, p. 183.

২৩. Ibid., pp. 182-83.

২৪. স্ত্রীকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি, নভেম্বর ১৮৬৯, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৬৯), পৃ. ৬৬।

২৫. সসেক ১, সম্পাদকীয় টীকা, পৃ. ৩৬৭-৬৮।

আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন।[২৬]

অন্য আর একজন কয়েক দশক পরে আরো স্পষ্ট ভাষায় একই মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় একটি বিষয়ে খুব অসুখী,—এঁরা ঘরে স্ত্রীর নিকট সুখ ও মানসিক শান্তি পান না।[২৭] সমকালে আর একজন এই অসুখের যে চিত্র অঙ্কন করেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষিত যুবকদের দুঃখ প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের যে-চিত্র আঁকেন, তা নিম্নরূপ:

তার সৌহার্দ্যপূর্ণ, অমায়িক, চিন্তাহীন এবং নির্বোধ স্ত্রী যথার্থই বাচাল। তার কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনক কতোগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি মাত্র। স্বামীকে তুষ্ট করতে সে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সে তার বিরক্তি ও দুর্দশাকেই বাড়িয়ে তোলে। স্ত্রী এসে মেঝেতে তার পাশে বসে এবং তার জন্যে যে সুস্বাদু খাবার তৈরী করেছে তা তার সামনে পরিবেশন করে। তারপর সেদিন তার সংসারে যা যা ঘটেছে তা স্বামীর কাছে সবিস্তারে বলতে শুরু করে। তার বাচালতা এতো বেশি যে তার প্রশংসা করা যায় না। কিভাবে বিড়ালটা রান্না ঘরে ঢুকে একটা পেতলের জগ উল্টে দিয়ে তাতে রাখা দুধ ফেলে দিয়েছে; কিভাবে তার মাতামহীর (বিধাতা তাঁর মঙ্গল করুন) সুন্দর পাত্রটি নির্বোধ চাকরানির অসাবধানতাবশত ভেঙে গেছে; বিছানার ওপর হঠাৎ একটা টিকটিকি পড়ায় সে কি রকম ভয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো; এবং হঠাৎ বাঁ চোখে একটা ব্যথা বোধ করায় সে কি রকম ভয়ানক কেঁদেছে;—স্ত্রী এ সবের জীবন্ত বর্ণনা দেয়। স্ত্রী অবশ্য পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নয়। তাই ঘরের প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার পর সে অন্যদের প্রতি তাঁর উদার উদ্বেগ প্রকাশ করে। অতএব সে অতঃপর প্রতিবেশীদের গুজব ও খোশগল্প শুরু করে। শিক্ষিত বাবু অবশ্য যথেষ্ট চালাক। তাই সে জীবনের দুঃখ-কষ্ট সামলানো এবং প্রতিকার করার জন্যে ইংরেজ ভ্রাতাদের অনুকরণে বিয়ার পান

২৬. সমাচার দর্পণ, ৩ মার্চ ১৮৩৮, সসেক ২, পৃ. ৯৯।
পত্রে আরো প্রশ্ন করা হয়: আপনারা অনেক সন্তানেরদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন।

২৭. 'এ দেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার', বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৮০, পৃ. ১৫। (অতঃপর বামাপ নামে উল্লিখিত।)

করার অভ্যাস করেছে। পুরোপুরি কাব্য ও রোম্যান্স-বর্জিত বাবুর জীবন যথার্থই একঘেয়ে এবং নিরানন্দ।[২৮]

উপরে যে ধরনের যুবকদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাঁরা তখন এ মত পোষণ করেন যে, শিক্ষা এবং কিঞ্চিৎ আধুনিকতা তাঁদের স্ত্রীদেরকে প্রত্যাশিত মার্জিত রুচি ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী দান করতে পারে এবং তাঁদেরকে উন্নততর স্ত্রীতে পরিণত করতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দুর্দশা ছাড়া, সমকালীন অন্য একজন লেখক আর একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেন, ইংরেজ রাজত্বকালে সামগ্রিকভাবে কন্যাদের প্রতি পিতাদের স্নেহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, তাঁর মতে, আগে কন্যাদের অবহেলা ও ঘৃণা করা হতো।[২৯] অতএব, দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশহেতু ১৮২০-এর দশক থেকে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবে এক আশ্চর্য পরিবর্তনের সূচনা হয়। শুরুতে রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো সংস্কারকগণ কেবল সতীদাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কেই সচেতন হন; কিন্তু পরবর্তীকালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অপকৃষ্ট চরিত্র বিষয়েও সচেতন হন।[৩০] এ ছাড়া, আগেই উল্লিখিত হয়েছে, অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বস্তুত, ১৮২০-এর দশক থেকেই এই নতুন সচেতনতার উন্মেষ হয় যে, পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদেরও শিক্ষা দিলে তবেই বঙ্গদেশ সভ্য হয়ে উঠবে।[৩১]

রামমোহন প্রমুখের তুলনায় দেশীয় ঐতিহ্য থেকে বৈপ্লবিক ইয়ং বেঙ্গলগণের অবস্থান ছিলো অধিকতর দূরবর্তী। এঁরা কেবল মহিলাদের দাসত্বের মাত্রা সম্পর্কেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না, মহিলাদের অধীনতাকেই তাঁরা প্রশ্ন করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন: 'ঈশ্বর পুরুষ ও মহিলাদের সমান করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এটা কখনো চাননি যে, এদের একদল অন্যদলের অধীনে থাকবে। সুতরাং সকল বিষয়ে মহিলাদেরকে পুরুষের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে।'[৩২] তাঁদের

২৮. A Hindusthani, "The Great Want of the Babu Community", **Bengal Magazine**, Vol. 3 (Feb., 1875), pp. 326-30.

২৯. 'বঙ্গ মহিলার বর্তমান অবস্থা', **তমলুক পত্রিকা**, প্রথম বর্ষ (১২৮১), পৃ. ২২০।

৩০. তাঁর **নববাবু বিলাস** (১৮২৫), **দূতীবিলাস** (১৮২৫) এবং **নববিবি বিলাস** (১৮৩১) গ্রন্থে তাঁর এই সচেতনতা প্রতিফলিত।

৩১. কোনো এক ব্রাহ্মণের পত্র, **সমাচার দর্পণ**, ৩ মার্চ ১৮৩৮, **সসেক** ২, পৃ. ৯৯। অধিকন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩২. জ্ঞানান্বেষণ, **সমাচার দর্পণ**-এ উদ্ধৃত, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭; **সসেক** ২, পৃ. ২৬২-৬৩।

মতে, প্রাচীন ধর্ম-প্রবর্তকগণ ছিলেন স্বার্থপর ও ভণ্ড। কারণ তাঁরা ধর্মের নামে নারীদের প্রতি চরম অবিচার করেন।[৩৩] মেয়েদের পুরুষের সমান গণ্য করার দাবি তখন কেবল বঙ্গদেশেই নয়, ইংলণ্ডেও বৈপ্লবিক বলে বিবেচিত হতো। ফলে মুষ্টিমেয় ইয়ং বেঙ্গল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তা ছাড়া, তাঁদের জীবন ধারণ অত্যন্ত পাশ্চাত্য-প্রভাবিত থাকায়, সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁদের এমনিতেই একটি বড়ো ব্যবধান রচিত হয়েছিলো। সুতরাং ইয়ং বেঙ্গলদের চিন্তাধারা এতো বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের আন্দোলন তাঁদের নিজেদের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই সীমিত থাকে।[৩৪]

ঐতিহ্যিক সমাজের কাছাকাছি অবস্থিত সংস্কারকগণ যদি মহিলাদের ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষা দানের দাবি জানাতেন, তা হলে হয়তো বৃহত্তর পরিমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হতেন। ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ যখন স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন, তখন এটা কতকাংশে সম্ভব হয়। বিদ্যাদর্শন (১৮৪২) এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট নন, বরং অনেক বিষয়ে মহিলারাই শ্রেষ্ঠতর।[৩৫] বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪২), সর্বশুভকরী পত্রিকা (১৮৫০) এবং বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরও মহিলাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ১৮৫০ ও ১৮৬০এর দশকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার এবং দ্বারকানাথ রায় যে সব রচনা প্রকাশ করেন, তার মধ্য দিয়েও এ ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে যে, মহিলাদের অবস্থা উন্নত না হলে, সভ্য জাতি হিসেবে গণ্য হওয়া অসম্ভব।

স্ত্রীশিক্ষার সূচনা

রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সমস্ত সংস্কারকই স্ত্রীশিক্ষাকে মহিলাদের উন্নতির প্রথম সোপান হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, বঙ্গদেশে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব একজন ইংরেজ মিশনারির। রবার্ট মে নামক এই পাদ্রি ১৮১৮

৩৩. জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার দর্পণ-এ উদ্ধৃত, ৫ জানুআরি ১৮৩৩, সসেক ২, পৃ. ৯৬।

৩৪. S. N Ray, 'From Derozio to Nazrul : Radicalism and the Bengali Intelligentsia', **New Quest**, No. 5 (Dec., 1977), P. 6

৩৫. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ পৌষ ১৭৬৬ শকাব্দ (ডিসেম্বর ১৮৪৪), প. ১৩৪।

সালে চুঁচুড়ায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৬] এরপর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উৎসাহ দেখায় কলকাতার ব্যাপটিস্ট (১৮১৯) এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৮২৩)। চার্চ মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণায় মিস মেরী অ্যান কুক ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে অন্তত ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমকালীন উৎস থেকে জানা যায়, এ সব বিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় বালিকা লেখাপড়া শিখেছিলো।[৩৭]

বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং তাতে দেশীয় বালিকাদের লেখাপড়া শেখার কথা থেকে এমন মনে হতে পারে যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি হিন্দুদের মনোভাব বোধহয় তখন পরিবর্তিত হয়েছিলো। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। বস্তুত তখনকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাকে ভালো বলতেন এবং নিজেদের জীবনে কার্যত যা পালন করতেন, তার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুনরায় রামমোহনের কথা বলা যায়। রামমোহন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে জোর দাবি জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে গবর্নর-জেনারেলকে লেখা তাঁর পত্রটি[৩৮] প্রায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তা ছাড়া, তিনি মহিলাদের মানসিক শক্তি যে যথেষ্ট উঁচু মানের এ বিষয়েও লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রায় কিছুই করেননি। রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পুস্তিকা রচনার জন্যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে উৎসাহ দেন এবং এ পুস্তিকা প্রকাশের জন্যে স্কুলবুক সোসাইটিকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করার বিরুদ্ধে সরাসরি তাঁর মত দেন। তাঁর ভাষায়, "মিস কুকের স্কুলে কন্যাদের পাঠানোকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুই অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করেছিলেন।"[৩৯] সুতরাং যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, তাঁরাও ১৮২০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাঁদের সন্তানদের প্রেরণ করেননি; যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের সহানুভূতির অভাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের

৩৬. M. A. Liard, **Missionaries and Education in Bengal** (London : Oxford Univ. Press, 1972), p. 134.

৩৭. **সমাচার দর্পণ**, ৮ মার্চ ১৮২৩, এবং ২৮ জুন ১৮২৮, সসেক ১, পৃ. ১৪, ১৬।

৩৮. Rammohan's letter to the Governor-General, dated 2.12. 1823. For the text of the letter see **The English works of Raja Rammohan Roy**, II, 323-28.

৩৯. Deb to Bethune, J. C. Bagal, p. 103.

বিরোধিতার[৪০] ফলে এ সব বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং বেশ্যা কন্যাই পড়তে যায়।[৪১] শোনা যায়, এরাও বিদ্যালয়ে যেতো অর্থ পুরস্কারের লোভে।[৪২] তদুপরি, এ সব বালিকা লেখাপড়া সামান্যই শিখতো বলে জানা যায়।[৪৩] ১৮৩০-এর দশকের শুরুতেই এ সব বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। কেবল ভদ্রলোকদের বিরেধিতাই নয়, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আর একটি বড়ো কারণ হলো, এ সব বিদ্যালয়ের পরিচালিকা মিস কুকের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি আর এ সবের তেমন তদারক করতে পারেন নি।

ভদ্রলোকদের কন্যারা যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে যায় নি, তার একটি কারণ, ভদ্রলোকরা পর্দা ভেঙে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা ভাবতেই পারেন নি। তাছাড়া, ধর্মান্তরের ভয়ও ভদ্রলোকদের কম ছিলো না। মিশনারিদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিকে তাঁরা যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই ভয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৪] সুতরাং অংশত ধর্মান্তরের ভয়ে, অংশত পর্দা প্রথার প্রতি চরম আনুগত্যবশত, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রাথমিক প্রয়াস বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয়।

১৮৩০-এর দশকে যে-মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দু স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে অনুভব করেন, তাঁরা গোপনে নিজেদের বাড়িতে তার ব্যবস্থা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর যেমন বৈষ্ণবী এবং মিশনারি মহিলাদের সহায়তায় তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দান করেন। তাঁর স্ত্রী ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। তা ছাড়া, তার বড়ো মেয়ে সুরসুন্দরীও ইংরেজিসহ নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন।[৪৫] শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা ও রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী হরসুন্দরী, চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী, এবং আশুতোষ দেবের কন্যা (যাঁর নাম উল্লিখিত

৪০. একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈদ্যনাথ এ সব বিদ্যালয়ের জন্যে ২0,000 টাকা দান করেছিলেন। **সমাচার দর্পণ**, ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫, **সসেক** ১, পৃ. ১৫।

৪১. **বঙ্গদূত**, **সমাচার দর্পণ**-এ (২৫ জুন ১৮৩১) উদ্ধৃত, **সসেক** ২, পৃ. ৯১-৯২।

৪২. W. Adam, Reports on the State of Education, pp. 452-53.

৪৩. **Ibid.**, pp. 41-49.

৪৪. ১৭৯৩ থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে ৩০ বছরে বঙ্গদেশে যতোজন খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন, ১৮২৩ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে ১0 বছরে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হন। For details see, "Results of the Missionary Labours in India", **Calcutta Review**, Vol. 16 (1851), p. 255.

৪৫ কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি**, পৃ. ৩০।

হয়নি) বাড়িতেই ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন।[৪৬] বাড়ির মহিলাদের জন্যে রাধাকান্ত দেবও নাকি একটি নিজস্ব বিদ্যালয় চালু করেছিলেন।[৪৭]

সন্দেহ নেই এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়াসে কিছু ফল হয়েছিলো; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে ব্যাপক এবং বলিষ্ঠতর ভূমিকার প্রয়োজন ছিলো। এ সব ব্যক্তিগত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিলো প্রধানত ব্রাহ্ম ও খৃস্টানদের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, এ সব প্রয়াস যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যেই গোপনে সম্পন্ন হতো, সেহেতু রক্ষণশীল সমাজের ওপর এর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। তৃতীয়ত, তখন শিক্ষক, বিশেষত মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা এতো কম ছিলো যে তাঁদের পক্ষে বহু সংখ্যক মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিলো না। চতুর্থত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য ছিলো না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং ভদ্রলোক কর্তৃক তার দায়িত্ব গ্রহণ আবশ্যক ছিলো।

এর সূচনা হয় ১৮৪৯ সালের মে মাসে, জে. ই. ডি. বেথুন যখন কলকাতায় ভিক্টোরিআ গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।[৪৮] পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ই বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে মিশনারিগণ যে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করেন, আগেই বলা হয়েছে, তাতে নিম্নশ্রেণীর বালিকারাই গমন করতো। কিন্তু বেথুন বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ উদার ও রক্ষণশীল উভয় রকমের নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের দ্বারা।[৪৯] এ বিদ্যালয় কেবল ব্রাহ্ম এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের জন্যেই উন্মুক্ত ছিলো। সর্বোপরি, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন হিন্দু এবং পাঠ্যক্রমে এমন কিছু ছিলো না, যা হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবকে আঘাত করতে পারে।[৫০]

৪৬. **সম্বাদ ভাস্কর**, ৩১ মে ১৮৪৯ এবং ১৯ এপ্রিল ১৮৫১, **সসেক ১**, পৃ. ৩৬৭-৬৮।

৪৭. **সসেক ১**, সম্পাদকীয় টীকা, পৃ. ৩৯৬।

৪৮. আশ্চর্যের বিষয়, একজন ইংরেজকে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হয়। বীটন (১৮০১-৫১) ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৮৪৮ সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর সকল সম্পত্তি তিনি এই বিদ্যালয়কে দান করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারত সরকার এ বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার গ্রহণ করে।

৪৯. দ্রষ্টব্য: এ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন এবং উদ্দেশ্যাবলী, **সম্বাদ ভাস্কর**, ৩ জানুআরি ১৮৫৭, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা: বীক্ষণ, ১৯৬৪) উদ্ধৃত, পৃ. ৪৫০।

৫০. মিস কুকের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে খৃস্টান ধর্মীয় সাহিত্য পাঠ্য ছিলো।

বেথুন স্কুল এভাবে ভদ্রলোকদের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হাজির করে: ধর্মান্তরের ভীতি বিদূরিত, এখন কি তাঁরা তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন? দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো দুঃসাহসী ব্যক্তিরা যাঁরা এ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের একঘরে হতে হয়।[৫১] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু বার ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে জনপ্রিয় মতামতকে আগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনিও কন্যা সৌদামিনীকে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন কি না সে সম্পর্কে ইতস্তত করেন।[৫২] বেথুন নিজেই লিখেছেন, রক্ষণশীল হিন্দুরা কন্যাদের বিদ্যালয় প্রেরণের প্রশ্নে কিরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আরো লেখেন যে, জনৈক রক্ষণশীল হিন্দু নেতার (তিনি নামোল্লেখ করেননি) মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৫৩] অনেকে তখনো এই মত পোষণ করেন যে, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের নারীসুলভ গুণ এবং পরিবারের মান-সম্মান বিনষ্ট হবে। প্রসঙ্গত ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপন কালে ঈশ্বর গুপ্ত খুব উৎসাহ দেখান। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ হয়ে ওঠেন। 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় তিনি এই বলে দুঃখ করেন যে, শিক্ষা লাভ করার ফলে মেয়েরা তাঁদের গুণাবলী হারিয়ে ফেলছেন। তিনি লেখেন:

আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো, ব্রত-ধর্ম কর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।...
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।...
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।...
বুঝি "হুট" বলে "বুট" পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।[৫৪]

৫১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা** (কলকাতা: এলগিন প্রেস, ১৯০১), পৃ. ১২৮।

৫২. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, জুলাই ১৮৫১, **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী**, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯০৯), পৃ. ৪০।

৫৩. Bethune to Lord Dalhousie, 29.3.1850, in **Selections from Educational Records**, Vol. 2, ed. by J. A. Richey (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1922), pp. 52-53.

৫৪. 'দুর্ভিক্ষ', **কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড**, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা, ১৮৮৫), পৃ. ১২১-২২।

ঈশ্বর গুপ্তের এ কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এর দশকের গোড়াতে। তখনো এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার আদৌ বিকাশ ঘটেনি। সুতরাং তখন বাস্তবে যা ঘটছিলো এ কবিতায় তার প্রতিফলন হয়নি, বরং এতে সেকালের রক্ষণশীল পুরুষ সমাজের মনোভাবই দেখতে পাই।

বেথুন স্কুল শুরু হয় ১১ জন ছাত্রী নিয়ে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৭-এ দাঁড়ায়।[৫৫] এক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি ছাত্রী ছিলো, —তার মধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা।[৫৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বন্ধুদের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও, ১৫ বছর পরে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪-তে। এবং এ ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান ছিলো অত্যন্ত নীচু। এদের মধ্যে ২১ জন কেবল পড়তে এবং খুব সহজ বই বুঝতে পারতো এবং ১৬ জন গল্প পড়ে বুঝতে পারতো।[৫৭] সুতরাং এ কথা বলা যায় না যে, স্থাপনের ১৫ বছর পরেও এ বিদ্যালয় খুব একটা সাফল্য লাভ করেছিলো। বেথুন স্কুলের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান তাই বলে অস্বীকার করা যায় না। আসলে এই বিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে কন্যা পাঠিয়ে ভদ্রলোকেরা প্রথম বারের মতো পর্দা প্রথা অস্বীকার করেন এবং এ বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই স্ত্রীশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়।

বেথুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একই বছর একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন[৫৮] আর কিশোরীচাঁদ মিত্র অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন রাজশাহীতে—সম্ভবত দু-তিন বছরের মধ্যে।[৫৯]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর প্রথম বিশ বছর তিনি এ বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে যথেষ্ট শক্তি ও সময় ব্যয় করেন। যতোই কম হোক না কেন, বেথুন স্কুলের সাফল্য তাঁকে উৎসাহিত করে। অতঃপর তিনি সরকারের অর্থ সহায়তায় নবেম্বর ১৮৫৭

৫৫. **Selections from Educational Records**, II, 52-53.

৫৬. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২২৮।

৫৭. **General Report on Public Instruction in Lower Provinces of Bengal Presidency, 1863-64** (Calcutta: Govt. of Bengal, 1865), p. 59.

৫৮. **Selections from Educational Records**, II, 48-49; N. Mukherji, **A Bengal Zamindar: Joykrisna Mukherji**, p. 154. N. Mukherji-র মতে জয়কৃষ্ণ বেথুনের আগে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

৫৯. মন্মথনাথ ঘোষ, **কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র** (কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯২৭), পৃ. ৭৩-৭৪।

থেকে যে ১৮৫৮-এর মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৬০] তবে সরকার অর্থ সাহায্য বন্ধ করায় শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়।

স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ

১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ হয় সামান্যই। গোঁড়া হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যে-অভিভাবকগণ তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের একঘরে করেন।[৬১] বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখলেই রক্ষণশীল সমাজ যথাসাধ্য বিরোধিতা করতো। শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধুরা যখন মাজিলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন স্থানীয় জমিদার বিদ্যালয়টি বন্ধ করার জন্যে আপ্রাণ প্রযত্ন করেন। এক রাত্রে বিদ্যালয়গৃহটি ভেঙে ফেলা হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।[৬২] সেকালে যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করে-ছিলেন, তাঁরাও অনেকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো অনুচিত কাজ বলে গণ্য করতেন,—কারণ তখন প্রায় সব বালিকা বিদ্যালয়েই শিক্ষা দান করতেন পুরুষ শিক্ষকগণ। অথচ তখন মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো একেবারে নগণ্য। এবং যে-দুচার জন ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন অর্ধশিক্ষিত। এর ফলে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আর একটি প্রধান অন্তরায় ছিলো এই যে, তখন বালিকাদের বিয়ে হতো সাধারণত দশ-এগারো বছর বয়সেই।[৬৩] অনেকের বিয়ে তার আগেও হতো। সেজন্যে, যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো, তারাও সাধারণ লেখাপড়া শেখার আগেই লেখাপড়া সাঙ্গ করতে বাধ্য হতো।[৬৪]

৬০. বিনয় ঘোষ, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, পৃ. ২২৩।

৬১. শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ১৮৭০-এর দশকেও একঘরে হওয়ার ভয় ছিলো। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী, 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', **নব্যভারত**, অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪, পৃ. ২২৯।

৬২. **তত্ত্ব**প, মাঘ ১৭৮৫ শকাব্দ (জানু-ফেব্রু, ১৮৬৪), পৃ. ১৭৩; শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, (প্রথম সিগনেট সং; কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৫২), পৃ ৫৮-৬০। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** এবং শিবনাথের আত্মচরিতে ঘটনার যে সময় নির্দেশ করা হয়, তা অবশ্য মেলে না।

৬৩. **General Report on Public Instruction in Lower Provinces of Bengal Presidency, 1863-64**, p. 59; **অবোধবন্ধু**, অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯, পৃ. ১১৬-১৭।

৬৪. **General Report on Public Instruction in Bengal for 1871 72** (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1873), P. 81.

এ পর্যায়ে সবচেয়ে ভালো লেখাপড়া জানতেন সেই সব মহিলা যাঁরা নিজ চেষ্টায় বাড়িতে স্বামী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতেন। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তখন জেনানা অথবা অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী বলে পরিচিত ছিলো। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করতেন অথচ ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা এ পদ্ধতির শিক্ষাকে পছন্দ করতেন।

১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে এ পদ্ধতির স্ত্রীশিক্ষা যতোটুকু সাফল্য অর্জন করে, তার জন্যে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম-প্রভাবিত শিক্ষিত হিন্দুরাই বেশি অবদান রাখেন। এঁরা প্রায় ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা যাঁরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ক পাশ্চত্য ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কিঞ্চিৎ শিক্ষা দান ব্যতীত স্ত্রীদের উন্নততর সঙ্গিনী হিশেবে তৈরি করা অসম্ভব।[৬৫] সন্দেহ নেই, এই নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ স্ববিরোধিতা ছিলো। তাঁরা এই অর্থে "প্রগতিশীল" ছিলেন যে, তাঁরা স্ত্রীদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষণশীল ছিলেন এই অর্থে যে, তাঁরা অবরোধ প্রথা অস্বীকার করে মহিলাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাব পক্ষপাতী ছিলেন না। কেশব সেন-সহ পূর্ববর্তী নেতাদের কারো স্ত্রীই বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যার্জন করেননি। পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাবো, অ্যানেট অ্যাক্রএড কেশব সেনের এই স্ববিরোধিতা দৃষ্টে কী দারুণ হতাশ হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে কেশবের বক্তৃতা শুনে তিনি কেশবকে স্ত্রীজাতির প্রকৃত দরদী এবং "প্রগতিশীল" বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে কেশবের স্ত্রীকে দেখে তিনি কর্ম ও কথার পার্থক্য বুঝতে পারেন।[৬৬] এ কথা অবশ্য স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, এই নেতাদের অনেকের এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোকের স্ত্রীই আপনাপন চেষ্টায় বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং বামাবোধিনী সভার উদ্দোগে অনুষ্ঠিত "অন্তঃপুর শিক্ষা" কার্যক্রমের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৬৩ সাল থেকেই বামাবোধিনী সভা এ কার্যক্রমের আয়োজন

৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিরা কিভাবে শিক্ষা দান করে তাঁদের স্ত্রীদের "সংস্কৃত" করে তোলেন, সে সম্পর্কে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়েও আলোচনা আছে।

৬৬. W. H. Beveridge, **India Called Them** (George Allen & Unwin, 1947). pp. 88-89; P. Barr, **The Memsahibs** (London: Secker & Warburg, 1976) p. 163.

করে।[৬৭] বহু তরুণ ব্রাহ্ম একান্নবর্তী পরিবার ও সমাজের অন্য ব্যক্তিদের অজ্ঞানে তাঁদের স্ত্রী ও ভগ্নীদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রী ও ভগ্নীদের শিক্ষা দিতে পারুন অথবা না-ই পারুন, এঁদের কন্যারা কিন্তু অশিক্ষিত থাকেননি।

এইখানে প্রসঙ্গত কৈলাসবাসিনী দেবীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কৈলাসবাসিনীর (জন্ম ১৮৩৭) বিয়ে হয় ১২ বছর বয়সে। তখনো পর্যন্ত তিনি মোটেই লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ধারণাকেই তিনি ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁর ব্রাহ্ম-প্রভাবিত (অথবা ব্রাহ্ম) স্বামীর উৎসাহে তিনি লিখতে-পড়তে শেখেন।[৬৮] অল্পকালের মধ্যে তিনি এতোটা লেখাপড়া শেখেন যে, তখনকার অন্যকোনো বাঙালী রমনীর সঙ্গে বোধহয় তাঁর তুলনা চলতো না। ১৮৬৩ সালে তিনি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে তো বটেই, সম্ভবত ভারতীয় মহিলাদের মধ্যেও প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করেন। পরবর্তী ছ বছরের মধ্যে তিনি আরো দুটি গ্রন্থ এবং কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৬৯] কুমুদিনী (আনুমানিক ১৮৫০-৬৫),[৭০] নিস্তারিণী দেবী (১৮৪০-৬০),[৭১] ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-৭৬),[৭২] মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬),[৭৩]

৬৭. উমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে কেশবচন্দ্র সেনের কতিপয় শিষ্য মিলে বামাবোধিনী সভা স্থাপন করেন। এঁরাই ১৮৬৩ সালে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ৬০ বছর চালু ছিলো এবং বাঙালী মহিলাদের অগ্রগতিতে এর অবদান ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। এই পত্রিকার মাধ্যমেই জেনানা অথবা অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ২।

৬৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা (কলকাতা : গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩), পৃ. /০-৵০।

৬৯. তাঁর অপর গ্রন্থ দুটি হলো হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি এবং বিশ্বশোভা (১৮৬৯)।

৭০. তাঁর জীবনীর জন্যে দ্রষ্টব্য : কুমুদিনীচরিত (কলকাতা, ১৮৬৭, বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিআমে এর একটি কপি আছে); আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, নারীচরিত (ময়মনসিংহ : বিজ্ঞাপনী যন্ত্র, ১৮৬৬), পৃ. ৭০ ১১৫; 'কুমুদিনী জীবনী', বামাপ, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১২৭৫; 'কুমুদিনী জীবনী', বামাপ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৭২।

৭১. আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ৪৭-৫৮; 'নিস্তারিণী', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১।

৭২. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনালেখ্য (দ্বিতীয় সং; কলকাতা, ১৮৭৯; প্রথম সংস্করণ, ১৮৭৬)।

৭৩. মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১৯৩০-এর দশকে দুই খণ্ডে মনোরমার জীবনী প্রকাশ করেন। রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরিতে এর কপি আছে; কিন্তু নাম-পত্র ছেঁড়া বলে প্রকাশনা সংক্রান্ত বিবরণ জানা যায় না।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১),[৭৪] সৌদামিনী দেবী (?-১৮৭৪),[৭৫] স্বর্ণলতা ঘোষ,[৭৬] হেমাঙ্গিনী দেবী[৭৭] প্রমুখ মহিলাও বাড়িতে লেখাপড়া শিখে বিদগ্ধ নারী বলে পরিচিত হন। বিয়ের আগে এঁরা সবাই ছিলেন নিরক্ষর। তারপর বিয়ের পর প্রধানত এদের নিজের নিজের স্বামীর সহায়তায় এঁরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। নিম্নের পীঠিকা থেকে বোঝা যাবে সেকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ না-থাকায় মহিলারা কিভাবে লেখাপড়া শিখতেন। এ থেকে আরো বোঝা যাবে, যে-মহিলারা লেখাপড়ায় উৎসাহ দেখাতেন তাঁদের পরিবারিক পটভূমিকা কেমন ছিলো।[৭৮]

পীঠিকা ১

নাম ও জীবৎকাল	কিভাবে লেখাপড়া শেখেন	পারিবারিক পটভূমি
কৈলাসবাসিনী দেবী, ১৮৩৭-?	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম-প্রভাবিত স্বামী
দ্রবময়ী, ১৮৩৭-?	পিতার টোলে	পিতার একমাত্র সন্তান
বামাসুন্দরী, ১৮৩৮-৮৮	স্বশিক্ষিত	ব্রাহ্ম-প্রভাবিত স্বামী
কুমুদিনী ১৮৪০?--১৮৬৫	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী

৭৪. তাঁর আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য: 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত (কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭)। অধিকন্তু পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

৭৫. রাখালচন্দ্র রায়, জীবনবিন্দু (কলকাতা, ১৮৭৯)।

সৌদামিনী ২২-২৩ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর যে-দুটি লেখা বামাবোধিনী-তে প্রকাশিত হয় তা থেকে বোঝা যায় তিনি ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, বৌবাজার ব্রাহ্ম সমাজে সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় সৌদামিনী ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাইতেন।—রাজনারায়ণ বসু, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (কলকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯), পৃ. ১৯৭।

৭৬. বিলেত থেকে ফিরে এসে মনোমোহন ঘোষ স্বর্ণলতাকে কনভেণ্টে পাঠিয়ে বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী শেখান। তাঁর পোশাকও শালীন করা হয়। স্বামীর সঙ্গে তিনি দুবার বিলেত যান। বিস্তারিত বিবরণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৭. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন হেমাঙ্গিনী অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলী সম্পন্ন মহিলা হিসেবে পরিচিত হন। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৮. এই মহিলাদের কেউ কেউ বেথুন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী ব্যতীত অন্যান্যরা হয় কলকাতার বাইরে নয়তো কলকাতার এমন অঞ্চলে বাস করতেন যেখান থেকে বেথুন বিদ্যালয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো।

নিস্তারিনী দেবী, ১৮৪০-৬০	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
ব্রহ্মময়ী, ১৮৪৫-৭৬	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
অন্নদায়িনী লাহিড়ী ১৮৪৮-?	অংশত বাড়িতে, অংশত বিদ্যালয়ে	খৃস্টান পিতা, এবং পিতৃব্য রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম-প্রভাবিত
মনোরমা মজুমদার, ১৮৪৮-১৯৩৬	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ১৮৫২-১৯৪১	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
রাজকুমারী দেবী, ১৮৫২-৭৬	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
সৌদামিনী দেবী (রায়), ?-১৮৭৪	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	ব্রাহ্ম স্বামী
স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫-১৯৩২	অন্তঃপুরে, বৈষ্ণবী ও মেম সাহেবের কাছে	ব্রাহ্ম পিতা
তরু দত্ত, ১৮৫৬-	বাড়িতে এবং পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে	খৃস্টান পিতা

ছোটো একটি মহলে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলেও, একমাত্র ব্রাহ্মদের অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যাপক মাত্রায় জনপ্রিয় করতে পারেনি। বস্তুত, আরো কয়েকটি ঘটনা মিলে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে সহায়তা করে। ১৮৫০-এর দশকে নারী মুক্তি বিষয়ক, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক, যে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়, তা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ রায় ও প্যারীচরণ সরকারের মতো ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের লিখিত এই সব রচনা রক্ষণশীল হিন্দুদের মনোভাবকে খানিকটা উদার করেছিলো। ফলে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হন।[৭৯]

তা ছাড়া, মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩) এবং অবলাবান্ধব-এর (১৮৬৯) মতো সাময়িকী যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্যই ছিলো মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা, সেগুলিও মহিলাদের স্বশিক্ষিত হতে সাহায্য

৭৯. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি, পৃ. ৩৪।

করেছিলো।[৮০] তদুপরি, ১৮৬০-এর দশকে বেশ কয়েকজন মহিলা গ্রন্থকারের আবির্ভাবের ফলে জনমত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি নরম হয়। কৈলাসবাসিনী দেবী, তাহেরন নেসা,[৮১] সৌদামিনী দেবী, মধুমতী গাঙ্গুলি, কৃষ্ণকামিনী, কামিনীসুন্দরী প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার সুফল এবং প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। সাধারণ মানুষরা এই মহিলা গ্রন্থকারদের বিশেষ স্বাগত জানান এবং প্রশংসা করেন। এর ফলে রক্ষণশীলতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। উদাহরণ স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলা যায়। রক্ষণশীলতার জন্যে তিনি সুবিদিত ছিলেন। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর ধারণা ছিলো এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বাঙালি মহিলাদের নারীসুলভ গুণাবলী বিনষ্ট করবে।[৮২] কিন্তু সত্ত্বেও, কৃতিকামিনী দাসী যখন সংবাদ প্রভাকর-এ প্রকাশের জন্যে তাঁর কাছে কবিতা পাঠান তখন তিনি তা প্রকাশ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেননি। অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণকামিনী বাংলার প্রথম মহিলা কবি হিশেবে পরিচিত হয়।[৮৩] কৈলাসবাসিনী দেবী এবং 'দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামে কামিনী সুন্দরী তাঁদের কয়েকটি গ্রন্থ ১৮৬০-এর দশকে প্রকাশ করেন।[৮৪] এ সব গ্রন্থ সমালোচকগণের প্রশংসা ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়। কৈলাসবাসিনীর বিশ্বশোভা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে অবোধ-বন্ধু পত্রিকায় বলা হয় যে, তাঁর গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট মানের। গ্রন্থকার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গ্রন্থকর্ত্রী হওয়ার কথা। অবোধ বন্ধু কৈলাসবাসিনীকে গ্রন্থকর্তা আখ্যা দেয় এবং মন্তব্য করে যে, লেখিকাদের গ্রন্থকর্ত্রী বলা সঙ্গত নয়; কারণ গুণগত মান বিচারে মহিলা ও পুরুষদের কোনো প্রভেদ থাকা উচিত নয়।[৮৫]

১৮৭০-এর দশক নাগাদ শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক সম্প্রদায়, যাঁদের আমরা 'ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করেছি, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ব্যাপক মাত্রায়

৮০. মহিলারা নিজেরাই **বামাবোধিনী পত্রিকার** অবদান স্বীকার করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: শ্রীমতী···চট্টোপাধ্যায় **বামাপ**, চৈত্র, ১২৭৩; পৃ ৪৮১; অজ্ঞাত, 'বামারচনা', **বামাপ** কার্তিক ১২৭৬, পৃ. ১৪০; মানকুমারী বসু, 'আমার অতীত জীবন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মানকুমারী বসু** (দ্বিতীয় সং, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২), পৃ. ৭।

৮১. তাহেরন নেসা প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা যাঁর একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। আমার লেখা প্রবন্ধ 'তাহেরননেসা: প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা', **বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা**, মাঘ-আষাঢ়, ১৩৮৩-১৩৮৪, প. ৭১-৭৭ দ্রষ্টব্য।

৮২. পূর্বে, দ্রষ্টব্য.

৮৩. কৃষ্ণকামিনী দাসীর প্রথম কবিতা সংগ্রহ **চিত্তবিলাসিনী** প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে।

৮৪. কামিনী সুন্দরী ১৮৬৬ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে দুটি নাটক এবং একটি পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আরো চারখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৮৫. **অবোধ বন্ধু**, আষাঢ় ১২৭৬, পৃ. ৬০-৬১।

স্বীকার করে নেন,— নিজেদের জীবনে তা গ্রহণ করুন আর না-ই করুন। সমকালীন একজন লেখক বলেন যে, শিক্ষিত স্ত্রীর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তাঁর ভাষায় :

> এক্ষণকার উত্তিষ্ঠমান অংশ প্রায় অধিকাংশই কালেজে পড়ো। তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য হইতেছেন।···ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি সভ্যতাও শিক্ষা করিতেছেন; ইংরাজি সভ্যতা, অসন বসন চলন কথন লিখন ও ভজনাদিতেও প্রকাশ করিতেছেন।···এক্ষণকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদের লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না।··· আরো কিছুদিন পরে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কন্যাদাতগণ (Sic) কালেজের পড়ো চাহেন, কালেজের পড়োরা স্কুলের ছাত্রী চাহেন।···শিক্ষিত পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সবদিকে সুখজনক হয় না; বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে অন্তর, তাহাই কত সময়ে অমিলের কারণ হইয়া উঠে।[৮৬]

মূল্যবোধের এই বিবর্তনহেতু অশিক্ষিত বালিকার জন্যে শিক্ষিত চাকুরিজীবী পাত্র জোটানো ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়ছিলো।[৮৭] একারণে, রক্ষণশীল হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে কন্যাদের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিচ্ছিলেন।[৮৮]

বস্তুত, আকর্ষণীয় মহিলার ধারণাই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিলো। সমকালীন বাংলা সাহিত্য এর নির্ভুল প্রমাণ। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে চিত্রিত যে-নায়িকারা সেকালের থিয়েটার-অনুরাগী এবং পাঠকদের হৃদয় হরণ করে, তারা সবাই ছিলো শিক্ষিত।* এমন কি, সামাজিক দৃষ্টভঙ্গিতে রক্ষণশীল হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহের নায়িকারাও শিক্ষিত।

৮৬. 'স্ত্রী শিক্ষা', জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন, ১২৮২, পৃ. ৫২৪।

৮৭. অনুজ্ঞানন্দিনী রায়, মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাসের ইত্যাদি', বামাপ, কার্তিক ১২৯০, ২২৩-২৪, 'এদেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার', বামাপ, বৈশাখ ১২৮০, পৃ. ১৫।

৮৮. জনৈক মহিলা, 'বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ-১২৯৯, পৃ. ৪০।

* দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ যখন প্রকাশিত হয়, তখনো স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তেমন স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু এ নাটকের সুন্দরী নায়িকা সরলা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। লীলাবতী নাটকের লীলাবতীও শিক্ষিত এবং আকর্ষণীয়।

এ সব নাটক, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, শিক্ষিত সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলো। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের অজ্ঞাতেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শকে স্বীকার করে নেন।[৮৯] এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আগে যাঁরা কানে আঙুল দিতেন, তাঁরা এখন তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন।[৯০]

নিম্নের পীঠিকা থেকে বোঝা যাবে, সামগ্রিক সমাজ-সচেতনা হেতু ভদ্রলোক সম্প্রদায় কিভাবে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা গ্রহণ করে। প্রথমে ভদ্রলোকদের মনে কোনো দ্বিধা থাকলেও, পরের দিকে তাঁরা আন্তরিক গরজের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষাকে স্বীকার করে নেন।

পীঠিকা ২

বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা

বছর	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১,০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উৎস: General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64,1871-72,1881-82 and 1890-91.

১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরিমাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর হেতু কী? অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম এবং স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয় থেকে যে-মহিলারা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁরা এ সময়ে অনেকেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন। ফলে মহিলা শিক্ষক এবং বালিকা বিদ্যালয় উভয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মহিলা শিক্ষক না-থাকায় যে-রক্ষণশীল ব্যক্তিরা তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছিলেন না, এখন পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে

৮৯. আমার অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ 'হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস ও বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬' (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭) দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩০৫-০৬।

৯০. 'বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব', বামাপ, ভাদ্র ১২৮০। পৃ. ১৩২। অধিকন্তু দ্রষ্টব্য: কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি, পৃ. ৩৪; 'স্ত্রীশিক্ষা', জ্ঞানাঙ্কুর, পৃ. ৫৭১।

তাঁদের আপত্তির কারণ দূরীভূত হয়। তা ছাড়া, ১৮৭১-৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে-ক্যাম্পবেল স্কীম গ্রহণ করে স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে তা বিশেষ সহায়ক হয়। কারণ সরকারী অর্থ-সাহায্য পাওয়ায় আলোচ্য কালে গ্রামে গ্রামে শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে এজন্যে প্রায় দু হাজার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ সাল নাগাদ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ভেতর স্ত্রীশিক্ষা যে যথেষ্ট মাত্রায় গৃহীত হয়, তা নিম্নের পীঠিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পীঠিকা ৩

উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের শিক্ষার হার

বর্ণ	শিক্ষার শতকরা হার	ইংরেজি শিক্ষিতের হার
ব্রাহ্মণ	৫.৬	.১
কায়স্থ	৮.০	.৪
বৈদ্য	২৫.৯	.৮
ব্রাহ্ম*	৫৫.৬	৩০.৯

উৎস: Census of India, 1901, vol. VIA, Pt II (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), PP.60-61, 100-04, 106-11.

ব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়া খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। লক্ষণীয় এই যে, বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের তুলনায় তাঁদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার হার ছিলো অনেক বেশি। বস্তুত, ব্রাহ্ম মহিলাদের সঙ্গে একমাত্র খৃস্টান মহিলাদেরই এ ব্যাপারে তুলনা চলে। (বিশেষ করে সেই সব খৃস্টান মহিলা যাঁদের পূর্বপুরুষ উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন।) লোকগণনার প্রতিবেদনে দেশীয় খৃস্টান মহিলাদের সংখ্যা আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়নি বলে তাঁদের শিক্ষার হার নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু 'পরিশিষ্ট ৫'—এ ১৮৮৩ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক মহিলাদের তালিকা থেকে বোঝা যায়, বাঙালি খৃস্টান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা কী ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তা ছাড়া, নিচে একটি ব্রাহ্ম ও একটি খৃস্টান পরিবারের যে-উদাহরণ দিচ্ছি, তা থেকেও ব্রাহ্ম ও খৃস্টানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের মাত্রা খানিকটা অনুমান করা

* 'ব্রাহ্ম' কোনো বর্ণ নয়, কিন্তু যাঁরা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু।

যায়। এই ব্রাহ্ম পরিবার সীতানাথ তত্ত্বভূষণের এবং খৃস্টান পরিবার ভুবনমোহন বসুর। সীতানাথ তত্ত্বভূষণের পারিবারিক পটভূমি গ্রামীণ।* এ পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার কোনো ঐতিহ্য ছিলো না। কিন্তু সীতানাথের ছয় কন্যাই কমপক্ষে এফ. এ. উত্তীর্ণ হন। তার মধ্যে চার কন্যা স্নাতক।[৯১] ভুবনমোহনের চার কন্যা ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম কন্যা চন্দ্রমুখী ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা এম. এ., দ্বিতীয় কন্যা বিধুমুখী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন মহিলা এম. বি-র একজন, তৃতীয় কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন, এবং চতুর্থ কন্যা রাজকুমারী এম. এ.উত্তীর্ণ হন।[৯২]

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা

যে-পুরুষরা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন করেন, তাঁরা প্রথম দিকে নিশ্চিত ছিলেন না,— মেয়েদের ছেলেদের মতো উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত কি না। কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, মেয়েদের জন্যে ভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা উচিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের **শিশুশিক্ষা** এবং বিদ্যাসাগরের **বোধোদয়** নাকি মেয়েদের জন্যেই রচিত হয়।[৯৩] কিন্তু এ গ্রন্থদ্বয়ে এমন কোনো উপাদান নেই, যা তাদের বালক-পাঠ্যগ্রন্থাদি থেকে আলাদা করতে পারে।[৯৪] ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তকগণের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিলো যে, মেয়েদের গৃহরক্ষণ, রন্ধন, সূচীকর্ম এবং শিশুপালনের মতো বিষয়ই শেখানো উচিত। (নিম্নের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, অনেক মহিলাও এমন ধারণা পোষণ করতেন।) এই নিয়ে সে সময়ে রীতিমতো একটা সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অপর পৃষ্ঠায় যে-সারণি দেওয়া হলো, তা থেকে দেখা যাবে সেকালের বালিকা ও মহিলারা বিদ্যালয়ে সাধারণত কী ধরণের গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করতেন।

* সীতানাথের পূর্বপুরুষরা অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। যারা যাবার সময়ে সীতানাথের মা আতুর ঘরে ছিলেন। সীতানাথ তখন সামান্য জ্বরে ভুগছিলেন। আতুরঘরে গেলে স্নান করতে হবে, এই বিবেচনায়, তাঁর পিতা মার কাছে যেতে দেননি। সীতানাথ সারা জীবন এ দুঃখ ভুলতে পারেননি। দ্রষ্টব্য : S.N. Tattvabhushan. **Autobiography** (Calcutta ; Brahmo Mission Press, n.d).

৯১. S.N. Tattvabhusan, Passim.

৯২. See **Calcutta University Calendar 1910** (Calcutta, 1910). Passim.

৯৩. শিশুশিক্ষার ভূমিকায় নাকি এমন দাবি করা হয়েছিলো। দ্রষ্টব্য : ঈশানচন্দ্র বসু, 'স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ', নব্যভারত, এবং পৌষ ১৩০০, পৃ. ৫৬৬।

৯৩. পরবর্তীকালে এই বই দুটি ব্যাপকভাবে বালকদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

প্রথম শ্রেণী—বাংলা : বোধোদয় ; গণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বাংলা : আখ্যান মঞ্জরী, পদ্যপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ; ব্যাকরণ; ভূগোলসূত্র; গণিত।

তৃতীয় শ্রেণী—বাংলা : চারুপাঠ, তৃতীয়ভাগ; পদ্যপাঠ, তৃতীয়ভাগ; ব্যাকরণ; ভূগোলসূত্র; বাঙ্গালার ইতিহাস; বস্তুসার; গণিত।

চতুর্থ শ্রেণী—বাংলা : টেলিমেকাস; সদ্ভাবশতক; ব্যাকরণ; ভূগোল; স্বাস্থ্যরক্ষা; গণিত।

পঞ্চম শ্রেণী—রঘুবংশ (অনুবাদ); মেঘনাদবধকাব্য; ব্যাকরণ; প্রাকৃত ভূগোল; ভারতবর্ষের ইতিহাস; প্রাকৃত বিজ্ঞান; গণিত।

এ পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত মেয়েদের হাতের লেখা লিখতে হতো এবং খানিকটা অঙ্কন শিখতে হতো।[২৫] তখন অনেকে এ পাঠ্যক্রমকে খুব শক্ত বলে গণ্য করেন।[২৬]

পরবর্তীদশকে কেশবচন্দ্র সেন-স্থাপিত স্ত্রী-নরমাল বিদ্যালয় যে-পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে, তার সঙ্গে ওপরের পাঠ্যক্রমের বড়ো কোনো পার্থক্য ছিলো না, — নতুন বিষয়ের মধ্যে কেবল ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়া দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়—একটি কালীপ্রসন্ন ঘোষের নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯) এবং অন্যটি The Landmarks of Ancient History। এই পাঠ্যক্রম ছিলো নিম্নরূপ :

প্রথম শ্রেণী—বাংলা : চরিতাবলী; ইংরেজী : First Book of Reading; গণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বাংলা : আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয়ভাগ; পদ্যপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ; ভূগোল; মৌল পদার্থবিদ্যা : বস্তুবিচার; ইংরেজি : First Book of Reading; Arithmetic।

তৃতীয় শ্রেণী—বাংলা : চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ; পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ; ইতিহাস: বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ভূগোল : ইংরেজি : First Book of Reading; গণিত।

চতুর্থ শ্রেণী—বাংলা : রচনাবলী; মেঘনাদবধকাব্য; ইংরেজি : Rudiments of Knowledge; ইতিহাস : ভারতবর্ষের ইতিহাস; ভূগোল; মৌল পদার্থবিজ্ঞান; গণিত।

২৫. বামাপ, ভাদ্র, ১২৭৩, পৃ. ৩৪৩, পৃ. ৩৪৩-৪৪।
২৬. বামাপ, পৌষ, ১২৭২, পৃ. ১৬৪।

পঞ্চম শ্রেণী--বাংলা : মেঘনাদবধকাব্য ; নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব ; ইংরেজি : McCullock's Course of Reading ; ইংরেজি ব্যাকরণ ; ইতিহাস : The Landmarks of Ancient History ; ভূগোল ; মনস্তত্ত্ব ; এবং গণিত।[৯৭]

কেশবচন্দ্র নিজে 'নারীসুলভ' স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মহিলাদের উপযোগী বিষয়সমূহ কেন স্থান পেলো না, নিশ্চিতভাবে তা বলা শক্ত। তবে মনে হয়, পাঠ্যপুস্তকের অভাবই এর সব চেয়ে বড়ো কারণ। যাই হোক, কী ধরনের লেখাপড়া মেয়েদের শেখানো হবে এবং মহিলাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই প্রবল হতে থাকে। ১৮৭২-৭৩ সালে এই নিয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "প্রগতিশীল" ও "রক্ষণশীল" এই শাখা এমন মতভেদ প্রকাশ করে যে, তা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। কেশব সেন এবং তাঁর অনুগামীদের মতে, মেয়েদের জ্যামিতি, দর্শন ইত্যাদি "পুরুষালি" বিষয় পড়া অনাবশ্যক। অপর পক্ষে, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অন্নদাচারণ খাস্তগীর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দাবি করেন যে, মহিলাদের সকল বিষয় পড়ার এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের অধিকার আছে।[৯৮] রক্ষণশীল হিন্দুরা এজন্যে শিবনাথ শাস্ত্রীকে বিদ্রূপ এবং নিন্দা করেন।[৯৯] কতিপয় মহিলাসহ রক্ষণশীল হিন্দুরা যুক্তি দেখান যে, মহিলারা সন্তানপালান এবং গৃহকর্মে অবহেলা করেছেন এবং এর জন্যে পুরুষালি-স্ত্রীশিক্ষাই দায়ী।[১০০] আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ বিষয়ে বলা হয় :

> আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি। স্ত্রীজাতি জ্ঞানানুশীলন করিয়া চিরন্তন কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সভ্য সমাজে গৃহীত ও সম্মানিত হয় ইহ: অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু এক্ষণে যে প্রণালীক্রমে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আমরা তাহার বিরোধী। স্ত্রীশিক্ষার

৯৭. বামাপ, বৈশাখ ১২৮০, প. ২৪।

৯৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২৬৬, ২৮৯; History of the Brahmo Samaj, pp. 163-64 ; আত্মচরিত, পৃ. ১১৪-১৫।

৯৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : মধ্যস্থ, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ (জুন, ১৮৭২), পৃ. ১২৭।

১০০. কুলমালা দেবী, 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?', বামাপ, আশ্বিন, ১২৭৭, পৃ. ১৭৬-৭৭; 'নব্যবঙ্গ মহিলা', বামাপ, ফাল্গুন, ১২৭৯, পৃ. ৩৫২-৫৩, অজ্ঞাত, 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের ইত্যাদি, পৃ. ১৬৫, ২১৫, ২৭৯-৮০, কুলবালা দেবী, 'হিন্দু রমণী-দিগের ইত্যাদি', বামাপ, বৈশাখ, ১২৯৯, পৃ. ৩০।

যে বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে তাহা কেবল এই প্রণালীর দোষ।. . .আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি। . . . কিন্তু যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিনী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য।. . . বর্তমান কাল বিলাসপ্রধান কাল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক গার্হস্থ্য কার্যে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত।. . . গৃহকার্য দূরে থাক গৃহিনীগণের পুত্রকন্যা প্রতিপালনও অন্যের হস্তে।[১০১]

১৮৭৩ সালে অ্যানেট অ্যাক্রএডের পরিচালনায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর, মহিলাদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত বিতর্ক আরো তীব্র হয়ে ওঠে। মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ বাঙালি বন্ধুর সহায়তায় অ্যানেট এ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিলো তখনকার বালিকাদের "উচ্চশিক্ষার" একমাত্র বিদ্যালয়। অবশ্য এ উচ্চশিক্ষা উচ্চ প্রাথমিক অথবা নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়া আর-কিছু ছিলো না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীই (কাদম্বিনী বসু) পরবর্তীকালে সবার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন।[১০২] এ বিদ্যালয় থেকে বঙ্গদেশে প্রথমবারের মতো ছাত্রীনিবাসেরও সূচনা হয়। তবে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম ছাড়া অন্য কেউ প্রথমে এ বিদ্যালয়ে তাঁদের কন্যাদের ভর্তি করাতে সাহসী হন নি। ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে হেনরি বিভারিজের সঙ্গে অ্যানেটের বিবাহ হওয়ার পর বিদ্যালয়টি সাময়িক-ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মদের বিশেষত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি আবার ১৮৭৬ সালে খোলা হয়। প্রধানত আর্থিক অসচ্ছলতাবশত ১৮৭৮ সালে বিদ্যালয়টি বেথুন স্কুলের সঙ্গে একত্রিত করা হয় এবং বেথুন স্কুল নামেই পরিচিত হয়।[১০৩] পরবর্তী দু দশকে বেথুন স্কুল এবং এর কলেজ শাখা বঙ্গদেশের মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রতীকে পরিণত হয় এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী তাবৎ প্রচারণার লক্ষ্যবস্তুরূপে গণ্য হয়।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের এই জেহাদী মনোভাব বিশেষ করে বঙ্গদেশীয় ব্যাপার নয়। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জনমত ছিলো

১০১. 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', তদ্রূপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৭৮, পৃ. ১৫৪-৫৬।

১০২. জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন', ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০, পৃ. ৪৯৪।

১০৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (দ্বিতীয় সং, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২), পৃ. ১২-১৩, W. H. Beveridge, pp. 92-93 ; **Bethune College Centenary Volume 1849-1949** (Calcutta : Govt. of West Bengal, 1951).

অধিকতর প্রতিকূল। উচ্চশিক্ষার অধিকার আদায় করার জন্যে ১৮৬৩ সালে এমিলি ডেভিসের নেতৃত্বে লন্ডনে মহিলাদের একটি কমিটি গঠিত হয়। তখন ইংলণ্ডে অনেক মহিলা ছিলেন যাঁরা বেশ ভালো লেখাপড়া জানতেন; কিন্তু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হতো না। সে কারণে বহু হাজার স্বাক্ষর সংবলিত মহিলাদের অনেকগুলি আবেদন পত্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হয়। এগুলোতে দাবি করা হয় যে, মহিলাদের যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দান করা হয়। কোনো কোনো পুরুষ শিক্ষাবিদও এ বিষয়ে মহিলাদের সহায়তা দান করেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটরদের কাছে এ সম্পর্কে তদবির করেন। তা ছাড়া, বহু অধ্যাপক তাঁদের বক্তৃতায় উপস্থিত থাকার জন্যে ছাত্রীদের অনুমতি দেন। এসব ছাত্রী প্রত্যাশাতীত ভালো ফলাফল করেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ১৮৭৮ সালের আগে ইংলণ্ডীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদেরকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়নি।[১০৪] লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুমতি দেয় ১৮৭৮ সালে, অক্সফোর্ড ১৯২০ এবং ক্যামব্রিজ ১৯২৩ সালে।

এ ধরনের সাধারণ প্রতিকূলতা ছাড়াও, শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অনেকে মেয়েদের বিরুদ্ধে খুব বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে তাঁরা কখনো ছাত্রীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করতেন না। সোফিয়া জেক্স্-ব্লেক এবং অ্যানি বেসাণ্ট—সেকালের দু জন খ্যাতনামা ইংরেজ মহিলা এমনি পক্ষপাতদুষ্ট দুজন শিক্ষকের শিকার হন। সোফিয়া য়োরোপীয় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হলেও স্বদেশে ব্যর্থ হন এবং অ্যানি বেসাণ্ট ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁর শিক্ষক আগে থেকেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বিশ্বাস করেন না।[১০৫] যা-ই হোক, ইংলণ্ডের মহিলারা

১০৪. R. Strachy, **The Cause** (New York: Kennikat Press. 1969; first published in 1928). pp. 132-84, 246-60,

১০৫. **Ibid.**, p. 184, A.H. Nethercot, **The First Five Lives of Annie Besant** (Chicago: University of Cheicago Press, 1960). p. 182.

বঙ্গদেশেও এমন ঘটনা ঘটেছিলো। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক সে কলেজে মহিলাদের অধ্যয়নের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যখন এম. বি. পরীক্ষা দেন, তখন তিনি তাঁর ব্যবহারিক পত্রে কাদম্বিনীকে উত্তীর্ণ হতে দেননি। কলেজের অধ্যক্ষ কাদম্বিনীকে খুব ভালো ছাত্রী হিশেবে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, কাদম্বিনী ব্যর্থ হতে পারে। তাই উত্তীর্ণ না হলেও, কাদম্বিনীকে তিনি চিকিৎসা করার জন্যে একটি সনদপত্র দেন। পরবর্তীকালে কাদম্বিনী ইংলণ্ডের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন।

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করেন। পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করেই তাঁরা উচ্চশিক্ষার অধিকার লাভ করেন। পুরুষরা যে তীব্র বিরোধিতা করেন তার অন্যতম কারণ ছিলো, মহিলারা উচ্চশিক্ষা পেলে পুরুষদের চাকুরির সুযোগ হ্রাস পাবে।[১০৬]

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি কোনো কোনো ব্রিটিশ উপনিবেশের মতো[১০৭] বঙ্গদেশে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের মনোভাব বরং নমনীয়ই ছিলো। এ বিষয়ে সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব তো রীতিমতো অনুকূল ছিলো। সে কারণেই স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের সূচনায় সমাজ প্রবল বাধা দিলেও, মহিলারা উচ্চশিক্ষার অধিকার পান প্রায় বিনা বাধায়। দেরাদুন থেকে চন্দ্রমুখী বসু নামক একজন দেশীয় খৃস্টানবালিকা যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন কিছু দ্বিধার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পরীক্ষা দিতে বলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরাসরি অনুমতি না দিয়ে, পরীক্ষা করে দেখতে চায়, চন্দ্রমুখী ছেলেদের প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেন কি না। চন্দ্রমুখী নিজেকে এই অনুমতির যোগ্য বলে প্রমাণ করেন এবং পরবর্তী মহিলাদের পথ প্রশস্ত করেন। তাঁর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট নিয়মকানুন তৈরী করার জন্যে একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করে ২৭ জানুআরি ১৮৭৭ তারিখে। এই নিয়মকানুন ২৭ মার্চ সিণ্ডিকেট গ্রহণ করে এবং ১২মে তারিখে কলা অনুষদ অনুমোদন করে। মহিলাদের এফ. এ., বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষা দানের নিয়মকানুন তৈরি করার জন্যেও অনুষদ একটি সাব-কমিটি গঠন করে দেয়। এ সব নিয়মকানুন ১৮৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরি সিণ্ডিকেট কর্তৃক এবং ২৭ এপ্রিল সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[১০৮]

এ সব আইনকানুন পুরুষ-পরীক্ষার্থীদের অনুরূপই ছিলো, কেবল দুটি বিষয় ছাড়া।—এক. মেয়েদের পরীক্ষা হবে একটি স্বতন্ত্র কক্ষে; এবং দুই. মেয়েরা গণিতের পরিবর্তে political Economy নিতে পারবে। তখন জনপ্রিয় বিশ্বাস এই ছিলো যে, মেয়েরা গণিতে খুব দুর্বল। ১৮৭৯ সালে সিণ্ডিকেট চন্দ্রমুখীকে

১০৬. R. Strachy, p. 263.

১০৭. See, for details, R.T. Evans, **The Feminists**, p. 59.

১০৮. **Hundred Years of the University of Calcutta** (Calcutta: University of Calcutta, 1957), pp. 121-22.

এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়। অতঃপর ১৮৮৩ সালের শুরুতে চন্দ্রমুখী এবং কাদম্বিনী উভয়ই বি. এ. উত্তীর্ণ হন।[১০৯]

এ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করায় মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর পুরুষরা যে-'জেহাদ' করছিলেন, তা পরাস্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁরা হেরে যাওয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই যখন তাঁরা দেখাতে পারতেন না, তখন বলতেন, অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনার ফলে মেয়েদের সূক্ষ্ম স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছিত।[১১০] উদারপন্থী ব্যক্তিরা অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে এই এই বলে স্বাগত জানান যে, এর ফলে সমাজের প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হলো।[১১১]

শিক্ষার প্রতি মহিলাদের পরিবর্তনশীল মনোভাব

বহু শতাব্দী ধরে সামাজিক স্বীকৃতি না-থাকায়, মহিলাদের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছিলো। লেখাপড়া শিখলে বিধবা হতে হয়—এ বিশ্বাস মহিলাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো।[১১২] বয়স্ক মহিলারা এ কারণে মেয়েদের হাতে একখণ্ড কাগজ দেখলেও অত্যন্ত রাগ করতেন।[১১৩] তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মেয়েরা কালির আঁচড় দিলেও সংসারে দুর্ভাগ্য নেমে আসে।[১১৪] তাঁরা মনে করতেন, শিক্ষা পেলে মেয়েরা অসতী হয়[১১৫] এবং স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী ইত্যাদির নিকট অবাধ্য হয়।[১১৬] ১৮৩০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গলরা যে-উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত থেকে অনেক মহিলা মনে করতেন

১০৯. Ibid.

১১০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : তত্ত্বপ, ফেব্রুআরি-মার্চ, ১৮৮১ ; নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৮ ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যত্রতত্র।

ইংলণ্ডেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। দ্রষ্টব্য : R. Strachy, pp. 134-35, 251.

১১১. বঙ্গমহিলা, চৈত্র, ১২৮৩, পৃ. ২৭১-৭২।

১১২. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ৭, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পৃ ৬৫, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামারঞ্জিকা (কলকাতা : ডি'রোজারিও অ্যাণ্ড কোং, ১৮৬০), পৃ. ২।

১১৩. রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন (দ্বিতীয় সং, কলকাতা : সরসীলাল সরকার, ১৮৯৮, প্রথম সং. ১৮৭৬), পৃ. ৫৭।

১১৪. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ৭।

১১৫. ঐ, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পৃ ৬৫।

১১৬. প্রেমময়ী, 'বঙ্গমহিলার বর্তমান হীনাবস্থা', রামারচনাবলী, (কলকাতা : বামা-হিতৈষিনী সভা, ১৮৭২), পৃ. ২৭।

যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে মেয়েরাও তাঁদের জীবন যাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবেন। তাঁরা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করবেন না, এ আশঙ্কাও তাঁদের ছিলো।[১১৭] যে-মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিধবা লেখাপড়া জানতেন সাধারণ মহিলারা তাঁদের ঘৃণা ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁরা সযত্নে তাঁদের সন্তানদের এ সব বিধবার দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।[১১৮] সামাজিক এই প্রতিকূলতাহেতু, যে-মহিলারা লেখাপড়া শিখতে চাইতেন তাঁরা তা গোপনই করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে রাসসুন্দরী দেবী বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি দারুণ গোপনীয়তার সঙ্গে চৈতন্যভাগবত এর একটি পৃষ্ঠা পড়তে আরম্ভ করেন। যখন ঘরে কেউ উপস্থিত থাকতো না, কেবল তখনই তিনি চেলা কাঠের নীচ থেকে এই পৃষ্ঠা বের করে পড়তেন, তারপর আবার সেখানেই পৃষ্ঠাটি লুকিয়ে রাখতেন।[১১৯]

ইংরেজি-শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের পর থেকে, এ সব পরিবারের মহিলাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোভাব ক্রমশ পাল্টাতে আরম্ভ করে। যে-সমাজ পুরুষ-প্রধান, সে সমাজের মহিলাদের মনোভাব যথেষ্ট মাত্রায় পুরুষ-প্রভাব নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে একই সময়ে সমানভাবে পরিকীর্ণ হয়নি অথবা সামগ্রিক সমাজ-পরিবর্তনও সমানভাবে হয়নি। সে কারণে বাঙালি মহিলারাও সর্বত্র একই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন নি। তবে পুরুষদের সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনোভাবেরও বিলক্ষণ পরিবর্তন হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কেবল ব্রাহ্ম ও খৃস্টান মহিলারাই শিক্ষাকে সুনজরে দেখতে শুরু করেন এবং, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁদের অনেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন, অবশ্য বিদ্যালয়ে নয়, বাড়িতে। এর কয়েক দশকের মধ্যে ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলারাও অবশ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হন।[১২০]

১১৭. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, প. ৭।

১১৮. ঐ।

১১৯. রাসসুন্দরী দেবী, পৃ. ৬০-৬৫, ৭৯-৮১।

কৈলাসবাসিনী দেবীও শিক্ষাগ্রহণকালে অনুরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন করেন।—হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. /০-৶/.

এই গোপনীয়তাই সেযুগে স্বাভাবিক ছিলো। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে করিমুননেসা এবং ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনও এমন গোপনীয়তা পালন করেন। দ্রষ্টব্য: রোকেয়া রচনাবলী. আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৯৫-৮৬ ও অন্যত্র।

১২০. এর সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রাসসুন্দরী দেবী। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং মানুষ হন একটি ঐতিহ্যিক গ্রাম্য পরিবারে। তাঁর বিয়েও হয় এমনি আর-একটি রক্ষণশীল

বাঙালি মহিলাদের লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৫০-এর দশকে।[১২১] প্রথম দিকের লেখিকারা প্রায় সকলেই এমন মত পোষণ করেন যে, শিক্ষা ব্যতীত মহিলাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও অমার্জিত থেকে যায় এবং অশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে পশুর তেমন কোনো পার্থক্য নেই।[১২২] যে-মহিলাদের শিক্ষিত স্বামী ছিলেন, তাঁরা অনেকে এমন হীনমন্যতায় ভুগতেন যে, স্বামীরা তাঁদের হয়তো গৃহপালিত জন্তুর চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না।[১২৩] মহিলাদের মধ্যে যাঁরা কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁরা এটা উপলব্ধি করেন যে, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্যে তাঁরা এবং অন্যান্য মহিলারা জীবন ধারণ করছেন। তাঁরা দেখলেন, স্বামীরা যে-ধরনের সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট স্ত্রী চান, বাঙালি মহিলারা মোটেই সে রকম নন। ব্রাহ্মমহিলারা তদুপরি হিন্দুমহিলাদের আচরণে যথেষ্ট কুসংস্কারও লক্ষ্য করেন। মূর্তিপূজারী হিশেবেও তাঁরা হিন্দু মহিলাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষার অভাবই মন ও আত্মার এমন বিকারের জন্যে দায়ী।[১২৪]

বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো মহিলারা তাঁদের নিজেদেরকে এমন একটি মাপকাঠি দিয়ে মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করেন, যা ইতিপূর্বে কেবল পুরুষদের বেলাতেই প্রযোজ্য ছিলো। মধুমতি গাঙ্গুলির মতো তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণা করেন:

> হে বঙ্গদেশ-বাসিনী ভগ্নীগণ! পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদিগকেও যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকারিনী করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বিদ্যা ও জ্ঞানবলে

পরিবারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া শেখার জন্যে আন্তরিক আগ্রহ বোধ করেন।

আরো দ্রষ্টব্য: নগেন্দ্রবালা, 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অর্ধশিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদের মতামত', অন্তঃপুর, ভাদ্র, ১২০৮, পৃ. ১৭৫।

১২১. তার আগে মহিলাদের দু-একটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খুবই সম্ভব এ পত্রগুলি পুরুষদের লেখা। বামাবোধিনী পত্রিকা এজন্যে প্রমান না-নিয়ে মহিলাদের রচনা প্রকাশ করতো না।

১২২. সরলা, 'বঙ্গদেশের লোকদিগের... ।' বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৩৮৭; কামিনী দত্ত, 'স্ত্রীশিক্ষা', বামারচনাবলী, পৃ. ৬৩; গোপালমণি, 'বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে...', বামারচনাবলী, পৃ. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ১।

১২৩. প্রেমময়ী, পৃ. ২৬।

১২৪. রমাসুন্দরী, 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা...', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃ. ৭৩; সারদা, 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের...', বামাপ, কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৩৮৪; ক্ষীরোদা মিত্র, 'দূষিত দেশাচার...', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩, পৃ. ৩৪১।

বলবান হইয়া জগৎপিতার নিয়মানুযায়ী কর্ম করিয়া তাহার প্রীতির পাত্র হইবেন এবং অন্তে সদ্গতি লাভ করিবেন; আর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত?... উভয় জাতিকেই সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, যে উভয়ই সমান সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল বিমল সুখের অধিকারী হয়।[১২৫]

মহিলাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাতে গিয়ে কেউ কেউ পুরুষদেরই তাঁদের অবনতির জন্যে দায়ী করেন:

পুরুষগণ কেন, আমাদিগকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসাস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইব না?... আর কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব?[১২৬]

পুরুষদের প্রতি রাজবালা দেবীর অভিযোগ আরো স্পষ্ট। তিনি বলেন, মহিলাদের দুরবস্থার জন্যে পুরুষরাই দায়ী। 'তাঁহারা আমাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে দেন না, তাঁহারাই আমাদিগের মনের উন্নতির চেষ্টা করেন না।' পুরুষরা মহিলাদের জন্তুর মতো বন্দী করে রাখেন এবং বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা শেষ না-হতেই বিয়ে দেবার জন্যে তাদের বিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন।[১২৭] মহিলাদের অশিক্ষিত করে রাখার কারণ বিশ্লেষণ করে কৈলাসবাসিনী দেবী বলেন:

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকল জাতীয় শাস্ত্রেই কথিত আছে যে পত্নী পতির অর্ধ-অঙ্গস্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বণিতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব

১২৫. মধুমতী গাঙ্গুলি, 'বামাগণের রচনা', বামাপ, কার্তিক ১৩৭১, পৃ. ২২৯।
আরো দ্রষ্টব্য: তাহেরননেসা, বামাপ, ফাল্গুন ১২৭১, পৃ. ২৭৬-৭৭; অনুজানন্দিনী রায়, 'মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা...', বামাপ, কার্তিক ১২৯০, পৃ. ২২১।
১২৬. সৌদামিনী দেবী, বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭২, পৃ. ৪০।
আরো দ্রষ্টব্য: অজ্ঞাত, বামাপ, কার্তিক ১২৭৬, পৃ. ১৪০; অনুজানন্দিনী রায়, পৃ. ২২১।
১২৭. রাজবালা দেবী, পৃ. ৩৭৫।

(sic) রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্যে উপেক্ষাকরতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে...।[১২৮]

বাসন্তীকুমারী এই বলে দুঃখ করেন যে, ভারতবর্ষীয় পুরুষরা খুব ধর্মপ্রাণ এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ; কিন্তু শাস্ত্রে-যে কন্যাদের পুত্রের সমান যত্ন নিয়ে শিক্ষা দানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পুরুষরা তার প্রতি কর্ণপাত করেন না।[১২৯] কোনো কোনো মহিলা পুরুষদের এই আচরণকে ভণ্ডামী ও স্বার্থপরতা বলে অ্যাখ্যায়িত করেন।[১৩০]

তাহেরননেসা যুক্তি দেখান অন্য-একটি দৃষ্টিকোন থেকে। তিনি বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় মিলে সমাজ গঠন করে। সুতরাং কেবল পুরুষরাই সমাজকে উন্নত করতে পারেন না। সমাজে মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে; কিন্তু নিজেদের অজ্ঞানতা ও অনগ্রসরতার জন্যে তাঁরা এ ভূমিকা পালন করতে অক্ষম।[১৩১] কয়েক দশক পরে তাহেরননেসার যুক্তিকেই আরো বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তিনি স্ত্রীপুরুষকে তুলনা করেন গাড়ির চাকার সঙ্গে। তিনি বলেন, শকটের একদিকের চাকা বড়ো একদিকের চাকা ছোটো হলো, সে কখনোই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না, এক জায়গাতেই ঘুরতে থাকে।[১৩২] বস্তুত, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মহিলা এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন যে, মহিলারা শিক্ষিত ও উন্নত না-হলে বঙ্গসমাজ কখনোই উন্নত হতে পারবে না।[১৩৩] অজ্ঞাতনামা এক মহিলা অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলেন, শরীরের অর্ধাংশ অসুস্থ হলে সে ব্যক্তিকে কিছুতেই সুস্থ বলা যায় না।

১২৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ১১-১২। আরো দ্রষ্টব্য: হেমাঙ্গিনী চৌধুরী, 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা', অন্তঃপুর, মাঘ ১৩০৭, পৃ. ১১।

১২৯ বাসন্তীকুমারী বসু, 'স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার বর্তমান অবস্থা', অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯), পৃ. ১০৯।

১৩০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: প্রেমময়ী, পৃ. ২৬ ; কামিনী দত্ত, পৃ. ৬৫।

১৩১. তাহেরননেসা, পৃ. ২৭৫-৭৭। আরো দ্রষ্টব্য: কুলবালা দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ৫২।

১৩২. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'অর্ধাঙ্গী', রোকেয়া-রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ১৯০৪), পৃ. ৩৮।

১৩৩. নগেন্দ্রবালা দেবী, পৃ. ১৭৫।

তিনি বলেন, সমাজোন্নতির জন্যেই তাই মহিলাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।[১৩৪] এক কথায় বলা যায়, বেশ কিছু মহিলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন এবং মহিলাদের অনগ্রসরতার জন্যে পুরুষদেরই দায়ী করছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

সেকালে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে যে এতো আন্দোলন হয়, প্রশ্ন করা যেতে পারে, তার লক্ষ্য এবং আদর্শ কী ছিলো? কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, তখনকার পুরুষদের মতো মহিলারাও মনে করেতেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ভালো স্ত্রী তৈরি করা এবং ভালো স্বামী লাভ করা। অবশ্য কেবল বঙ্গদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই তখন এটা স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হতো। উদাহরণস্বরূপ সেকালের ইংলণ্ডের কথা বলা যায়। ইংরেজ পিতামাতারা তাঁদের মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে চাইতেন, যা বিয়ের বাজারে তাদের দাম বাড়াবে। গণিতের মতো বিষয় একারণে মহিলাদের পাঠ্যক্রমে বাহুল্য বলে গণ্য হতো। ফলে শিক্ষার চেয়ে সাংস্কৃতিক গুণাবলী অর্জনের প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো।[১৩৫] বাঙালি মহিলাদেরও অনুরূপ লক্ষ্য ছিলো। প্রেমময়ী যেমন মনে করতেন যে, লেখাপড়া শিখলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নত হবে। সেকালে এ সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিলো না।[১৩৬]

হাল্কা ভঙ্গিতে রচিত একটি অসাধারণ প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, যথার্থ শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিশেষ অসুখের কারণ হয়। তিনি এভাবে সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন :

> ...কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্যন্ত। স্বামী যখন একটা পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে

১৩৪.. .দেবী, 'একটি প্রস্তাব', ভারতী, বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ২৪।
আরো দ্রষ্টব্য : কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতা', ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ. ২০২।

১৩৫. R. Strachy **The Cause**, p. 125.

১৩৬. **প্রেমময়ী**, পৃ. ২৬।

সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য-মণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিনী কই? বোধহয়, গৃহিনী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিনীর না-যাওয়াই ভাল।[১৩৭]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনীদাস এবং কামিনী দত্তও মনে করেন যে, শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক দারুণ মনঃকষ্টের উৎস হয়েছে। কামিনী দত্ত বলেন, অশিক্ষিত স্ত্রী স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন।[১৩৮] আর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতে একমাত্র শিক্ষাই তেমন আধুনিক স্ত্রী তৈরী করতে পারে, যা আধুনিক স্বামীরা চান।[১৩৯] কবি ও বিদুষী মহিলা হিশেবে সুপরিচিত, প্রিয়ম্বদা দেবী দাবী, করেন যে, সে শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা স্ত্রীকে স্বামীর প্রিয়া, পরিচালিকা, বন্ধু ও শিষ্যে পরিণত করে।[১৪০]

স্ত্রশিক্ষার সমর্থক নারী ও পুরুষ উভয়ই সেকালে মনে করতেন যে, শিক্ষিত হলে তবেই ভালো মা হওয়া সম্ভব। এঁরা ইংরেজ মহিলাদের উদাহরণ দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সন্তানদের ঠিকমত লালন করতে এবং শিক্ষা দিতে হলে মাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে।[১৪১] আরো যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা বলেন, মাতা শিক্ষিত না হলে শিশুরা কখনোই কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে না।[১৪২] কেউ কেউ স্কট, জনসন এবং ওআশিংটনের নজির উল্লেখ করে বলেন, এঁরা যে এতো খ্যাতিমান হয়েছিলেন, তার পেছনে তাঁদের মাতাদের অবদান কম নয়।[১৪৩]

সেকালের বাঙালি সমাজে একান্নবর্তিতাই ছিলো আদর্শ, বিশেষত ভদ্রলোক-দের মধ্যে। এই মহিলারা তাই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, শিক্ষা পেলে

১৩৭. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'অর্ধাঙ্গী', রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৩৯।

১৩৮. কামিনী দত্ত, পৃ. ৬৬।

১৩৯. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮, পৃ. ২৬৩।

১৪০. প্রিয়ম্বদা দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ (১৯০১), পৃ. ১০৫।

১৪১. রাধারাণী লাহিড়ী, 'স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয়...,' বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃ. ৬২; সারদা, পৃ. ৩৬৪; রমাসুন্দরী, পৃ. ৭১-৭২; শৈলজাকুমারী দেবী, পৃ. ৬৮; কামিনী দত্ত, পৃ. ৬৪।

১৪২. শৈলজাকুমারী দেবী, পৃ. ৬৯; মধুমতী গাঙ্গুলি, পৃ. ৫৬।

১৪৩. রাধারাণী লাহিড়ী, পৃ. ৬৩-৬৪; হেমাঙ্গিনী চৌধুরাণী, পৃ. ১২।

মহিলারা তাঁদের সংকীর্ণতা এবং ঝগড়াটে স্বভাব ত্যাগ করে একান্নবর্তী পরিবারের উপযোগী ঔদার্য ও সহনশীলতা লাভ করবেন। এর ফলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত হবে।[১৪৪] তা ছাড়া, লেখাপড়া জানলে মহিলারা গৃহকর্মও ভালো করবেন—একথাও কেউ কেউ বলেন।[১৪৫]

এ সব উপযোগিতা দান করা ছাড়া, শিক্ষাই মহিলাদের সামাজিক হীনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারে,—অনেকেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অমূলক হলেও,[১৪৬] তখনকার একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস ছিলো এই যে, মহিলা খুব চঞ্চলমতি এবং যৌনবিষয়ে বিবেকবর্জিত। ভোজনে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ এবং কামে অষ্টগুণ" প্রভৃতি প্রবাদে মহিলাদের সম্পর্কে সেকালের সমাজের হীন ধারণা প্রতিফলিত হয়। মনু বলেছেন, যৌনবিষয়ে মহিলাদেব বিবেকবিবেচনা নেই, যুবক অথবা বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথবা মূর্খ, সুশ্রী অথবা কুৎসিত যে কোন ধরণের পুরুষ পেলেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে শয্যায় যেতে রাজি হন।[১৪৭] উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় মহিলাদের সম্পর্কে নিম্ন ধারণার উৎস মনুই কি না, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কিন্তু খুব অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণা নিঃসন্দেহে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিলো। এমন কি মহিলারাও মনে করতেন এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। সে কারণে তাঁদের কেউ কেউ এমন দাবি করেছেন যে, যথার্থ শিক্ষা দিলে মহিলারা ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান ও ধর্মীয় ভাব লাভ করবেন। ফলে, যে কারণে তাঁদের দুর্ণাম, সে সব দোষ বর্জন করতে পারবেন।[১৪৮] তা ছাড়া শিক্ষা লাভের ফলে তাঁদের মানসিক বৃত্তিসমূহ এবং রমণীসুলভ গুণাবলী বিকশিত হবে —এমন যুক্তিও দেখানো হয়।[১৪৯] শিক্ষিত হলে তাঁরা খ্যাতি অর্জন করবেন এবং পরিবারসমূহ সুনাম লাভ করবে—কোনো কোনো মহিলা এ রকম দাবিও

১৪৪. রমাসুন্দরী পৃ. ৭২ ; কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পৃ. ৫৫-৫৮।

১৪৫. শৈলজাকুমারী দেবী, পৃ. ৬৮ : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ; 'স্ত্রীশিক্ষা', পৃ. ৬৩-৬৫।

১৪৬. The English Works of Raja Rammohan Roy, ii, 178 তত্ত্বপ, পৌষ ১৭৬৬ (ডিসেম্বর ১৯৪৪), পৃ. ৩৪।

১৪৭. মনুসংহিতা, ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত (কলকাতা : অরুনোদয় প্রেস, ১৮৬৬), নবম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮, পৃ. ৫২২-২৪। মহিলাদের জন্যে অপমানজনক আরো কতোগুলো শ্লোক আছে।

১৪৮. সৌদামিনী দেবী, পৃ. ৪০ ; শৈলজাকুমারী দেবী, পৃ. ৬৮ ; কামিনী দত্ত, পৃ. ৬৩-৬৪ : 'বঙ্গবাসিনী ভগিণীদের প্রতি', বামা রচনাবলী, পৃ. ৮১।

১৪৯. কামিনী দত্ত, পৃ ৬৩-৬৪ : তাহেরনন্নেসা, পৃ. ২৭৬-৭৭ ; কুনবালা দেবী, পৃ. ৫৪।

করেন।[১৫০] বাসন্তীকুমারী বসু বলেন, তরু দত্ত, রমাবাই, কামিনী সেন এবং মানকুমারী বসু যে বিখ্যাত হন, সে কেবল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হেতু।[১৫১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষা অমূল্য সম্পদ এবং শিক্ষা ব্যতীত জীবন অর্থহীন।[১৫২] বস্তুত, এই মহিলারা কেবল যে শিক্ষার আবশ্যকতাই অনুভব করেন, তা-ই নয়, তাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে নিজেদের একটা আদর্শও গড়ে তোলেন। তাঁদের অনেকে এরূপ যুক্তি দেখান যে, মহিলাদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল হলো তাঁদের গৃহ।[১৫৩] সুতরাং যে শিক্ষা তাঁদের উন্নততর মা এবং স্ত্রী হতে সহায়তা করে এবং গৃহকর্মে নিপুণতর করে-- সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতে, মহিলাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানপালন এবং পরিবারের সদস্যদের সন্তোষবিধান। সুতরাং তাঁরা এমন শিক্ষাকেই আদর্শ শিক্ষা বলে অভি-হিত করেন, যা মহিলাদের এই গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে।[১৫৪] কুলবালা দেবী দুঃখ করে বলেন যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষা আদর্শ নারী গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব তিনি এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন, যা মহিলাদের নারীসুলভ গুণাবলী বৃদ্ধি করবে।[১৫৫]

রাধারাণী লাহিড়ী লক্ষ্য করেন যে, পুরুষ ও নারীদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং তাঁদের ভূমিকাও ভিন্ন ধরনের। তিনি তাই বলেন:

> যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন সেইরূপ তাহাদের কার্যও যে বিভিন্ন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। . . হৃদয় সম্বন্ধে যখন নারীজাতি প্রধান, তখন, তাহার পরিচালনই যে তাঁহাদের প্রধান কার্য এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কার্যে সেই মনোবৃত্তি সম্যক স্ফুরিত হয়, তাহাই নারীজাতির অবশ্য ও একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয়। . . . বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের ন্যায় নারীরও অতীব প্রয়োজনীয়। নারীজাতি সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়া

১৫০. তাহেরন নেসা, পৃ. ২৭৬; উপেন্দ্রমোহিনী, বামাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃ. ১৮-১৯।

১৫১. বাসন্তীকুমারী বসু, পৃ. ১১০-১১।

১৫২. সৌদামিনী দেবী, পৃ. ৪০; নগেন্দ্রবালা দেবী, পৃ. ১৭২-৭৬।

১৫৩. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পৃ. ২৬৩; কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহত্ম', ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ২০৭; প্রিয়ম্বদা দেবী, পৃ. ১০৫।

১৫৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', পৃ. ২৬৩-৭৩; কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোকের কাজ...', পৃ. ১৪৮।

১৫৫. কুলবালা দেবী, পৃ. ৫১, ৫২, ৫৫; প্রিয়ম্বদা দেবী, পৃ. ১০৫-০৬।

আপনার কোমল ভাবকে আরও বর্ধিত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করেন ইহাই অভিপ্রেত।[১৫৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও কবি প্রিয়ম্বদা দেবী এবং কুলবালা দেবী ছিলেন আরো স্পষ্টভাষী। তাঁরা সমকালীন স্ত্রীশিক্ষাকে পুরুষালি এবং মহিলাদের অনুপযুক্ত বলে আখ্যা দেন।[১৫৭] কুলবালা দেবী এমন শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন যা সতীত্ব, আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দয়া, নিবেদন, সেবা ইত্যাদি নারীসুলভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে।[১৫৮]

মহিলাদের সচেতনতার সীমাবদ্ধতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদর্শের তেমন সাদৃস্য ছিলো না। তাঁরা তখনো পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। শিক্ষা লাভ করে তাঁরা সেই ধরনের মহিলা হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, পুরুষপ্রধান সমাজে শিক্ষা লাভ করে "আধুনিক" স্ত্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো বিকল্প নেই।

সে পর্যায়ে মহিলারা একথা ভাবেননি যে, শিক্ষা পেয়ে তাঁরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনো তাঁদের কাম্য বস্তুতে পরিণত হয়নি। স্বামী-পুত্র-কন্যার ক্ষুদ্র একক পরিবারের তুলনায় একান্নবর্তী পরিবারই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ছিলো।[১৫৯] যেহেতু বিবাহই ছিলো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, সেহেতু শিক্ষা বলতে মহিলারা সাধারণত যা বুঝতেন, তা হলো এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এমন প্রশিক্ষণ যার

১৫৬. রাধারাণী লাহিড়ী, পৃ. ৬২-৬৩। অধিকন্তু কুলবালা দেবী, পৃ. ৫৩।
১৫৭. প্রিয়ম্বদা দেবী, পৃ. ১০৬; কুলবালা দেবী, পৃ. ৫২-৫৩।
১৫৮. কুলবালা দেবী, পৃ. ৬৫।
১৫৯. আমি কেবল একটি ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছি। শরৎকুমারী চৌধুরাণী ১৮৯১ সালে লেখেন যে, একক পরিবার অন্তত এজন্যে ভালো যে, তা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে উন্নততর হতে সহায়তা করে। বঙ্গদেশের বাইরে বাল্যকাল কাটে বলে এবং স্বামী উচ্চশিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে, তিনি নিজেই একক পরিবারের সুফল অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে জন্যেই তিনি একক পরিবার সমর্থন করেন। দ্রষ্টব্য: তাঁর লেখা প্রবন্ধ— 'এ কাল ও এ কালের মেয়ে', ভারতী ও বালক, আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯৮, পৃ. ৩৯১-৯২, ৩৯৪। আরো দ্রষ্টব্য. তৃতীয় অধ্যায়।

মাধ্যমে তাঁরা আচার-আচরণ এবং অন্য কতগুলো গুণ আয়ত্ত করে সমাজ-নির্ধারিত "আধুনিক" স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারেন। এদেশের সমাজ মূলত ঐতিহ্যিক হলেও, পাশ্চাত্য ভাবধারার নিরন্তর প্রভাববশত এই "আধুনিক" স্ত্রীর সংজ্ঞা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিলো।

শতাব্দীর শেষ দু দশকে চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী দাস, সরলা ঘোষাল প্রমুখ কতিপয় মহিলা চাকুরি গ্রহণ করলেও, সেকালের মহিলারা মনে করতেন না যে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।[১৬০] ইংলণ্ডে কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রচুর মহিলা শিক্ষালাভ করেন চাকুরির প্রত্যাশায়।[১৬১]

বাঙালী মহিলাদের দারুণ শোচনীয় সামাজিক অবস্থান এবং তাঁদের ওপর পুরুষদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব সত্ত্বেও সেকালের মহিলারা নিজেদের একটি নির্যাতিত শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। এ সচেতনতা তখনো দেখা দেয়নি। ফলস্বরূপ, শিক্ষাদানের মাধ্যমে অথবা আইন প্রণয়ন করে তার সহায়তায় নিজেদের হীন দশা ঘোচানোর জন্যে তাঁদের মধ্যে কোনো আন্দোলন দানা বাঁধেনি। উল্টো তখনো তাঁরা তাঁদের অত্যাচারী পুরুষ-প্রভুদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তখনো আলো দান করার জন্যে তাঁরা পুরুষদের কাছেই প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। তাঁদেরকে ভালো মাতা এবং আধুনিক স্ত্রী হিসেবে তৈরি করার জন্যে পুরুষরা যে-ধরনের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা তা নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন। মহিলাদেরকে ঐতিহ্যিক ভূমিকায় বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনায় সেকালের মহিলাদেরও সম্মতি ছিলো ষোলো আনো। সরলা ঘোষাল, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমুখের আবির্ভাব এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনহেতু ১৯০৫ সালের পর এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে।

১৬০. অন্যান্য দেশের জন্যেও এটা কমবেশি সত্য ছিলো। See R.T. Evans, **The Feminists**, P. 123.

১৬১. R. Trachy, pp. 94-98, 185-241 ; R.T. Evans, p. 24, 29.

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাঁচা খোলা : বঙ্গমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে পুরুষদের প্রয়াস

সেকালের একজন নাম-করা লেখিকা, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী ১৮৯৫ সালে লেখেন যে, বাঙালি মহিলাদের অবস্থা 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির' মতো। তিনি বলেন, একেবারে বাল্যকাল থেকেই কঠোর পর্দা প্রথার নিয়ন্ত্রণে মানুষ বলেই, বঙ্গমহিলারা লেখা-পড়া শিখতে পারেন না এবং তার ফলে তাঁদের মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশও ঘটে না।[১] আগের অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি যে, সে যুগের মহিলাদের সামাজিক অবস্থা ছিলো পুরোপুরি অধীনতার। এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মহিলাদের সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে অবনত হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এবং এই অবস্থাই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়।[২]

নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা অবশ্য তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলো,—অন্তত উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মতো তাঁরা অন্তঃপুরে বন্দী ছিলেন না অথবা সতীদাহ কুলীন বহুবিবাহ, একান্নবর্তিতা ইত্যাদি মহিলা-নির্যাতনমূলক প্রথার শিকার ছিলেন না। তা ছাড়া, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে তাঁদের বক্তব্য বিবেচিত হতো। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করতেন। অপর পক্ষে, ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবেন,—এমন প্রত্যাশিত ছিলো না। ফলে, তাঁদের অন্তঃপুরের বাইরে আসার প্রয়োজনও হতো না। তাঁরা ছিলেন বরং অলঙ্কারের মতো—সযত্নে রক্ষিত; অথবা এমন 'পরিচালিকার' মতো যিনি সন্তান ধারণ ও লালন-পালন করবেন, সঙ্গ দেবেন এবং বড়োজোর গৃহরক্ষণাবেক্ষণ করবেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিলো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা নগণ্য হওয়ায় অথবা আদৌ তেমন কোনো ভূমিকা না-থাকায়, ভদ্রলোক পরিবারের মহিলাদের

১. নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, 'অবরোধে হীনাবস্থা', বামাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃ. ৩০।

২. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite, 1600-1850', in **Aspects of Bengali History and Society**, pp. 17-20.

তা-ও ছিলো না। H. A. D. Phillips নামক সে সময়কার একজন সিবিলিআন যথার্থই লক্ষ্য করেন:

> নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যখন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে, তখনই মহিলাদেরকে অন্যের কাছ থেকে ঈর্ষার সঙ্গে রক্ষা করার প্রয়াস তথা পর্দা প্রথা কঠোর হয়ে ওঠে।...উচ্চশ্রেণীর চাষীরা ক্রমশ কঠোরতর অবরোধ প্রথা চালু করছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা সচ্ছল হয়ে ওঠার পর প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই দেয়াল-ঘেরা বাড়ি ও নিজস্ব শৌচাগার তৈরি করে এবং বাড়ির আঙিনার মধ্যে একটি কূপ খনন করে—যাতে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যেতে না-হয়।[৩]

অবরোধ প্রথা অবশ্য বঙ্গীয় বা ভারতবর্ষীয় কোনো একক আবিষ্কার নয়। বস্তুত, প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমান মহিলাদেরকে পুরুষদের কাছ থেকে আলাদা রাখার রীতি প্রচলিত ছিলো; যেমন ছিলো মুসলমানদের মধ্যেও। কিন্তু উনিশ শতকীয় বঙ্গমহিলারা সম্ভবত সব চেয়ে কঠোর ও ভয়ানক ধরনের পর্দা প্রথার শিকার হন। বালিকা-বধূসহ সকল বিবাহিত মহিলাকেই লম্বা ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখতে হতো। রাসসুন্দরী দেবী, যিনি বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লিখেন, তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, বারো বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেমন করে তিনি পর্দার আড়ালে বন্দী হন। শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়াদের সামনে তাঁর ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলা বারণ ছিলো। অনেক বছর পরে যখন তিনি কয়েকটি সন্তানের জননী এবং শাশুড়ীর মৃত্যুর ফলে সংসারের কর্ত্রী হন, তখনো তিনি তাঁর তিন ননদসহ অন্যান্য আত্মীয়দের সামনে পর্দা প্রথা পালন করে তাঁর 'মহিলাসুলভ গুণাবলী' বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।[৪] জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মজীবনী থেকে মনে হয়, তিন দশক পরে, ১৮৬০-এর দশকে, বধূদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাত বছর বয়সে ১৯৫৯ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর শাশুড়ী খুব স্নেহশীল এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই অনেক সময়ে তিনি জ্ঞানদাকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু জ্ঞানদা সারাক্ষণ নীরবে ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। প্রতিবাদ করা দূরে থাক, জ্ঞানদা যেহেতু একেবারে নির্বাক থাকতেন, সে জন্যে তিনি যতোটা

৩. H. A. D. Phillips, **Our Administration in India with Special Reference to the Work and Duties of a District Officer in Bengal** (London ; W. Thacker & Co , 1886), pp. 128-29.

৪. রাসসুন্দরী দেবী, যত্রতত্র।

খেতে পারতেন, তাঁর শাশুড়ী উৎসাহবশত তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশি খাইয়ে দিতেন। ফলে, প্রথম সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করার জন্যে পালাতেন।[৫]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা প্রথার কঠোরতা হ্রাস পেয়েছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এমন কি ১৮৯০-এর দশকে, নববিবাহিত বধূকে তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গেও পর্দা মেনে চলতে হতো। ইংরেজি শিক্ষিত কোনো কোনো ব্রাহ্ম-প্রভাবিত পরিবারের বেলাতেও, বিশেষত মফস্বলে, এ কথা খাটতো। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা দিয়েছেন যে, ১৮৮৭ সালের শেষ দিকে বিয়ের পর তাঁর মাকে কেমন করে পর্দার নিয়ম মেনে চলতে হতো:

> বিয়ের পর পুরো পাঁচ বছর আমার মা তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে একটি কথাও বলেননি অথবা তাঁর সামনে ঘোমটাও খোলেননি। ঘরের কর্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত "আলাপ" সারতে হতো মাথা নেড়ে—উপরে নীচে নেড়ে সম্মতি এবং আড়াআড়ি নেড়ে অসম্মতি জানাতে হতো। যতোদিন না ঘরের অন্য কোনো মহিলা দেখতে পেয়ে কর্তাকে না-জানাতেন, ততোদিন তাঁর কিছু আবশ্যক হলে, তা ছাড়াই সন্তুষ্ট থাকতে হতো।[৬]

যদি নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের মতো শিক্ষিত ব্রাহ্ম-প্রভাবিত পরিবারেই পর্দার এতো কড়াকড়ি থেকে থাকে, তা হলে ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারে তা কতোটা কঠোরভাবে পালিত হতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিবারে পর্দার কঠোরতা ছিলো আরো বেশি। এ সব পরিবারে অবিবাহিত মেয়েদেরও পর্দার নিয়ম মেনে চলতে হতো। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন লিখেছেন যে, তাঁদের বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয়া কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এলে তাঁকে পর্দা মেনে চলার হুকুম দেওয়া হয়। তিনি এখন দরজার আড়ালে, তখন খাটের তলায়, তারপর চিলে কোঠায় এমনি করে লুকোতে শুরু করেন। এরকম লুকিয়ে, তাঁর মা কয়েকবার তাকে খাবার দিতে ভুলে যান। ফলে তিনি না-খেয়ে থাকেন। এ ঘটনা ঘটে ১৮৮০-এর দশকে, রোকেয়ার বয়স যখন মাত্র পাঁচ।[৭] কয়েক দশক পরে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ যখন বালিকা মাত্র, তখন পর্দার কড়াকড়ি হ্রাস পায়। কিন্তু তবু ন বছর বয়স থেকে তাঁকে

৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, পৃ. ২১।

৬. N. C. Chaudhuri, **An Autobiography of an Unknown Indian** (6th Jaico Impression; Bomday: Jaico Publishing House, 1976), p. 140.

৭. রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৪৮৮-৮৯।

পর্দা মেনে চলতে হয়। তাঁর মা অবশ্য মনে করেন যে, আরো অনেক আগে থেকেই তাঁর পর্দার নিয়মাবলী পালন করা উচিত ছিলো।[৮]

যদি মহিলাদের মধ্যেই মেয়েদের অমন কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতে হতো, তা হলে পুরুষের সম্মুখীন হলে, তাঁদের কিভাবে অবরোধ মানতে হতো, তা অনুমান করা যেতে পারে। বধূদের পক্ষে রাত কি দিন কোনো সময়েই বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। নিকটাত্মীয় বা স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা বা আলাপ করা বারণ ছিলো।[৯] সাধারণত শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ঘরের কর্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করাও বধূর জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো।[১০] কর্ত্রী হওয়ার পরেও রাসসুন্দরী দেবী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলা দেখা করতেন না বা কথা বলতেন না।[১১] চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো, পর্দা প্রথা স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কেমন করে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতো।[১২]

পর্দা মেনে চলার রীতি এদেশের সমাজে এতো গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো যে, তার ব্যত্যয় ঘটলে মহিলারা দারুণ বিব্রত বোধ করতেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী প্রগতির আন্তরিক সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোমোহন ঘোষের পরিচয় করিয়ে দিতে চান। জ্ঞানদার বয়স তখন ১০ অথবা ১১। কিন্তু ঘরের লোক ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার এবং মেয়েদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাইরে আসার নিয়ম ছিলো না। সুতরাং একদিন রাতের বেলায় সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন এমনভাবে হেঁটে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন যাতে তাঁদের পায়ের শব্দ শুনে অন্যরা ভাবেন যে, একজনই হাঁটছে। 'কে যাচ্ছে'—এ প্রশ্ন করলে সত্যেন্দ্রনাথই তার উত্তর দেবেন, এমন স্থির ছিলো। জ্ঞানদার কক্ষে প্রবেশের পর সত্যেন্দ্রনাথ মনোমোহনকে জ্ঞানদার মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু জ্ঞানদা লজ্জায় এতো কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি মনোমোহনকে একটা কথাও বলতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরেই "সাক্ষাৎকারটি" সমাপ্ত হয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ

৮. Begum Shaista S. Ikramullah, **From Purdah to Paliament** (London : The Crescent Press, 1963), pp. 24-25.

৯ জনৈকা মহিলা 'লজ্জা', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৭২, পৃ. ১৫৯-৬০; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ২৪-২৫।

১০. প্যারীচরণ সরকার, 'পারিবারিক সংস্কার', **হিতসাধক**, মাঘ ১১৭৪, পৃ. ২৩৪।

১১. রাসসুন্দরী দেবী, বিভিন্ন স্থানে।

১২. চতুর্থ অধ্যায় প্রথম ও চতুর্থ ভাগ দ্রষ্টব্য।

ও মনোমোহন পুনরায় তালে তালে এক যোগে পা ফেলে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন।[১৩]

কয়েক বছর পরে জ্ঞানদা বোম্বাইতে এক উচ্চশিক্ষিত পার্সি পরিবারে কিছু কাল বাস করেন। প্রথম দিকে তিনি এতো লাজুক ছিলেন যে, সে পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যের সঙ্গে তিনি কোনো কথা বলতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই অবস্থাকে সদ্য খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১৪] ঐ পার্সি পরিবারের কর্তা, মানেকজী, জ্ঞানদাকে "মুগিনাসি" নাম দেন—যার অর্থ বোবা।[১৫] প্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টের স্ত্রী বলে, বোম্বাই-এর গবর্ণর স্যার বার্টেল ফ্রিয়ার একদিন জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু তিনি বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করার চেষ্টা করলেও, জ্ঞানদা একটি কথাও বলেন নি।[১৬] সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম যে ভোজসভার আয়োজন করেন, সেখানেও জ্ঞানদার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিলো না। যখন তাঁর ভোজনের সঙ্গী এসে তাঁকে টেবিলে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর হাত ধরেন, তখনি তিনি লজ্জায় ছুটে পালান।[১৭] প্রায় অন্য—সব বালিকা-বধূর মতোই, বিয়ের পর তিনি দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। তারপর শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ কী করে তাঁকে কথা বলতে বাধ্য করেন, সে খুব মজার ঘটনা। এক দিন সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদাকে বলেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি, জ্ঞানদা যা চাইবেন, তা-ই দিবেন। প্রলুব্ধ হয়ে জ্ঞানদা কথা বলেন এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে একটি ঘড়ি উপহার দেন, যা সেকালের বাঙালি মহিলার পক্ষে একটি অতিবিরল বস্তু ছিলো।[১৮] এ কথা যখন বিবেচনা করি যে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করাই বধূদের জন্যে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হতো, তখন পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করা-যে তাঁদের পক্ষে যথার্থ শক্ত কাজ বলে মনে হবে, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে?[১৯]

পুরুষ বা মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করার তুলনায় অনেক গুরুতর একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। ঘটনাটি ঘটেছিলো এ

১৩. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ২৪-২৫।

১৪. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, **বোম্বাই চিত্র** (কলকাতা : আদি: আদিব্রাহ্মসমাজ, ১৮৮৯), পৃ. ১০৬।

১৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ২৯-৩০।

১৬. ঐ, পৃ. ৩০।

১৭. ঐ, পৃ. ৩৪।

১৮. ঐ, পৃ. ২৫।

১৯. 'অবগুণ্ঠন', বামাপ, মাঘ ১২৭৬, পৃ. ৪৩১; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 'উন্নতি ও স্বাধীনতা', বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ৬৯; রাসসুন্দরী দেবী, পৃ. ৪১।

শতাব্দীর প্রথম দশকে। এ থেকে বোঝা যায়, মহিলারা কেমন ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে পর্দা পালন করতেন। রোকেয়ার এক অভিজাত আত্মীয়া কিউল স্টেশনে ট্রেনে উঠছিলেন। তাঁর পরনে ছিলো একটি ভারী বোরকা এবং সঙ্গে ছিলো একটি দাসী। তিনি হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের মাঝখানকার চাপা জায়গাটার ভিতর পড়ে যান। দাসীটি বোরকা ধরে তাঁকে টেনে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোরকাটি আটকে যায় এবং মহিলা উঠতে অসমর্থ হন। উপস্থিত কয়েকজন কুলি সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু দাসীটি কিছুতেই তাদেরকে সাহায্য করতে দিতে রাজি হয়নি। ট্রেন ছাড়ার সময় আগেই হয়ে গিয়েছিলো; তবু ট্রেনটি প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব করে। কিন্তু তখনো মহিলা উঠতে না-পারায়, শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি ছেড়ে দেয়। ফলে মহিলা সেখানেই পিষ্ট হয়ে মারা যান।[২০] এ ঘটনা সত্য হলে, এর থেকে ভয়াবহ ধরনের পর্দা আর কী হতে পারে? রোকেয়া তাঁর গ্রন্থে অবরোধবিষয়ক আরো ৪৬টি রোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ করলেও, কোনোটিই এমন বীভৎস বা নিষ্ঠুর নয়।[২১]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী যেভাবে গঙ্গার "পবিত্র" জলে স্নান করতেন, তাকে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু তা স্পষ্টত সেকালের অবরোধ প্রথার কঠোরতাকেই প্রমাণ করে। যখন সারদা দেবী গঙ্গাস্নান করতে চাইতেন, তখন পাল্কিবাহকরা তাঁর পাল্কিটি পুরোপুরি গঙ্গায় ডুবিয়ে নিয়ে আসতো আর তিনি পাল্কির মধ্যে বসে থাকতেন।[২২]

এ জাতীয় শারীরিক অবরোধকে সরাসরি কারাবাসের সঙ্গে যদি-বা তুলনা করা না-যায়, অন্তত পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের সঙ্গে নিশ্চয় তুলনা করা যেতে পারে। পর্দামানা ছাড়া, মেয়েদের গাড়িতে চড়া বারণ ছিলো। এমন কি জুতো পরাও নিষিদ্ধ ছিলো[২৩] তাঁদের স্বাধীনভাবে ভাববার কোনো "মানসিক" স্বাধীনতাও ছিলো না। ১৮৬০-এর দশকের ব্রাহ্মরা দাবি করেন যে, তাঁদের কোনোরূপ ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিলো না— বরং স্বামীদের মতো মূর্তিপূজা করা এবং কুসংস্কার মেনে চলাই ছিলো স্বাভাবিক।[২৪]

২০. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, **রোকেয়া রচনাবলী**, পৃ. ৪৮২।

২১. ঐ, পৃ. ৪৭৩-৫১২।

২২. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার', **প্রদীপ**, ভাদ্র ১৩০৬, প. ৩২৮।

২৩. ঐ, পৃ. ৩১৮, ৩১৯; সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি' **প্রবাসী**, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৭৫; বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ', **বামাপ**, ভাদ্র ১২৮১, পৃ ১৫২; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', নানা স্থানে। দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট ৩।

২৪. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব** (কলকাতা: কাব্যপ্রকাশন প্রেস, ১৮৬৯), পৃ. ১৩৮।

খাঁচা খোলার প্রয়োজনীয়তাসম্পর্কিত সচেতনতা

আমরা আগের অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি যে, স্ত্রীশিক্ষা ও পর্দা প্রথা সমস্যা দুটি একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলো। পর্দা অমান্য করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো যেতো না বলে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অসম্ভব ছিলো, আবার মহিলারা শিক্ষিত না-হওয়ায় তাঁদের ঘরের বাইরে পাঠানো যেতো না অথবা তাঁরা নিজেরাও হয়তো যেতে চাইতেন না। ১৮৫০-এর দশক নাগাদ ভদ্রলোক-দের একাংশ উপলব্ধি করেন যে মেয়েদের শিক্ষা দান করা উচিত। তবে হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো স্বল্প সংখ্যক দুঃসাহসী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই পর্দা ভেঙে তাঁদের কন্যাদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেননি।[২৫] সে পর্যায়ে স্ত্রীদের অথবা বয়স্ক মহিলাদের অবরোধ মোচন করা দূরে থাক, তাঁদের সামান্যতম ব্যক্তিস্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি।

১৮৬০-এর দশকে শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র একাংশে সাধারণভাবে মেয়েদের স্বাধীনতা এবং বিশেষভাবে অবরোধমোচনসংক্রান্ত মনোভাবের কিছুটা পরি-বর্তন হয়। সমাজের এ অংশ অবশ্য দেশীয় খৃস্টান ও ব্রাহ্মদের। ব্রাহ্ম-প্রভাবিত কিছু হিন্দুও হয়তো এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তার বড়ো একটা কারণ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব। কেশব এ সময়ে "প্রগতিশীল" ব্রাহ্ম যুবকদের তর্কাতীত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনু-সারীগণ—বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ব্যনার্জি, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ "নারীমুক্তি" বিষয়ে তাঁকে এক ধাপ ছাড়িয়ে যান। ১৮৫০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারকগণের ঝোঁক ছিলো স্ত্রীশিক্ষার ওপর। কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, স্ত্রীশিক্ষা তথা মহিলাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো অবরোধ প্রথা। তাঁরা আরো অনুভব করেন যে অবরোধের ফলে পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। কালিপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রকাশিত মহিলাবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালীপ্রসন্ন এ গ্রন্থে বলেন:

> নারীজাতিকে অন্নজলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দুঃখে দুর্গতি এবং পাপমুখে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ।... যদি শিক্ষা লাভ নারী

২৫. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

জাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, স্বাধীনতা যে তবে কেন বাঞ্ছিত হইবেনা, আমরা তাহা কোন মতেই অনুমান করতে পারি না। স্বাধীনতা বিরহে যথার্থ শিক্ষা লাভ করা কখনই সম্ভবপর হয় না।..স্বাধীনতা, সমুদয় নরনারীর ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক সম্পদ। মনুষ্য, মনুষ্যের স্বাধীনতার দাতা হন্তা নহে।. . .নারীর স্বাধীনতার ভাবী পরিণাম বিষয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয়, এবং কপোলকল্পিত আশঙ্কার উপর নির্ভর করিয়াই নারীজাতিকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা, আমাদিগের পক্ষে নিশ্চয়ই ঔদ্ধত্য।...ঈশ্বর যখন নরনারীকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তখন পৃথিবী বিচূর্নিত হইলেও, নারীজাতির স্বাধীনতার পরিণামে অমঙ্গল হইবে না।[২৬]

বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় কিশোরীচাঁদ মিত্র উপরন্তু এমন যুক্তি দেখান যে, একটি সমাজ কতোটা সভ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে সমাজে মহিলাদের অবস্থা কতোটা উন্নত, তা থেকে। তিনি তাই দেশবাসীকে এই বলে আহ্বান জানান যে, তাঁরা যেন দেশের এবং ন্যায়নীতি ও স্বাধীনতার নামে মহিলাদের শোচনীয় অধীনতা থেকে মুক্ত করে তাঁদের অবস্থা উন্নত করতে এবং তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।[২৭] ১৮৬৩ সালে জ্ঞান প্রকাশিনী সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে নবীনকৃষ্ণ বসুও কমবেশি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন।[২৮]

আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা এক দিকে অবরোধ মোচন করে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, অন্য দিকে তাঁরা অবরোধ প্রথাকে সভ্যতা-বিরোধী রীতি বলে গণ্য করেন। পর্দা প্রথা চালু করার জন্যে তাঁরা দায়ী করেন মুসলমানদেরকে। তাঁদের মতে দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসমান আগমনের পূর্বে অবরোধ প্রথা অজ্ঞাত ছিলো। এ সম্পর্কে প্রাপ্ত অপ্রতুল তথ্য থেকে অন্য রকম ধারণা হলেও, বাঙালি সমাজ-সংস্কারকগণ, এমন কি মহিলারা, বারবার এই যুক্তি দেখান যে, হিন্দুরা পর্দা প্রথা চালু করেন অংশত শাসক মুসলমানদের অনুকরণে, অংশত শাসকদের প্রলোভন থেকে মেয়েদেরকে রক্ষা করার তাগিদে।[২৯]

২৬. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারিজাতিবিষয়ক প্রস্তাব**, পৃ. ৬০-৬১, ১৫১, ১৯৮।

২৭. K. C. Mitra, 'Hindoo Women and Their Connection wirh the Improvement of the Country', **The Proceedings and Transactions of the Bethune Society** (Calcutta : Bishop's College Press, 1870), p. XXV.

২৮. N.K. Bose, **Female Education** (Calcutta : J.P. Sabha, 1873),p.7.

২৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য : 'এ দেশে বামাগণের বহির্ভ্রমণ'; **বামাপ**, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৮৫; 'অবরোধ প্রথার উৎপত্তি', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১০৭-০৮; কৃষ্ণকামিনী,

এ ধরনের সমালোচনা থেকে অবরোধ ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এক পরিবর্তিত মনোভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তবু কেউই সামান্য শিক্ষা দান ছাড়া অন্তঃপুরে বন্দী মহিলাদের অধিকতর আধুনিক করে তুলতে সাহসী হন নি। আগেই লক্ষ্য করেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষাও দেওয়া হতো গোপনে। কারো একজনের এই বাধা ভেঙে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিলো। ১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র সেন যখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গমন করেন, তখন এই বন্ধন মুক্তির সূচনা হয়। সেখানে কেশবকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য নিয়োগ করার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিলো। তখনো পর্যন্ত সম্ভবত এ অনুষ্ঠান তাঁর জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিলো। তিনি ছিলেন য়োরোপীয় চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। সুতরাং তাঁর স্ত্রী এ অনুষ্ঠান দেখুন এবং তাঁর জীবনের সাফল্যের অংশীদার হন এটা চাওয়া তাঁর পক্ষে স্বভাবিক ছিলো। কিন্তু কেশবের নিকটাত্মীয়রা এ কথা কল্পনাও করতে পারেননি যে, কোনো ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারেন। সুতরাং ভোজপুরী দারওয়ানের সাহায্যে তাঁরা কেশবের—তাঁদের মতে হঠকারিতা ও অবিবেচনা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন।[৩০] কিন্তু প্রবল বাধার মুখেও কেশব তাঁর স্ত্রীকে অন্তঃপুরের চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে যান এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুসারীগণও তা-ই করেন।

স্ত্রীকে অন্তঃপুরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও, অবরোধ মোচন করার ব্যাপারে কেশব খুব বৈপ্লবিক ছিলেন না। বস্তুত সমকালীন অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকগণের মতো তাঁর মধ্যেও অনেক স্ববিরোধিতা ছিলো। মহিলাদের মুক্ত করার জন্যে তিনি তাঁর অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুক্তির ধারণা খুব প্রশস্ত ছিলো না। আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, কেশব তাঁর স্ত্রীকে অংশতমাত্র মুক্ত করেছিলেন।[৩১] বস্তুত, কেশবের কৃতিত্ব পথিকৃতের। বহুজনের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালি মহিলারা খানিকটা আধুনিক হয়ে ওঠেন।

'স্ত্রীলোকদিগের সভয়', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৩৯; মৃন্ময়ী সেন; 'ভারত মহিলার শিক্ষা', **অন্তঃপুর**, ভাদ্র ১৩০৯, প ৯২।

৩০. P C. Mazoomdar, **The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen** (Calcutta: Baptist Mission Press), pp. 138-42; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র**, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৩৮), পৃ. ১৮০-৮১।

৩১. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে সাহসী সংস্কারকগণের অন্যতম, যিনি ১৮৬০-এর দশকেই এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা পরবর্তীকালে বঙ্গীয় নারীমুক্তির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রথম দেশীয় সদস্য, সত্যেন্দ্রনাথ জন স্টুআর্ট মিলের *Subjection of Women* গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[৩২] পিতার ইচ্ছানুসারে মাত্র ১৭ বছরে তিনি সাত বছরের জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ১৮৬২ সালে। সেখানকার সমাজে মহিলাদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ মর্যাদা লক্ষ্য করে তিনি তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তা ছাড়া, সমকালীন ইংলণ্ডে যে নারীমুক্তি আন্দোলন চলছিলো, তা-ও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়ে ইংলণ্ড থেকে তিনি তাঁর বালিকা-বধূকে যে-চিঠিপত্র লেখেন, তা থেকে বোঝা যায়, তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করার জন্যে তিনি কতোখানি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। বেশির ভাগ সংস্কারকের উল্টো, তিনি আন্তরিকভাবেই চাইতেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়ে উঠুক এবং তাঁর স্ত্রী যেন তাঁর সত্যিকারের সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন। উপরন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন সমানাধিকার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সেই ১৮৬৩ সালে তিনি লণ্ডন থেকে স্ত্রীকে লেখেন:

> আমি বাবা মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি। আমার ইচ্ছা যে তিনি তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।...আমি লিখিয়াছি যে আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীন পূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন।... যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।...তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীরের মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তুমি ইংলণ্ডে আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে।[৩৩]

৩২. ঠিক জানা নেই এ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো কি না অথবা হয়ে থাকলে কখন হয়েছিলো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ধারণা দিয়েছেন যে গ্রন্থটি ১৮৬৮ সালের আগে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু এটা অসম্ভব, কেননা মিলের গ্রন্থ ১৮৬৯ সালের আগে প্রকাশিত হয় নি। দ্রষ্টব্য: **ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়** (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০), পৃ. ২৮।

৩৩. **জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, তারিখ ১১.১.১৮৬৪, পুরাতনী পৃ. ৪৮-৪৯।**

সেকালে অন্য কেউ তাঁর পিতা কিংবা স্ত্রীকে এমন কথা লিখেছিলেন বলে জানা নেই। স্ত্রীকে তিনি আর-এক পত্রে লেখেন যে, তিনি (স্ত্রী) পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস করে তাঁর দেহ ও মনের কোনো বিকাশ ঘটবে না।[৩৪] হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে তিনি আর একখানা চিঠিতে লেখেন যে, তাঁর পিতা চান যে, তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) যেন অন্তঃপুরের রীতি ও নিয়মাবলী মেনে চলেন এবং স্ত্রীকে সেখানেই আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, স্ত্রীকে বন্দী রেখে তিনি কখনো সুখী হতে পারবেন না।[৩৫]

১৮৬৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসেন এবং আহমেদাবাদের সহকারী কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারেননি কারণ পিতা তাঁকে অনুমতি দেননি এবং আর্থিক দিক দিয়ে তিনি তখন পিতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এখন ভালো একটি চাকুরি পেয়ে তিনি স্ত্রীকে আহমেদাবাদ নিয়ে যেতে চাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দান করেন। অবশ্য তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, জ্ঞানদাকে যেন পাল্কিতে করে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়,—কারণ তখন মেয়েদের জন্যে গাড়িতে চড়া নিষিদ্ধ ছিলো।[৩৬] চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো যে, স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়াও তখন নিষিদ্ধ ছিলো। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে আহমেদাবাদ নিয়ে যাওয়ার যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা ছিলো নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। তাঁদের মতো অভিজাত পরিবারের কোনো ভদ্রলোক ইতিপূর্বে এমন কাজ করেন নি।[৩৭]

দু বছর পরে ১৮৬৬ সালে জ্ঞানদা যখন কলকাতায় বেড়াতে আসেন, তখন তিনি জাহাজ থেকে জোড়াসাঁকোয় যান, গাড়িতে করে। এর ফলে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা দারুণ অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথও খুব বিরক্ত হন এবং দীর্ঘদিন পুত্রবধূর হঠকারিতা ক্ষমা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, নিজেদের বাড়িতেই সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী একঘরে হন।[৩৮]

৩৪. ১৮.২.১৮৬৪ তারিখের পত্র, ঐ, পৃ. ৫৩।

৩৫. ২.৭.৬৪ তারিখের পত্র, ঐ, পৃ. ৫৮।

৩৬. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে...', পৃ. ৩১৮; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭৮; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ২৯।

৩৭. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৮. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে...', পৃ. ৩১৯-১৯; জ্ঞানদাকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৩১, ৫০, ৫২ ও ৭২, পুরাতনী, পৃ. ৯০, ১০৯, ১১২, ১১৩.

অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ এতে দমে যাননি। কয়েক মাস পরে গবর্নর জেনারেল তাঁর বাড়িতে আয়োজিত একটি ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালে, অসুস্থতাবশত সত্যেন্দ্রনাথ নিজে যেতে না-পারলেও স্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। বাঙালি মহিলাদের মধ্যে জ্ঞানদাই সর্বপ্রথম এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁর উপস্থিতিতে দেশীয় এবং য়োরোপীয় সকলেই খুব বিস্মিত হন। আগের অধ্যায়ে দেখেছি, প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষাদানও করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানদাকে ভোজসভায় দেখতে পেয়ে তিনি এতো উত্তেজিত ও ব্যথিত হন যে তক্ষুনি সভা ত্যাগ করে চলে যান।[৩৯]

যে ব্রাহ্ম যুবকরা স্ত্রীদের অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তবে লোকাচার অগ্রাহ্য করার সাহস তাঁদের ছিলো না। ব্যতিক্রম হিশেবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সদস্য রাখাল-চন্দ্র ও বিহারীলাল রায় নামক দুই ভাই-এর উল্লেখ করা যায়। স্থানীয় জনগণের মধ্যে হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়ে তাঁরা ১৮৬৬ সালেই গাড়িতে করে তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।[৪০] এবং এর অল্প দিন পরেই তাঁরা স্থানীয় য়োরোপীয় কর্মচারীদেরকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। এইভোজে রায়-ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন।[৪১] এই ঘটনা এতোই অসাধারণ ছিলো যে বঙ্গদেশের গবর্নর স্যার সেসিল বিডন এতে খুব মুগ্ধ হন এবং রায়-ভ্রাতাদের প্রশংসা করে বরিশালের কালেক্টরের কাছে একখানা পত্র প্রেরণ করেন।[৪২] এ কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সব দৃষ্টান্ত ছিলো নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী। নবযুবকরা আন্তরিকভাবে স্ত্রীদের অবরোধ মোচন করতে চাইলেও, প্রতিকূল জন-মতের জন্যে এ কাজ তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়তো। সত্যেন্দ্রনাথ অথবা রায়ভ্রাতারা যে এমন অনৈতিহ্যিক কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে, বিত্ত ও বিদ্যার জন্যে সমাজে তাঁদের স্থান ছিলো খুব উঁচুতে। তা ছাড়া, তাঁদের স্বাধীন আয়ের উৎস ছিলো, এবং ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিশেবে

৩৯. **গ্রামবার্তা প্রকাশিকা**, জানুআরি ১৮৬৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর** ইত্যাদি গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, পৃ. ১৮; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ৩৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭৯।

৪০. **বামাপ**, কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৪৭৮।

৪১. ঐ, ৩৭৭। ভোজসভাটি অনুষ্ঠিত হয় অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

৪২. ঐ।

For the text of the letter see, L. Ghose, **The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.** pt. 2 (Calcutta : Presidency Press, 1881), p. 89.

তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের তোয়াক্কা সামান্যই করতেন। এই জন্যেই বোধ হয় তাঁরা সমাজ-সমালোচনাকে অবহেলা করতে পেরেছিলেন।

বেশির ভাগ যুবককে, অপরপক্ষে, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য হিশেবে পারিবারিক ও সামাজিক বহু বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হতো। তাঁদের অনেকে তদুপরি পারিবারিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ অথবা রায়-ভ্রাতাদের মতো দর্শনীয় কিছু করা সম্ভব ছিলো না। তা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহু সদস্যই তুলনামূলকভাবে কম চোখে পড়ে এমন উপায়ে ধীরে ধীরে অবরোধ প্রথা লঙ্ঘন করেন। এই সমস্ত প্রয়াসই বাঙালি মহিলাদের সাধারণভাবে আধুনিক হতে এবং বিশেষ করে পর্দা ভাঙতে সহায়তা করে। কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের কলকাতা সফর কালে, ১৮৬৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, এমন দুটি ঘটনা ঘটে যা এ প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনাদ্বয় অবরোধের প্রতি পুরুষ ও নারীদের, বিশেষত ব্রাহ্ম-যুবক-যুবতীদের, পরিবর্তনশীল মনোভাব প্রতিফলিত করে।

নবযুগের দ্বারদেশে

বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম পুরুষ ও মহিলা মিলে ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মিস কার্পেণ্টারের সম্মানার্থে কলকাতায় একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সভা শেষে উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে পুরুষরা এতো উচ্ছ্বসিত হন যে, তাঁদের একজন একটি বক্তৃতা দেন। মহিলাদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন:

> ভগিনীগণ। আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাদিগের মঙ্গলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাঁহাদের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতা হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন।.....আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড়বস্তু নও, পশু নও যে, স্বামী যাহাই বলিবে তাহাই করিবে। আমরা তোমাদিগকে সেরূপ নীচভাবে শিক্ষা দিতে চাহি না। তোমরা যাহা ভাল জ্ঞান কর, তাহাই কর; আমাদিগের তাহাতে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই।...আমরা তোমাদিগের মতে চালিত হইতে পারি না এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চালিত হইতে পার না।[৪৩]

৪৩. 'ব্রাহ্মিকাদের অভিনন্দন', বামাপ, কার্তিক ১২৭৩, পৃ. ৩৭৬; অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৩৯০।

এই ব্রাহ্ম যুবকদের নেতা কেশবচন্দ্র সেন পরে এ ঘটনার কথা জানতে পেরে একে ঠিক অনুমোদন করতে পারেন নি।[৪৪] কিন্তু তবু পুরুষ ও নারীদের এরূপ একটি মিশ্রসভা পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় মিস কার্পেণ্টারের বাসায়। বামাবোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক এই উপলক্ষে তাঁর আনন্দ ও সম্মতি প্রকাশ করে মহিলাদেরকে "স্বাধীনতার ফল" উপভোগ করার আহ্বান জানান। তিনি মহিলাদেরকে আরো বলেন যে, তাঁদের স্বামীরা যদি তাঁদের স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করার সাহস না-পান, তবে তাঁরা যেন তাঁদের স্বামীদের নীচতাকে অবজ্ঞা করেন এবং বিধাতা তাঁদের যে-স্বাধীনতার মাল্যদান করেছেন, তাকে যেন তাঁরা গলায় পরিধান করেন।[৪৫]

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এ জাতীয় সামাজিক যোগাযোগ সেকালের বঙ্গদেশে অজ্ঞাত ছিলো। তপন রায়চৌধুরীর মতে, আত্মীয় নন এমন মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের যোগাযোগ হতে পারতো যদি এই মহিলারা বেশ্যা হতেন অথবা সংক্ষিপ্ত পরিচয় হতে পারতো প্রতিবেশী যুবতী হলে। অপরপক্ষে, নিজেদের পরিবারে অথবা প্রতিবেশী আত্মীয় পরিবারে কারো বিয়ে হলে তবেই নতুন বরের সঙ্গে আলাপ করে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে আলাপের আনন্দ পেতেন।[৪৬] কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন যে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন ইংরেজি-শিক্ষিত বন্ধু যখন পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের স্ত্রীরা খুবই আনন্দিত হন।[৪৭]

স্বামী এবং নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আলাপ করার অভিজ্ঞতা এই মহিলাদের ছিলো না। শুরুতে এজন্যেই তারা বেশির ভাগ খুব লজ্জা পেতেন এবং অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু পরে তাঁরা ধীরে ধীরে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে পুরুষদের মাঝে তিনি খুবই লজ্জা পেতেন এবং অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তিনি খুব

৪৪. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, পৃ ৩৪৬-৪৭।

৪৫. 'মিস মেরী কার্পেণ্টার', বামাপ, কার্তিক-অগ্রহায়ন ১২৭৩, প. ৩৭৬।

৪৬. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Like etc.', p. 20.

তপন রায়চৌধুরী তাঁর মন্তব্য করেন দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীর বরাত দিয়ে।

৪৭. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্মজীবন চরিত (নতুন সং; কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৬), পৃ. ৩৭।

আত্মজীবন চরিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকায় ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

কর্তাদুরস্ত ও বিদগ্ধ হয়ে ওঠেন।[৪৮] তিনি যে কেবল কয়েকটি ভাষায় সুন্দর ভঙ্গিতে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন তাই নয়, তিনি নাট্যাভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন।[৪৯] কোনো পুরুষ সহযাত্রী ছাড়াই তিনি ফ্র্যান্স ও ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন।

দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী মফস্বলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মানুষ হন। তাঁর ব্যবহারও ছিলো খুবই ঐতিহ্যিক। নিম্নের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, তিনিই সবার আগে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে উপাসনা সভায় অংশ নেন।[৫০] তিনি এ সব সভায় ভক্তিমূলক গানও পরিবেশন করতে শুরু করেন। সৌদামিনী রায় (রাখালচন্দ্র রায়ের পত্নী), রাজকুমারী ব্যানার্জি (শশিপদ ব্যানার্জির পত্নী), রাধারানী লাহিড়ী, জগদীশচন্দ্র বসুর তিন ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা, সুবর্ণপ্রভা, লাবাণ্যপ্রভা এবং অন্য অনেক ব্রাহ্ম মহিলাই ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে বেশ 'সামাজিক' হয়ে ওঠেন।[৫১] এমন 'উন্নত' ও 'সংস্কারমুক্ত' কয়েকটি নারীচরিত্র যে কেবল রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসেই লক্ষণীয় (এ উপন্যাসের কাহিনী ১৮৮০-৮২ সময়কার*) তাই নয়, ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন মহিলাও শতাব্দীর শেষ দু দশকের নারী প্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, প্রতিভা দেবী প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই কমবেশি 'উন্নত' ও 'সংস্কারমুক্ত' নারী হিশেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এঁরা সকলেই ছিলেন সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট ও শিক্ষিত এবং সকলেই খুব সহজে তাঁদের পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। ইন্দিরা দেবী ও হিরন্ময়ী দেবী যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী ও ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকেই বিয়ে করেন। সরলা দেবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন লোকেন পালিত, যাঁর সঙ্গে তিনি—তাঁর ভাষায়—সাহিত্য ও রাজনীতি আলোচনা করতে পারতেন এবং 'আহারে বিহারে, আমোদে-প্রমোদে সবতাতেই' তাঁর সঙ্গী ছিলেন।[৫২] যুবক-কবি মনোমোহন ঘোষও (অরবিন্দ ঘোষের

৪৮. Mary Carpenter, **Six Months in India**, vol. I (London: Green & Co., 1868), pp. 32-33.

৪৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্রজীবনী**, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ সং; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৭২), পৃ. ৩৪৯-৫১১; **পুরাতনী**, পৃ. ২০০-০১।

৫০. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫১. লাবণ্যপ্রভা ও হেমপ্রভা প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০-এর দশকে শিশু মাত্র।

* দ্রষ্টব্য: নীরদচন্দ্র চৌধুরী, **বাঙালী জীবনে রমণী** (তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭১), পৃ. ২১৮-২২।

৫২. সরলা দেবীচৌধুরাণী, **জীবনের ঝরাপাতা** (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮), পৃ. ৯৬।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র) সরলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সরলা দাবি করেন যে, মনোমোহনের 'সুন্দর সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চিঠিতে' তাঁর 'ডেস্ক ভরে গিয়েছিলো।'[৫৩] পুরুষ ও নারীর এ ধরনের সামাজিক যোগাযোগ বঙ্গদেশে ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিলো।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে এ কথা স্বীকার না-করে পারা যায় না যে, যে-বাঙালি মহিলারা ১৮৬৬ সালের আগে কখনো প্রকাশ্যেই গমন করেন নি, তাঁরাই এক দশকের মধ্যে "স্বাধীনতা"র পথে অনেকটা এগিয়ে যান।

এখন তাঁরা কেবল বিদেশেই যাচ্ছিলেন না (পরের আলোচনা থেকে বিস্তারিত জানা যাবে), জনসভায়ও উপস্থিত হচ্ছিলেন। মহিলাদের জনসভায় উপস্থিত হওয়ার প্রথম ঘটনা ঘটে বোধ হয় ১৮৭১ সালের ২৬ জানুআরি। কেশব সেনের এই সভায় অ্যানেট অ্যাক্রএডসহ দু-তিন জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।[৫৪] মাসখানেকের মধ্যে টাউন হলে অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় আরো বেশি সংখ্যক মহিলা উপস্থিত হন।[৫৫] সেকালে যাঁরা অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও আশা করেন নি যে, এতোকাল অন্তঃপুরে বন্দী থাকার পর তাঁরা এতো জনসভায় উপস্থিত হবেন। এ কারণে পুরুষদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ পুরুষই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। আলোচ্য সময়ে কেশব সেন-পরিচালিত ভারত সংস্কারসভার কতিপয় মহিলা কলকাতা যাদুঘর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। ১২৭৭ সালের চৈত্র সংখ্যা **বামাবোধিনী পত্রিকায়** এঁদের এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, এর ফলে তাঁরা আলোক-প্রাপ্ত হবেন। অপরপক্ষে, ঐ একই সংখ্যায় **বামাবোধিনী পত্রিকা** সমাবর্তন সভায় যোগদানকারী মহিলাদের নিন্দা করে। উপযুক্ত সময় আসেনি—এই যুক্তি দেখিয়ে পত্রিকায় মহিলাদের সভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তকে অবিবেচনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৫৬] বস্তুত, মহিলাদের সভায় যাওয়ার বিষয়টি জনমতকে এতোটা আহত করেছিলো যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তাও রামতনু লাহিড়ীর সমালোচনা করেন; কারণ রামতনু তাঁর কয়েকজন আত্মীয়াকে কেশব সেনের এক সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন।[৫৭]

৫৩. ঐ, পৃ. ১৭৮।
৫৪. Aunette Akroyd's diary, quoted in M.H. Beveridge, p. 90.
৫৫. **বামাপ**, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৫।
৫৬. ঐ।
৫৭. **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ২৮৯।

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতা সফরে এলে হাই কোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্মানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বেশ কিছু ঐতিহ্যিক মহিলা যুবরাজকে অন্তঃপুরে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।[৫৮] ব্রাহ্ম মহিলারা কয়েক বছর আগে থেকেই অ-রক্ষণশীল হতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলাদের অবরোধ প্রথা অগ্রাহ্য করার এটিই ছিলো বহুল প্রচারিত প্রথম দৃষ্টান্ত। এর ফলে, পর্দা অমান্য করার অপরাধে ঐতিহ্যিক হিন্দুরা এবং অন্তঃপুরে যুবরাজকে আতিথ্য জানানোর অপরাধে নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা জগদানন্দ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তীব্র সমালোচনা করেন।[৫৯]

সম্ভবত তাঁরা বারবণিতাই ছিলেন এমন কতিপয় মহিলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৩ সালের অগস্ট মাসে।[৬০] এধরনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে জনমত ছিলো খুবই প্রতিকূল। বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো দুজন আন্তরিক নারী-দরদীও এতে এতো ক্ষিপ্ত হন যে, তাঁরা আর কোনোদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে নাটক দেখেন নি।[৬১] অবশ্য পরবর্তী দশকে, ঠাকুর পরিবারের মহিলারা তাঁদের

৫৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস** (চতুর্থ সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১), পৃ. ১৭২; A. Chaudhuri, 'The Theatre', in **Studies in the Bengal Renaissance**, ed. by A. Gupta (Jadavpur: National Council of Education, 1958), pp. 301-02.

৫৯. **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**, পৃ. ১৭২-৭৩।
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বিদ্রূপ করে একটি প্রহসন এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচিত ও অভিনীত হয়। **গজদানন্দ ও যুবরাজ** শীর্ষক এই নাটক জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা এতো প্রশংসিত হয় এবং সরকার এ অভিনয়ে এতো বিব্রত বোধ করেন যে, এ অভিনয়কে বন্ধ করার জন্যে গভর্ণর-জেনারেল ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হন। এই আইনানুসারে কলঙ্কজনক, মানহানিকারক, দেশদ্রোহিতাব্যঞ্জক, অশ্লীল এবং কোনো না কোনোভাবে সাধারণের 'স্বার্থবিরোধী' সকল নাটকের অভিনয় বন্ধ করার ক্ষমতা সরকার নিজ হাতে নেয়। দ্রষ্টব্য: P. Pundit, 'The Dramatic Performances Bill', **Mookerjee's Magazine**, New Series, Vol. V, Nos. 36-40 (Jan-Jun., 1876).

৬০. সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহিলারা নাট্যাভিনয় করেন ১৬ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখে। দ্রষ্টব্য **মধ্যস্থ**, ১৪ ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ৪০৫-০৬।

৬১. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৯০; ইন্দ্রমিত্র, **সাজঘর** (কলকাতা, ১৯৬০), পৃ. ৪০।

বাড়ির নিজস্ব নাট্যাভিনয়ে অংশ নিতে আরম্ভ করেন। এই উদ্‌যোগকে অনেকেই প্রশংসা করেন, অথচ তাঁরা ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন।

চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা অন্তঃপুর থেকে অনেক দূরে

শিক্ষিত মহিলাদের "প্রগতিশীল" অংশের ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়নের মুখে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছিলো। এক দশক আগেও যে-বাঙালি মহিলাদের একমাত্র বাপের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যাবার হুকুম ছিলো না, তাঁরাই ১৮৬০-এর দশকের শেষভাগে বিদেশ যেতে শুরু করেন। এমন ঘটনা প্রথম বারের মতো ঘটে ১৮৬৯ সালে কলকাতার সুপরিচিত দত্ত পরিবারের খৃস্টান সদস্য গোবিন্দচন্দ্র দত্ত যখন তাঁর স্ত্রী ও দু কন্যাকে নিয়ে য়োরোপ গমন করেন।[৬২] অবরোধ প্রথা এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত নিম্ন মানের স্ত্রীশিক্ষা উভয়েই তাঁর কন্যাদের শিক্ষা ও মানসগঠনের অন্তরায় হবে বিবেচনা করে গোবিন্দচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথম অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি, তরু ও অরু— তাঁর দু কন্যা—ইংলণ্ড ও ফ্র্যান্সে খুব ভালো শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রতিশ্রুতিশীল কবিরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। তাঁদের উভয়ই যদিও একুশ-বাইশ বছর বয়সে মারা যান, তবু তাঁরা তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার জন্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষত তরুর একখানি ইংরেজি ও একখানি ফরাসী ভাষায় লেখা উপন্যাস যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়।[৬৩]

গোবিন্দচন্দ্র খৃস্টান ছিলেন বলে তাঁর পরিবারের দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমী বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু কেবল দেশীয় খৃস্টান নন, শীঘ্রই ব্রাহ্ম মহিলারাও য়োরোপ যেতে শুরু করেন। উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক ও সমাজ-সংস্কারক হিশেবে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট। তিনি ১৮৭১ সালে য়োরোপ গমনের সময়ে স্ত্রীকেও সঙ্গে নেন।[৬৪] তিনি সম্ভবত আশা করেছিলেন যে, এই সফর তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে

৬২. বামাপ, কার্তিক ১২৭৬, পৃ. ১৩৭; 'Notes onG ovin Chunder Dutt', **Calcutta Review**. Vol. CXV (1902), pp. 440-02.

৬৩. তাঁর রচিত চারখানা গ্রন্থের মধ্যে একখানাই—**A Sheaf Gleaned in France Fields** (1876)—তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো : **Bianca** (Published in **Bengal Magazine** in 1878) **Le Jaurnal de Madamoiselle Arvers** (1879) এবং **Ancient Ballades and Legends of Hindustan** (1882)।

৬৪. বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৭, পৃ. ৩৩৪।

প্রশস্ত করে তুলবে এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে তাঁর স্ত্রীও "আধুনিক" হয়ে উঠবেন। শশিপদ প্রায় হাতেনাতে ফল পেয়েছিলেন। আট মাস বিভিন্ন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে বাস করে তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব পাল্টে গিয়েছিলো।[৬৫] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে ইংলণ্ডে পাঠান ১৮৭৭ সালে। জ্ঞানদার ভাষায় 'বোধহয় ওদের ভাষা কায়দা-কানুন শেখবার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন'।[৬৬] সত্যেন্দ্রনাথ ৫, ৪ ও ২ বছরের তিনটি শিশুসহ জ্ঞানদাকে একটি ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে জ্ঞানদা হয়তো আরো দ্রুত ইংরেজি শিখতে বাধ্য হবেন। জ্ঞানদা আড়াই বছর ইংলণ্ডে এবং কয়েক মাস ফ্র্যান্সে বাস করেছিলেন। এ সময়ে তিনি এবং তাঁর সন্তানরা কেবল ইংরেজিই নয়, খানিকটা ফরাসি ভাষাও শিখেছিলেন।[৬৭] (পরবর্তীকালে কন্যা ইন্দিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতক হয়েছিলেন।) তাছাড়া, জ্ঞানদা খুব ফ্যাশন দুরস্ত ও বিদগ্ধ মহিলায় পরিণত হয়।

কেবল খৃস্টান এবং ব্রাহ্ম মহিলারাই য়োরোপ যাচ্ছিলেন, তা-ই নয়, ঐতিহ্যিক হিন্দু রমণীরাও য়োরোপের পথে পাড়ি জমান। মনোমোহন ঘোষ ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্ভবত দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না।[৬৮] ব্যারিস্টার হয়ে ১৮৬৭ সালে দেশে ফিরে আসার পর মনোমোহন তাঁর অশিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীবর্জিত স্ত্রীকে "সংস্কৃত" করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবিলম্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটি কনভেন্টে পাঠান এবং সেখানে তাঁর স্ত্রী উৎকৃষ্ট ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি আদব-কায়দা শেখেন। তা ছাড়া, তিনি এখান থেকেই ইংরেজি পোশাক পরা আরম্ভ করেন।[৬৯] কিন্তু মনোমোহন এতেও তৃপ্ত হন নি, তাই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দুবার ইংলণ্ডে যান। একজন সম-সাময়িক জীবনীকারের মতে বাহ্যত এর ফলে শ্রীমতী ঘোষ 'ইংরেজ মহিলাদের

৬৫. A.R. Banerji, **An Indian Pathfinder : Memoirs of Sebabrata Sasipada Banerji** (2nd ed.; Calcutta : Sadharan Brahmo Samaj, 1973), Passim.

৬৬. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতি কথা', পৃ. ৩৮।

৬৭. ঐ, পৃ. ৩৮-৩৯।

৬৮. ডেভিড কফের মতে মনোমোহন ব্রাহ্ম ছিলেন। See **The Brahmo Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind**, p. 91, 259.

৬৯. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পৃ. ২৯।

মতোই ইংরেজ সমাজে মেলামেশা করতে পারেন।'[৭০] আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর। কন্‌গ্রেসের এক সময়কার সভাপতি, উমেশচন্দ্র একটি ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষদের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি যখন ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ন করছিলেন, তখনই তিনি মহিলাদের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন। যাতে তিনি লেখাপড়ায় আরো অগ্রগতি করতে পারেন, তার জন্যে তিনি তাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে হেমাঙ্গিনী দেবী একজন 'বিদগ্ধ মহিলা'য় পরিণত হয়েছিলেন।[৭১] মনে হয়, ইংরেজি শিক্ষা তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিচলিত করে-ছিলো। তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য উমেশচন্দ্র হিন্দুই থেকে যান। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্ত্রীশিক্ষার কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং তাঁরা কন্যাকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দানের সংকল্প গ্রহণ করেন।[৭২] উমেশচন্দ্র তাঁর ভগ্নী মোক্ষদায়িনীকেও লেখাপড়ার উৎসাহ দিয়েছিলেন। মোক্ষদায়িনী ১৮৭০ সালে **বঙ্গ মহিলা** নামে একটি মহিলা পাক্ষিক প্রকাশ করেন।[৭৩]

১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে যে-মহিলারা য়োরোপ সফরে যান, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত কৃষ্ণভাবিনী দাসই রক্ষণশীল ধারার সব চেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর অবশ্য বাল্যকাল থেকেই অন্তঃপুরের বাইরের জগৎকে দেখার এবং য়োরোপে যাওয়ার প্রবল বাসনা ছিলো। ইংলণ্ডে সফরের ও সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যে-গ্রন্থ রচনা করেন, তার ভূমিকায় তিনি বলেন :

> পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের মতো একটি বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত যাইতেছেন কিম্বা কেহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন

৭০. R·G. Sanyal, **A General Biography of Bangal Celibritis Both Living and Dead** (Reprint: Calcutta: Rddhi, 1976; Furst published in 1889), p. 24

৭১. **Ibid.**, p. 48.

৭২. **Ibid.**, p. 49.

৭৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **বাংলা সাময়িকপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড** (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫২), পৃ. ১১।

নাচিয়া উঠিত। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না ; সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম।[৭৪]

অন্তঃপুর থেকে মুক্তি লাভ সম্পর্কে তিনি আরো লেখেন :

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।···
কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,
যায় মা !
কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,
পারিনা জননি। সে দেশে যাইতে,
বিদ্যাজ্ঞান ধনে হৃদয় ভূষিতে,
দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা।
মোরা হইয়া মানব,
রয়েছি পিঞ্জরে চক্ষুহীনা সব,
করিতে পারি না কোন উপকার
তাই বহু কষ্টে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে
হয়েছি বাহির জ্ঞানচক্ষু তরে,···[৭৫]

প্রায় এক দশক (১৮৮২-১৮৯০) ইংলণ্ডে বাস করার পর, তিনি এক ভিন্ন নারীতে রূপান্তরিত হন। তাঁর পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। একটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুচ্ছেদে তিনি এই পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন :

কথায় বলে যে, ক্রীতদাস পর্যন্ত ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইয়া যায় ; আমি নিজেও দেখিতেছি যে, যতদিন হইতে ইংলণ্ডের স্বাধীন বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন

৭৪. কৃষ্ণভাবিনী দাস ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা (কলকাতা : সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৮৮৫), পৃ. ২।
৭৫. ঐ, পৃ. ১৯, ২০, ২১।

ভাবের উদয় হইয়াছে। এ ভাব যে কি তাহা আমার দেশীয় ভাইভগিনীদের নিকটে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। ভারতবর্ষে যতদিন ছিলাম এ সকল কিছুই জানিতাম না, মনেও ভাবিতাম না যে, মানুষের জীবনের এত রূপান্তর আছে। পুস্তকে নানা দেশের বিষয় পড়িতাম—এ দেশ স্বাধীন, ও দেশ পরাধীন, এ দেশের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার, ওদেশের রাজ্যব্যবস্থা নিয়মতন্ত্র—এরূপ কত পড়িতাম, এক রকম করিয়া কথার মানে বুঝিতাম; কিন্তু ঐ কথাগুলি যে কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কত গূঢ় বিষয় সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইত না।... এখন দেখিতেছি যে যেমন অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত, তাহাকে রাত দিনের প্রভেদ যতই কেন বুঝাইয়া দাও না সে সকল জিনিস কাল দেখিবে, সেই রূপ আমিও এত দিন সকল লোককে পরাধীন চক্ষে দেখিতাম।[৭৬]

সাধারণ শিক্ষিত পর্দানশীল মহিলা হলেও, দ্রুত তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেন। ইংলণ্ডে থাকা কালেই তিনি লিখতে শুরু করেন এবং তার মধ্য দিয়েই তাঁর এই বর্ধিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ইংলণ্ড ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে এবং তাঁর প্রবন্ধসমূহ শিগগিরই ভারতীসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। মহিলাদের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর রচনায় যে ধারণা প্রতিফলিত হয়, তা ছিলো নিঃসন্দেহে আধুনিক এবং উল্লেখযোগ্য। সেকালে ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে যে অগ্রগতির আন্দোলন চলছিলো, তিনিই প্রথম তার সঙ্গে এ দেশীয় পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বাঙালি মহিলাদের জন্যে একই ধরনের অগ্রগতির ওকালতি করেন।[৭৭]

এখন একজন মহিলার পক্ষে য়োরোপ ভ্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে, কিন্তু একশ বছর আগে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিলো। সমুদ্রযাত্রা করলে 'জাত' যেতো। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর য়োরোপ গিয়েছিলেন সত্য,[৭৮] কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছিলো এই জন্যে যে, তাঁরা ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা দেশাচারকে

৭৬. **ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা**, পৃ. ২৫৩-৫৪।

৭৭. ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধ 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি: **ভারতী ও বালক**, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১৯৮-২০২ এবং **ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা** দশম ও দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আরো দ্রষ্টব্য আমার প্রবন্ধ: 'বঙ্গদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ: কৃষ্ণভাবিনী দাস,' **জিজ্ঞাসা**, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (জুলাই-অক্টোবর, ১৯৮২), পৃ. ১২৮-৪৩।

৭৮. রামমোহন য়োরোপ যান ১৮৩২ সালে, দ্বারকানাথ ১৮৪২ ও ১৮৪৫ সালে।

অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। সে যুগের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে-যুবকগণ শিক্ষা লাভের জন্যে বিলেত যেতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই দেশে ফিরে কালাপানি পার হওয়ার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।[৭৯] সুতরাং বলা যায় যে, আলোচ্য মহিলারা য়োরোপ গমন করে সামাজিক রীতির প্রতি অসাধরণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং এঁদের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, য়োরোপ ভ্রমণ তাঁদের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ওপর প্রবল ছাপ ফেলেছিলো।

পর্দা প্রথার ক্রমবিলোপ এবং মহিলাদের ওপর তার প্রভাব

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, অল্প সংখ্যক শিক্ষিত নগরবাসী ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম-প্রভাবিত হিন্দু এবং দেশীয় খৃস্টানরাই অবরোধ প্রথা অমান্য করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। পর্দা প্রথাকে তাঁরা অবশ্য পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেন নি বা করতে পারেন নি। কেবল বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেই তাঁরা অবরোধকে অস্বীকার করেন। তা হলে একে কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়? এর ফলে তাঁরা মুক্তির যে-সামান্য আস্বাদ লাভ করেন, বিচার করলে এখন তাকে তেমন বৈপ্লবিক মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, এঁদের দৃষ্টান্তসমূহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমানসংখ্যক মহিলাদের ওপর প্রভাবের বীজ রোপন করে।

তাছাড়া, পরবর্তী রমণীরা যে-অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেন, অবরোধ মোচন ছিলো তার প্রথম পরীক্ষামূলক সোপান। পূর্ববর্তী মহিলারা অন্তঃপুরের চতুর্দেয়ালের বাইরে আসতে না-পারলে, পরবর্তী মহিলারা যে স্বাধীনতার ধারণা লাভ করেন অথচ যতোটা স্বাধীনতার জন্যে হৈ চৈ করেন, তা সম্ভব হতো না। অবরোধ প্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের ধারণার যে-বিপুল পরিবর্তন হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে তা লক্ষ্য করা যাবে।

৭৯. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে হিন্দুদের মনোভাব বেশ বিরূপ ছিলো। এই মনোভাব দূর করার উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় ঐতিহ্যিক হিন্দুদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। অন্তত ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত এ কমিটি কার্যকর ছিলো। See P. Sinha, **Nineteenth Century: Aspects of Social History** (Calcutta ; Firma K.L. Mukhopadhyay, 1965), pp. 139-41, 151-59.

তৃতীয় অধ্যায়

বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানিঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মহিলাদের অবস্থা আদৌ ঈর্ষাযোগ্য ছিলো না; কারণ তাঁরা অশিক্ষিত ও অন্তঃপুরে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের শিক্ষিত ও পর্দার নিগড় থেকে অংশত মুক্ত মহিলাদের তুলনায় তাঁরা যে কম সুখী ছিলেন, তা মনে হয় না। পূর্ববর্তী মহিলারা শৈশব থেকেই সেকালে প্রচলিত জীবনধারা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু পরবর্তী মহিলারা এমন কতোগুলো নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেন যা তাঁদের চারদিকের অধিকাংশ মানুষের কাছেই ছিলো গ্রহণের অযোগ্য। অন্তঃপুর ও পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে তাঁরা ক্রমশ অতৃপ্ত হয়ে পড়ছিলেন। একবার শিক্ষা গ্রহণের পর তাঁরা আর আগের প্রজন্মের মহিলাদের মতো ভাবতে পারছিলেন না। তদুপরি, যাঁরা একবার অন্তঃপুরের বাইরের জীবনের স্বাদ পেয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে নিজেদেরকে আর অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিলো না। গার্হস্থ্য জীবনের তুচ্ছতার বাইরে তাঁরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা খুঁজতে আরম্ভ করেন। প্রথম বারের মতো, তাঁরা এ কথা ভাবতে শুরু করেন যে, মহিলারাও পুরুষদের মতো স্বাধীনভাবে এবং সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজই তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। বস্তুত, এঁরা যে কেবল নিজেদের স্বাধীনতা সম্পর্কেই সচেতন হন, তা-ই নয়, তাঁরা স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কেও স্পষ্ট একটা ধারণা নির্মাণ করেন।

মহিলাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ হওয়ায় এবং ভদ্রলোকদের, বিশেষত ব্রাহ্মদের মধ্যে পর্দা প্রথার কড়াকড়ি হ্রাস পাওয়ায়, মহিলারা পারিবারিক পরিধির বাইরে অধিকতর কার্যকলাপে অংশ নিতে শুরু করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রার্থনা সভায় যোগদান থেকেই এর সূত্রপাত। এরূপ প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮৬৬ সালের জানুআরি মাসে। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মদের বাৎসরিক মাঘোৎসবে প্রায় ৫০ জন মহিলা যোগদান করেছিলেন। পুরুষরা চলে যাওয়ার পর, একটি পর্দার আড়ালে বসে দেবেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ধর্মীয় উপদেশ শোনার জন্যে মহিলাদের অনুমতি দেওয়া হয়।[১] এর কয়েক মাস পর দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী এবং আর-একজন মহিলা (যার নামোল্লেখ করা হয়নি, তবে অনুমান করি সৌদামিনী রায়) বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের একটি সাপ্তাহিক উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এঁরা অন্য পুরুষ সদস্যদের সঙ্গেই এই উপাসনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন,—এই অর্থে এঁরা দুজন পূর্বোক্ত মহিলাদের তুলনায় এক ধাপ অগ্রসর ছিলেন।[২] তাঁদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, বরিশালের ব্রাহ্ম মহিলারা উপাসনা সভায় যোগদান করা ব্যতীত আর কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু কলকাতার ব্রাহ্ম মহিলারা ঐ বছরেই ব্রাহ্মিকা সমাজ নামে মহিলাদের প্রথম একটি সমিতি চালু করেন। এইটিই ছিলো বঙ্গদেশে মহিলাদের প্রথম সমিতি। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, ঐ বছর নভেম্বর মাসে এই সভার পক্ষ থেকে মেরী কার্পেণ্টারকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই সমিতি নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করে।

পুরুষরা মহিলাদেরকে কতোটা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং কতোটা পর্দা ভাঙতে দিতে রাজি ছিলেন, ব্রাহ্মিকা সমাজ ছিলো তার একটা পরীক্ষা; যদিও এ সমাজের লক্ষ্য ছিলো প্রধানত ধর্মীয়। ঠাকুর-পরিবার-নিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল আদি ব্রাহ্মসমাজ ধর্মের নামেও মহিলাদেরকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে দিতে অসম্মতি জানায়।[৩] এমনকি কেশব সেন-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও উপাসনা সভায় মহিলাদের শরিক হওয়ার প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭২ সালের জানুআরি মাসে, যখন কয়েকজন মহিলা উপাসনা অনুষ্ঠান চলাকালে স্ব স্ব পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে পর্দার বাইরে বসতে চান। এঁদের মধ্যে ছিলেন দুর্গামোহন দাস ও অন্নদাচরণ খাস্তগীরের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। "প্রগতিশীল"

১. বামাপ, ফাল্গুন ১২৭২, পৃ. ২১৬-১৭।

২. বামাপ, আষাঢ় ১২৭৩, পৃ. ৩০২।

১৮৬৭ সালের জানুআরি মাসে কিশোরীলাল মৈত্রের কলকাতাস্থ বাসভবনে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্ম পুরুষ ও নারী একত্রিত হয়ে মাঘোৎসব উপলক্ষে একটি উপাসনা অনুষ্ঠান করেন।—বামাপ, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৪৪।

৩. দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সালের মাঘোৎসবে মহিলাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে উপাসনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলেও, ১৮৬৭ সালে অনুরূপ অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।—বামাপ, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৪৪।

চিন্তাধারার জন্যে সুপরিচিত হলেও, কেশব মহিলাদের পর্দার বাইরে বসতে দিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি যুক্তি দেখান যে, এর ফলে অন্য পুরুষদের মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে।[৪] এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দুর্গামোহন, অন্নদাচরণ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এবং অপর কয়েকজন মিলে বৌ বাজারের একটি বাড়িতে একটি আলাদা উপাসনা সভার আয়োজন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু উভয়ই মহিলাদের আধুনিকতার প্রশ্নে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই "বিদ্রোহী" উপদলকে স্বতন্ত্র উপাসনাসভা স্থাপনে উৎসাহ দেন। কারণ তাঁরা সম্ভবত চাচ্ছিলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিখণ্ডিত হোক।[৫] কয়েক মাস পরে কেশব যখন এই দলের দাবি স্বীকার করে নেন, মহিলারা তখন সাপ্তাহিক উপাসনা অনুষ্ঠানের সময়ে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বসার অধিকার লাভ করেন। অবশ্য এর ফলে উপাসনা অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি যে দারুণ বৃদ্ধি পায়, তা নয়।[৬] বস্তুত, মহিলারা (এবং তাঁদের সঙ্গে দুর্গামোহনের মতো পুরুষরা) একটি অধিকার নিয়ে লড়াই করছিলেন। অধিকাব আদায়ের পরে, তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। এ থেকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাঁদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতাই প্রকাশ পায়। তারা পুরুষদের সঙ্গে অধিকতর মেলামেশা করতে আগ্রহী ছিলেন কি না, বলা শক্ত। কিন্তু তাঁরা অন্তঃপুরের বাইরে একটি জীবন খুঁজে পান এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি মেলামেশা করতে উৎসুক হন।

মহিলাদের অধিকারের প্রশ্নে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে যে-সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে, তা ঐ সমাজের বিবদমান দুই উপদলের মতপার্থক্যকে তীব্রতর করে। এর মধ্যে একদল ছিলেন মহিলাদের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, অন্যদল সীমিত অধিকারে।[৭] মহিলাদের উচ্চতর শিক্ষার ঔচিত্য নিয়ে ১৮৭৪ সালে দু দলের ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পায় এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস,

৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ২৭০।

৫. নতুন সমাজের প্রতি তাঁর সমর্থন ও উৎসাহ দেখানোর জন্যে চৈত্র মাসে তিনি একটি উপাসনা অনুষ্ঠানে উপদেশ দান করেন।—দ্রষ্টব্য : তত্ত্বপ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ (১৮৭২), পৃ. ২৭-৩০। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধেই রাজনারায়ণ বসু এই সমাজের আচার্য হিসেবে কাজ করতে রাজি হন।—দ্রষ্টব্য : রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ১৯৭।

৬. বামাপ, ভাদ্র ১২৭৯, পৃ. ১৬৮।

৭. রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র মধ্যস্থ ব্যঙ্গ করে কেশব-অনুসারীদের "প্রগতিশীল" এবং বিদ্রোহীদের "বেড়ে প্রগতিশীল" বলে আখ্যায়িত করে। দ্রষ্টব্য : মধ্যস্থ, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, পৃ. ১১৭। হালিসহর পত্রিকা এদের নাম দেয় যথাক্রমে 'বক্তৃতামূলক' ও 'স্ত্রীসর্বস্ব'।

অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমদর্শী নামে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা একটি উপদলের জন্ম দেন।[৮]

মহিলারা ধর্মে তাঁদের গভীর উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন কি না, ঠিক বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের উৎসাহ যে অন্যান্য খাতেও প্রবাহিত হচ্ছিলো, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে পুরুষরাই মহিলাদেরকে অন্যান্য বিষয়ের দিকে তাকাতে সাহায্য করছিলেন। উদাহরণ হিশেবে কেশব সেনের নামও উল্লিখিত হতে পারে। সমাজ সংস্কারের নতুন উদ্যম ও ধারণা নিয়ে কেশব বিলেত থেকে ফিরে আসেন ১৮৭০ সালে। সংস্কারের মাধ্যমে বিশেষ করে মহিলা ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করবেন, এ সময় তিনি এরূপ আশা করে-ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সংস্কার সভা এবং তার অধীনে একটি মহিলাদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৯] এর পর ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে তিনি বামাহিতৈষিণী সভা নামে মহিলাদের প্রথম সত্যিকার "সামাজিক" সমিতি স্থাপন করেন। তিনি নিজে এ সভার সভাপতি হন। লেডি ফিয়ার এবং মিস পিগট—এই দুই য়োরোপীয় মহিলা ছাড়াও, স্বর্ণলতা ঘোষ (মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী), ব্রহ্মময়ী (দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী), হেমাঙ্গিনী দেবী (উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির স্ত্রী), এবং আরো কয়েকজন মহিলা এই সভার পরিচালক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রতি পক্ষে (শুক্রবার) একবার এই সমিতি মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০] সমিতির দ্বিতীয় সভায় ৩০ জন মহিলা উপস্থিত হন এবং চারজন মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১১] সুতরাং এ কথা বললে অসঙ্গত হবে না যে, কেশবচন্দ্র সেন একই সঙ্গে মহিলাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে এবং পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আবার ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাসভায় পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বসতে বাধা দিচ্ছিলেন।

৮. S. Sastri, **History of the Brahmo Samaj**, pp. 163-64.

সমদর্শী দল ১৮৭৪ সালে সমদর্শী নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় লেখা রচনা প্রকাশ করতো। আশ্চর্যের বিষয় অন্তত প্রথম বছরে এ পত্রিকায় সমসাময়িক বঙ্গীয় স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি।

৯. বামাপ, পৌষ ১২৭৭, পৃ. ২৭৩।

১০. বামাপ, বৈশাখ ১২৭৮, পৃ. ৩৯২-৯৩।

মহিলাদের একটি সমিতি স্থাপন করা যায় কি না, ভারত সংস্কার সভার একটি অধিবেশনে ১৮৭০ সালের অক্টোবরে এ নিয়ে আলোচনা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশব তখনো ইংলণ্ড থেকে ফেরেননি। দ্রষ্টব্য: বামাপ, কার্তিক ১২৭৭, পৃ. ২২৪।

১১. বামাপ. বৈশাখ ১২৭৮, পৃ. ৩৯২।

এই স্ববিরোধিতার ফলে, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭২ সালে প্রায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উমেশচন্দ্র দত্তের মতো পুরুষদের সহায়তা পেলেও, মহিলারা নিজেরাই 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর নবগঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভক্ত মহিলারা তাঁদের নিজেদের একটি সমিতি থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৮৭৯ সালের অগস্ট মাসে তাঁরা এই সমিতি স্থাপন করেন।[১২] রাধারাণী লাহিড়ী, স্বর্ণপ্রভা বসু, কাদম্বিনী বসু, কৈলাসকামিনী দত্ত, সরস্বতী সেন, কামিনী সেন প্রমুখ মহিলা যাঁরা পূর্বে বামাহিতৈষিণী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাই বঙ্গ মহিলাসমাজের প্রথম দিককার সব চেয়ে বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। সমিতিটি শুরু হয় ৪১ জন সদস্য নিয়ে। কিন্তু শীঘ্রই আরো অনেকে এর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮০ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম বাৎসরিক সভায় প্রায় ১০০ জন মহিলা উপস্থিত হন।[১৩] যদিও বামাবোধিনী পত্রিকা-য় দাবি করা হয়েছিলো যে, কেবল ব্রাহ্ম আদর্শে বিশ্বাসী মহিলারাই এই সভার সদস্য হতে পারবেন[১৪], তবু মনে হয়, ধর্মীয় ব্যাপারে এ সভা সামান্যই মনোযোগ দিতো। এ বিষয়ে বামাহিতৈষিণী সভা ছিলো উল্টো—সেখানে ধর্মালোচনাই প্রাধান্য লাভ করে। বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে যে-সব প্রবন্ধ পড়া হতো, তাদের বিষয়বস্তু ছিলো নীতিশাস্ত্র, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি; কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয় নয়। অচিরেই এই সভা বেশ কয়েক জন য়োরোপীয় মহিলার সমর্থন লাভ করে। প্রথম তিন বছরে এই সভা কম পক্ষে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলো—একখানার লেখিকা রাধারাণী লাহিড়ী, অন্য খানার রমাসুন্দরী ঘোষ।[১৫]

বামাহিতৈষিণী সভা ও বঙ্গ মহিলাসমাজের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, দেশীয় খৃস্টান মহিলারা তাঁদের নিজেদের সমিতি স্থাপন করেন ১৮৮১ সালে। এর সম্পাদক হন কামিনী শীল। এ সমিতির নিয়মিত সদস্য ছিলেন ৩৫ জন। ১৮৮২ সালের ১২ নভেম্বর এ সমিতির প্রথম বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে প্রায় ৩০০ পুরুষ ও নারী উপস্থিত হন। বঙ্গ মহিলাসমাজের মতো এ

১২. বামাপ, মাঘ ১২৮৬, পৃঃ ১১৬।
১৩. বামাপ, মাঘ ১২৮৭; পৃ. ৩১৭।
১৪. বামাপ, বৈশাখ ১২৮৭, পৃ. ২৮।
১৫. বামাপ, মাঘ ১২৮৭, পৃ. ৩১৯।

সমিতিও নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করতো এবং এ-সব সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হতো। তবে অন্য দুটি মহিলা সমিতিকে এক ধাপ পেছনে ফেলে এ সমিতি সামনে এগিয়ে যায় ১৮৮১ সালে, যখন কামিনী শীলের সম্পাদনায় এ সমিতি খ্রীষ্টীয় মহিলা নামক একটি মাসিক পত্রিকা করে।[১৬] এটা ছিলো মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা—প্রথমটি ছিলো ধুলিয়ানের থাকমণি দেবী-সম্পাদিত অনাথিনী (১৮৭৫)।[১৭]

১৮৮১ সাল নাগাদ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং খৃস্টান মহিলাদের সকলেরই স্ব স্ব মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারাও নিজেদের অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপনের প্রায়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা কর্নেল এইচ. এস. অলকট-পরিচালিত আধ্যাত্মিক আন্দোলন নিয়ে যথেষ্ট মেতে ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা আরো বেশি করে উপলব্ধি করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬ সালে 'সখী সমিতি' নাম দিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী এই সভা শুরু করেন। তিনি অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের অন্য দুভাগের, এমনকি ঐতিহিাক হিন্দু মহিলাদেরও তাঁর সভার অন্তর্ভুক্ত করেন। বস্তুত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়া সৃষ্টি করাও এ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো। তা ছাড়া, অসহায় বিধবা ও অনূঢ়াদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলাও এর লক্ষ্য ছিলো। সখী সমিতির আর-একটি কাজ ছিলো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলা থেকে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী আয়োজন করা।[১৮] এর ফলে মহিলারা হাতের কাজের প্রতি আগ্রহ বোধ করবেন, সমিতির পরিচালকরা এমন আশা করেছিলেন। সরলা দেবীর মতে, সখী সমিতি ধর্ষিতা মহিলাদেরকে আইনগত সমর্থনও দান করতো।[১৯]

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়া সৃষ্টি করতে পেরে থাকুক অথবা না-ই থাকুক, সখী সমিতি তার অন্তঃপুর শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে বেশ কিছু মহিলাকে শিক্ষা দান করেছিলো এবং তার আয়োজিত হস্তশিল্প

১৬. বামাপ, বৈশাখ ১২৮৮, পৃ. ৩: মাঘ ১২৮৮, পৃ ২৬৪।

১৭. ১৮৭০-এর দশকে মহিলারা অন্য যে-সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেন সেগুলি হিন্দু ললনা (১৮৭৮) ও বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক, ১৮৭০)।

১৮. 'সখী সমিতি উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী', ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৭, পৃ. ৫০৮।

১৯. সরলা দেবী, জীবনের ঝরা পাতা, পৃ. ৫৯।

প্রদর্শনীও বেশ সাফল্য অর্জন করে। তা ছাড়া, মনে হয় পূর্ববর্তী মহিলা সমিতি-গুলির তুলনায় সখীসমিতি অধিকসংখ্যক মহিলাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলো। অন্যতম প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ১৮৮৮ সালে সখী সমিতির তহবিলে ১৬২ জন মহিলা মোট ২,৪০০ টাকা দান করেন।[২০] ভারতী-তে সখী সমিতির সদস্যাদের যে-তালিকা প্রকাশিত হয় তা থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ সদস্যাই ছিলেন ব্রাহ্ম মহিলা। তবে হিন্দু মহিলাও কম ছিলেন না এবং কয়েক জন খৃস্টান ও দু-একজন মুসলমান মহিলাও এর সদস্য হয়েছিলেন। তদুপরি, কেবল কলকাতার নন, এই মহিলারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দা ছিলেন।[২১] সখী সমিতি তার নিজস্ব সাময়িকী প্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত ভারতী সখী সমিতির মুখপত্রের মতোই ছিলো। স্বর্ণকুমারী দেবী এতো পারদর্শিতার সঙ্গে ভারতী সম্পাদনা করতেন যে, পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন মহিলা এর দৃষ্টান্তে অন্তঃপুর এবং জাহ্নবীর (১৯০৪) মতো সাময়িকী প্রকাশ করতে উৎসাহ বোধ করেন।

১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি বঙ্গমহিলাসমাজ এবং সখী সমিতি উভয়ই তাদের উৎসাহ অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। তবে বোধ হয় এ জন্যে নয় যে, মহিলারা সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন; বরং বোধ হয় এ জন্যে যে, সমিতির পরিচালনার সার্বক্ষণিক কাজ তদারক করার মতো কেউ ছিলেন না। বস্তুত, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, মহিলারা ক্রমশ অধিকতর সক্রিয় হচ্ছিলেন এবং তাঁদের কার্যকলাপের সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—পরিবারের বাইরেও তাঁদের কতোগুলো পালনীয় ভূমিকা আছে এবং তা পালন করতে না-পারলে তাঁদের জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে।

এই পর্যায়েই কিছু মহিলা রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর সূচনা হয় ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময়ে, ১৮৮৩ সালে। কলকাতার ভদ্রলোকেরা এই বিল এবং এই বিলের প্রতি য়োরোপীয়দের বিরোধিতা নিয়ে খুবই উত্তেজিত হন।[২২] এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেথুন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদেরকে এই

২০. বঙ্গমহিলাসমাজের প্রথম পাঁচ মাসের আয় মাত্র ৯১ টাকা; দ্বিতীয় বর্ষে ২৫২ টাকা। বামাপ, মাঘ ১২৮৬, পৃ. ১১৯। প্রথম বর্ষে খ্রীস্টীয় মহিলাসমাজের আয় ছিলো ২৮১ টাকা। বামাপ, পৌষ ১২৮৮, পৃ. ২৬৪।

২১. সখীসমিতির সদস্যাদের তালিকা পরিশিষ্ট ৪-এ দ্রষ্টব্য।

২২. For details see A. Seal, **The Emergence of Indian Nationalism** (Reprint; Cambridge University Press, 1970), pp. 165-69; B. Martin,

আন্দোলনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। সরলা দেবীর বর্ণনা অনুসারে, আন্দোলনে মেয়েদের অংশ গ্রহণের ফলে বহু অনিচ্ছুক ভদ্রলোক আবার এ আন্দোলনের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হন।[২৩]

দু বছর পরে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলে, কোনো কোনো বাঙালি মহিলা তাতে অচিরেই যোগদান করেন। ১৮৮৯ সালে এর বাৎসরিক সম্মেলনে (বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত) ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[২৪] অবশ্য এর দ্বারা এ প্রমাণিত হয় না যে, মহিলারা রাজনীতির সঙ্গে খুব জড়িয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু এ থেকে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা ক্রমশ বাড়ছিলো। যেমন রাজনীতিতে সরলা দেবীর যোগাযোগ বহু মধ্যপন্থী ভদ্রলোকের তুলনায় গভীরতর ছিলো। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে কেবল নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট ছিলো না, বরং তার জন্যে আবশ্যক ছিলো সন্ত্রাশবাদী আন্দোলনসহ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন বালগঙ্গাধর তিলকের সমকালে অথবা তাঁর আগেই। তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিলো কি না, তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন, কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা এ ধরনের চিন্তা করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি যেভাবে যুবকদেরকে শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং রাজনীতিতে দীক্ষা দেন, তা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সংগঠনে সহায়তা করে। তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য-উৎসব ও বীরাষ্টমী ব্রত চালু করেন। বোধ হয় খানিকটা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলো, কিন্তু তবু এই দুই অনুষ্ঠানই প্রবল জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।[২৫] সরলা দেবীর মতো মহিলারা অবশ্যই ব্যাতিক্রম-ধর্মী ছিলেন। তবে কৃষ্ণভাবিনী দাস এবং বেগম রোকেয়ার লেখা থেকে মনে হয়, নরমপন্থী মনে হলেও শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের একাংশ ধীরে ধীরে

Jr., **New India** (Bombay: Oxford University Press, 1970), passim.

অ্যানেট অ্যাক্রএড দেশীয় মহিলাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন; কিন্তু তিনিও এই বিলের বিরোধিতা করেন—P. Barr, P. 186.

২৩. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা**, পৃ. ২৮।

২৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, **জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী** (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৪) পৃ. ২; প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, **বাংলার নারী জাগরণ** (কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৪৬) প. ৮৭।

২৫. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা**, পৃ. ১২৫-৬২ এবং অন্যত্র।

রাজনীতিসচেতন হচ্ছিলেন।[২৬] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

যে-কালের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, সেকালে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে কেবল দাসী, অশিক্ষিত ধাই এবং বারবণিতাদেরই স্বাধীন আয় ছিলো। তা ছাড়া, শ্রমজীবীদের মধ্যে মহিলারা গৃহপালিত জন্তুদের খাইয়ে, গোরু দুইয়ে, ধান ভেনে এবং মাছ বিক্রি করে তাঁদের পুরুষদের সাহায্য করতেন। ফসল রোপন করে এবং কেটেও অনেক মহিলা অর্থনৈতিক কার্যে সাহায্য করতেন। সংক্ষেপে, নগদ অর্থ আয় করুন অথবা নাই করুন, নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন। এটা করার জন্যে তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই পর্দা প্রথা অমান্য করতে হতো। তা ছাড়া, আগেই দেখেছি, ভদ্রলোক পরিবারে মহিলাদের যে-মর্যাদা ছিলো, নিম্ন শ্রেণীর পরিবারে তা ছিলো উন্নততর। ভদ্রলোকদের মধ্যে মহিলারা কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন না, অন্তত অর্থ আয় তো করতেনই না। বস্তুত, তাঁদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে দারুণ বিরূপ মনোভাব প্রচলিত ছিলো। 'পরিশিষ্ট' ১ থেকে দেখা যাবে ১৯৩০ সালেও রবীন্দ্রনাথ মহিলাদের চাকুরি করা সমর্থন করেন নি, যদিও তিনি মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি ও প্রাগ্রসর চিন্তার জন্যে সুপরিচিত ছিলেন। এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস-সমূহের রাজলক্ষ্মী এবং সাবিত্রীর মতো চরিত্র যাদের, স্বাধীন উপার্জন আছে বলে দেখানো হয়েছে, তারা হয় দাসী নয়তো বাইজি বা বেশ্যা। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত শিক্ষিত চরিত্রগুলি দারুণ অনটনের মধ্যে চাকুরি করার কথা ভাবে না। এ প্রসঙ্গে চরিত্রহীন-এর কিরণময়ীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

ক্রমশ অধিকসংখ্যক মহিলা কেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে আরম্ভ করেন, যে-অপ্রতুল প্রমাণাদি পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে তা বলা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে এবং পরিবারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপসহ সামগ্রিক সমাজ-পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু দশকে মহিলারা চাকুরি নিতে শুরু করেন। বিশেষত শিক্ষার

২৬. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এবং কৃষ্ণভাবিনী দাস সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : জিজ্ঞাসা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৭), এবং তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১২৮৯)।

প্রসারহেতু শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে কতোগুলো নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এই মহিলারা, বিশেষ করে কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা, এমন এক জীবনের স্বাদ পান যা পূর্বে তাঁদের কাছে অজানা ছিলো। এঁরা পারিবারিক দায়িত্বের অতিরিক্ত কতোগুলো সামাজিক ভূমিকা পালন করতে চান। তদুপরি, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধ প্রথা এবং বাল্যবিবাহের মতো দেশাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়, এঁদের পক্ষে স্বামী লাভ করাই শক্ত হয়ে পড়ে। তাই অনেকেই বিবাহ না-হওয়া পর্যন্ত একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিশেবে চাকুরি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীতে পড়েন চন্দ্রমুখী বসু, কামনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলা দেবী প্রমুখ। এঁরা অবশ্য শিক্ষকতাকেই পেশা হিশেবে নিয়েছিলেন। কেবল দু জন চিকিৎসক হয়েছিলেন--বিধুমুখী বসু এবং যামিনী সেন। পরবর্তীকালে বিয়ে হওয়ার পর এঁদের কেউ কেউ চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য বলা কঠিন যে, সমাজ-সমালোচনাকে আগ্রাহ্য করে এঁরা চাকুরি নিলেন কেন। শোনা যায়, কামিনী সেন বেথুন কলেজে চাকুরি নিচ্ছেন এ সংবাদ শুনেই তাঁর পিতা প্রবল আপত্তি করেন। কামিনীর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন মুন্সেফ এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি এটা প্রত্যাশা করেন নি যে, পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে কামিনীর উপার্জন দিয়ে তাঁর আয় বাড়তে হবে। কামিনী অবশ্য অনুনয়-বিনয় করে চাকুরি করার বিষয়ে পিতার অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে তাঁর ছোটো বোন যামিনী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হন। তিনিও একটি চাকুরি নেন ; তাঁরা দুজনে যেমন মেধাবী ও সফল ছাত্রী ছিলেন, তাতে অধ্যয়ন শেষে অন্তঃপুরে নিষ্কর্ম জীবনযাপনের সম্ভাবনা তাঁদের কাছে নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এমন কি অন্য সনাতন বিকল্পটি— বিয়ে করে গৃহকর্ম করার ও সন্তান লালনপালন করার সম্ভাবনাকেও তাঁরা খুব উজ্জ্বল বলে বিবেচনা করেন নি। বোধ হয় অন্যান্য শিক্ষিত মহিলারাও কমবেশি একই সমস্যার সম্মুখীন হন।

একটি কারণ যা সাধারণ শিক্ষিত এবং বিবাহিত মহিলাদেরকে সবেতনে অথবা বিনা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করে, তাহলো স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রসার। পুরুষেরা ততোদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মহিলা শিক্ষক জোটাতে না-পারলে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে না। এর ফলে শিক্ষকতা গ্রহণ করার জন্যে পূর্বোক্ত মহিলাদের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে।

কলকাতাস্থ ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ১৮৮০-এর দশকের প্রথম দিকে মহিলাদের জন্যে একটি সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যার পাঠ্যক্রম চালু করে। ১৮৮৩

এই স্কুলে মহিলাদের জন্যে ডিগ্রি পাঠ্যক্রমও চালু হয়।[২৭] মেয়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে, সরকার পরের বছর, এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রীকেই বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[২৮] সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক পাঠ্যক্রমের প্রতি এতো বেশি মহিলা সাড়া দেন যে, আগে তা কেউই আশা করেন নি। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মহিলাই ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে ভর্তি হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৫ সালে কলকাতা চিকিৎসাবিদ্যালয় যখন খোলা হয়, তখন অল্পসংখ্যক হিন্দুই এতে ভর্তি হন। এর কারণ শবব্যবচ্ছেদ হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ ছিলো। তাছাড়া, পাশ্চাত্য ভৈষজ্য ও চিকিৎসার প্রতিও তাঁদের মনোভাব ছিলো প্রতিকূল।[২৯] সেকালে গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবকালে চিকিৎসক ডাকার প্রশ্নই উঠতো না। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারেও শিশুমৃত্যুর হার ছিলো খুব বেশি।[৩০] পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সমাজে ছড়িয়ে পড়ার পর, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভৈষজ্য সম্পর্কিত মনোভাবেও পরিবর্তন হয়। ফলে প্রশিক্ষিত সেবিকা ও ধাত্রীগণ তাঁদের পেশাদারি কাজ আরম্ভ করলে, গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালে সাহায্য করার জন্যে তাঁদের ডাকা হয়। কিন্তু তখনো বেশির ভাগ লোকেরা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি অথবা বিধুমুখী বসুর মতো উত্তীর্ণ চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বিষ্ট থাকলেন। এর কারণ স্পষ্ট নয়। কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে রক্ষণশীল হিন্দুদের জনপ্রিয় সাময়িকী **বঙ্গবাসী**তে তাঁর সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ গোলযোগ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[৩১] এই প্রতিকূল পরিবেশে পরবর্তী দু দশকে প্রায় কোনো মহিলাই আর সাহস করে

২৭. বামাপ, শ্রাবণ ১২৯০, পৃ. ১২১-২৪।

২৮. বামাপ' বৈশাখ ১২৯১, পৃ. ৩৬।

২৯. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম বেরিয়ে আসেন কাদম্বিনী, আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁকে উত্তীর্ণ হতে দেওয়া না হলেও, চিকিৎসা করার জন্যে একখানি সনদপত্র দেওয়া হয়। তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৮৮৯ সালে। প্রথম যে-দুজন মহিলা এম.বি. উত্তীর্ণ হন তাঁরা হলেন বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।

৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: M. Borthwick's unpublished P-hD dissrtation on Nineteenth century Bengali women (Australian National University, Canberra. 1980). অভিসন্দর্ভটি ১৯৮৩ সালের শেষে অথবা ১৯৮৪ সালে গোড়ায় সম্ভবত Princeton University Press-এর দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার কথা।

৩১. বামাপ, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১০৬; D. Kopf, **The Brahmo Samaj etc.** P. 126.

কাদম্বিনী মামলায় জয়ী হন। পত্রিকার সম্পাদকের ২ মাসের জেল এবং ১০০ টাকা জরিমানা হয়।

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে এগিয়ে আসেন নি। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে, প্রকৃতপক্ষে, মাত্র একজন বাঙালি মহিলাই—যামিনী সেন--মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। বিধুমুখী বসুর ছোট বোন বিন্ধ্যবাসিনী এই কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। অজ্ঞাত কারণে তিনিও লেখাপড়া বন্ধ করেন। মহিলা চিকিৎসকের প্রতি ঐতিহ্যিক হিন্দুদের বিদ্বেষের কারণ কি এই যে, উত্তীর্ণ পাঁচজন মহিলা চিকিৎসকই ছিলেন হয় ব্রাহ্ম নয় দেশীয় খৃস্টান, না কি এজন্যে যে, বিধুমুখী, কাদম্বিনী এবং যামিনী তখনো বাঙালি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি বেতনের চাকুরি করতেন এবং ফলে পুরুষদের অহঙ্কারে লাগতো--তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ভদ্রলোকদের মধ্যে সম্ভবত ঢাকার রাজরানী দেবীই প্রথম মহিলা যিনি সবেতনে একটি চাকুরি গ্রহণ করেন। বর্ষিয়সী এবং বোধ হয় বিধবা, রাধারানী ছিলেন ঢাকাস্থ মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিনি ১৮৬৬ সালের শুরুতে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে শেরপুর স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় এই চাকুরী পান। এই ঘটনা এতোই অসাধারণ ছিলো যে, বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর ঢাকার কমিশনারকে এই মহিলার একখানি আলোকচিত্র গ্রহণের আয়োজন করতে বলেন, কারণ তিনি এই আলোকচিত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করতে চান। মনে হয়, **বামাবোধিনী পত্রিকা**-ও এতে খুব চমৎকৃত হয়। এ পত্রিকায় কেবল যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে এ-মহিলা সম্পর্কে যে-একটি মাত্র তথ্য পত্রিকার জানা ছিলো, তারও উল্লেখ করা হয়। এই তথ্য হলো,—রাধারাণী পড়ার সময়ে চশমা ব্যবহার করেন।[৩২] পরবর্তী দশকে রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী সেন, মহামায়া বসু প্রমুখও কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন।[৩৩] অবশ্য এঁরা সবেতনে চাকুরি করতেন কি না, জানা নেই।

১৮৮০-এর দশকে মহিলাদের জন্য যখন ভালো বেতনের সরকারী চাকুরির দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন বড়ো একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। এরূপ প্রথম চাকুরি পান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোমোহিনী হুইলার। ১৮৭৯ সালে তিনি বিদ্যালয়সমূহের মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত হন।[৩৪] এর পরের বছর

৩২. **বামাপ**, ফাল্গুন ১২৭২, পৃ. ২১৬।

৩৩. **বামাপ**, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃ. ৫৬-৫৮।

৩৪. **উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল**, মোহনলাল মিত্র ও কানাই দত্ত সম্পাদিত (নববারাকপুর: যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি রক্ষা কমিটি, ১৯৭৪), পৃ. ৪১১। **বামাপ**, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ১৬৪।

রাধারাণী লাহিড়ী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি পান চন্দ্রমুখী বসু। তিনি ১৮৮৪ সালে বেথুন কলেজের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁর প্রারম্ভিক বেতন ছিলো ৭৫ টাকা। তখনো পর্যন্ত কোনো বাঙালি মহিলা এতো বেশি বেতনের চাকুরি করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও **বামাবোধিনী পত্রিকা** এর সমালোচনা করে। পত্রিকায় দাবি করা হয় যে, চন্দ্রমুখী বসু একজন এম. এ. এবং তাঁর বেতন আরো বেশি, অন্তত ১০০ টাকা, হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৩৫] তবে ১৮৮৬ সালে তিনি বেথুনের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং তাঁর বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।[৩৬] কামিনী সেনকে ১৮৮৬ সালে বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি বেথুন কলেজের প্রভাষক হন। কুমুদিনী খাস্তগীর ১৮৯০ সালে বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১৮৯১ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৯৬ সালে প্রভাষক নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পর ১৯০২ সালে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৭ সাল নাগাদ তিনি একজন পুরোপুরি প্রফেসর হন। তাঁর আগে কেবল চন্দ্রমুখী বসুই এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হেমপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, সুরবালা মিত্র প্রমুখও বেথুনে চাকুরি পান।[৩৭] কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ১৮৯৩ সালে ডাফারিন হসপিটালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কামিনী সেনের ছোটো বোন যামিনী উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং কাঠমণ্ডুতে চিকিৎসক হিশেবে চাকুরি করেন।

১৮৯৫ সালে হায়দ্রাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে সরলাদেবীর নিয়োগ অন্তত দুটি কারণে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। প্রথম কারণ এই যে, তাঁকে মাসিক ৪৫০ টাকা বেতন দেওয়া হয়—এ ছিলো সেকালের একজন মহিলার পক্ষে অকল্পনীয়।[৩৮] দ্বিতীয় এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, আলোচ্য মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই চাকুরি কেন নিয়েছেন এ সম্পর্কে একটি লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন যে, তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁর চাকুরি গ্রহণ করার

৩৫. **বামাপ,** ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ১৬৪।
শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০-এ এম.এ. উত্তীর্ণ হয়ে স্কুল শিক্ষক হন এবং তাঁর বেতন নির্ধারিত হয় ১০০ টাকা। একজন এম.এ. সেকালে বোধ হয় এমন বেতন পেতেন।

৩৬. চন্দ্রমুখী ১৮৯১ সালেও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে তিনি বেথুনের অধ্যক্ষ এবং পুরো প্রফেসর হন। দ্রষ্টব্য: **Calcutta University Calender, 1891, 1896 & 1910**, p. 271, 246, 314 respectively.

৩৭. ঐ।

৩৮. **বামাপ,** অগ্রহায়ণ ১৩০২, পৃ. ২৫১।

প্রশ্নে দারুণ বিরোধিতা করেন। যাই হোক, তিনি তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল এবং মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীকে অনুনয়-বিনয় করে রাজি করান। তাঁর মাতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরে অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি প্রদান করেন। সরলা দাবি করেন যে, তাঁর পুরুষআত্মীয়দের মতো স্বাধীনভাবে উপার্জন করার অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি চাকুরী নেন।[৩৯] ছ মাসের মধ্যে এক রাত্রে তাঁর বাড়িতে এক যুবক কর্তৃক আক্রমণের কিছু কাল পরে তিনি চাকুরি ছেড়ে দিলেন কেন—এ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

> নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবি প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরি করতে আসার মূল প্রেরণা ছিল না— চেতনার তলায় সেটা থাকলেও উপর উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ছিলো। একটা cause ধরলে মানুষ তার উপর মজবুত হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে—তাতেই তার মনুষ্যত্ব। কিন্তু সখের ভিত্তি, বালুর ভিত্তি—ধ্বসে ধ্বসে যায়, সরে সরে যায়। সখ কিছুদিন পরে মিটে যায়। আমারো ছ মাসের পরে মিটে আসতে লাগল।[৪০]

আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাবো, প্রকৃতপক্ষে, তখনো স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের ধারণা বাঙালি মহিলাদের চিন্তায় দানা বাঁধে নি এবং জনমত ছিলো এ ধারণার পরিপন্থী। যখন বিবেচনা করি যে, কর্মজীবী মহিলারা প্রায় সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম এবং দেশীয় খৃস্টান, তখন ঐতিহ্যিক হিন্দুদের বিরোধিতার কারণ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান, কিন্তু এঁরা ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। কর্মজীবী ব্রাহ্ম ও খৃস্টান মহিলারা কেন বিয়ের ব্যাপারে কিছু না কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। এর কারণ কি এই যে, এই মহিলারা অতিযোগ্য বলে বিবেচিত হন? অথবা এর কারণ কি এই যে, পুরুষরা তখনো বিশ্বাস করতেন যে, মহিলারা স্ত্রীহিশেবে যথেষ্ট নম্র ও বাধ্য হবেন না? অথবা পুরুষরা কি মনে করতেন, আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী বলে, এই মহিলারা এতোই উদ্ধত হবেন যে, তাঁরা আদর্শ স্ত্রী হতে পারবেন না? কারণ যা-ই হোক, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি[৪১] ব্যতীত, আলোচ্য অন্য মহিলারা কেউই ৩০

৩৯. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা,**

৪০. ঐ,

৪১. কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (১৮৬১/৬২—১৯২৩) ১৮৮৩ সালে বি.এ. উত্তীর্ণ হওয়ার পরই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বিবাহ করেন। তাঁরা বহু বছর একে অন্যকে জানতেন। তাছাড়া দ্বারকানাথ কাদম্বিনীর শিক্ষক ছিলেন—তখন কাদম্বিনী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন।

বছর বয়সের আগে স্বামী খুঁজে পান নি। ৪১ বছর বয়সেও চন্দ্রমুখী বসু অবিবাহিত ছিলেন।[৪২] আর তাঁর ছোটো বোন বিধুমুখী, যিনি ছিলেন প্রথম দুই মহিলা-এম.এ.-র একজন, সারাজীবনই কুমারী থাকেন। বিধুমুখীর সঙ্গে একই বছর এম.বি. উত্তীর্ণ হন এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। তিনি ৩৯ বছর বয়সে ১৯০৪ সালে ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র নন্দীকে বিয়ে করেন।* কামিনী সেন প্রথমে মেধাবী ছাত্রী হিশেবে এবং পরে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স ৩০। কিন্তু বিয়ের পর চাকুরি ছেড়ে দেন অথবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এমন কি, কাব্য সাধনাও প্রায় ত্যাগ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভগ্নী যামিনী সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি (এল.এম.এস) লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইংলণ্ড থেকে একাধিক ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও সারাজীবন কুমারী থাকেন।[৪৩] হেমপ্রভা বসু (জগদীশ চন্দ্র বসুর ছোটো বোন) এবং লজ্জাবতী বসুও (রাজনারায়ণ বসুর কন্যা) আজীবন কুমারী ছিলেন। হেমপ্রভা ছিলেন এম.এ.এবং লজ্জাবতী বি.এ.। কবি হিশেবেও লজ্জাবতী পরিচিত ছিলেন। মনে হয় রাধারানী লাহিড়ী এবং সুরবালা ঘোষও বিয়ে করেন নি। অন্তত ১৮৯১ সাল পর্যন্ত রাধারানীর এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত সুরবালার বিয়ে হয় নি এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে।[৪৪]

দ্বারকানাথ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং কাদম্বিনীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। প্রকতপক্ষে, তিনি বিপত্নীক ছিলেন এবং বিধুমুখী নামে তাঁর পূর্বপক্ষের একটি কন্যা ছিলো। বিধুমুখীর বয়স ছিলো কাদম্বিনীর চেয়ে কয়েক বছর কম। কাদম্বিনী ছিলেন কায়স্থ এবং কুমারী। দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা—যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং আনন্দমোহন বসু এ বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন। বামাবোধিনী পত্রিকা-র এ বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু এ পত্রিকায় বেশিরভাগ ব্রাহ্মবিবাহের সংবাদই মুদ্রিত হতো। সম্ভবত বিয়ের আগেই দ্বারকানাথ এবং কাদম্বিনীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৪২. চন্দ্রমুখী ১৯০১ সালের পরে পণ্ডিত কেশবানন্দ মামগায়েনকে বিবাহ করেন। ১৯০১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে তাঁকে 'মিস' বলে উল্লেখ করা হয়—পৃ. ৩১৪।

* বিবাহের পর তিনি কেবল স্বামীর মহিলা রোগীদেরই চিকিৎসা করতেন।

৪৩. যামিনী উত্তীর্ণ হন ১৮৯৬ সালে। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্যে দু বার ইংলণ্ডে যান। তিনি Rayal Society of Surgeons and Physicians-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

৪৪. **Calcutta University Calender, 1891**, p. 271, **Calcutta University Calender, 1907**, p. 697; **Calcutta University Calender**, 1910, p. 904. সুরবালা বি.এ. উত্তীর্ণ হন ১৮৯৩ সালে।

এই মহিলারা সবাই ছিলেন উচচশিক্ষিত ও সুপরিচিত পরিবারের সদস্য। অন্য বাঙালি মহিলা, বিশেষত শিক্ষিত মহিলাদের থেকে এঁরা একটা জায়গাতেই স্বতন্ত্র ছিলেন, সে হলো, এঁরা ছিলেন কর্মজীবী। সম্ভবত এটাই তাঁদের বিবাহের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি করে।

অবশ্য মহিলাদের চাকুরি গ্রহণের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যিকসমাজের প্রবল প্রতিকূল মনোভাব সত্ত্বেও, পূর্বোক্ত কর্মজীবী মহিলাদের দৃষ্টান্ত পরবর্তী মহিলাদেরকে চাকুরি নিতে উৎসাহিত করে। ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ১,১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক এবং বিভিন্ন ধরনের (ডিপ্লোমা,-লাইসেন্স-ও সার্টিফিকেট-ধারী) চিকিৎসক ছিলেন।[৪৫] এই মহিলাদের মধ্যে য়োরোপীয়দের সংখ্যা কতো তা অবশ্য এ প্রতিবেদনে বলা হয়নি। যদি এঁদের অর্ধেকও য়োরোপীয় ধরে নিই, তা হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, পূর্বের তুলনায় কর্মজীবী বাঙালি মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। অবশ্য একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখনো মহিলারা কেবল শিক্ষকতা এবং চিকিৎসক বৃত্তির মতো "সম্মানজনক" কাজই গ্রহণ করছিলেন।

স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে পুরুষদের পরিবর্তনশীল মনোভাব

সেকালে মহিলাদের আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া সীমিত ছিলো মোটামুটি ব্রাহ্ম ও খৃস্টানদের ক্ষুদ্র একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে। অবশ্য এই প্রক্রিয়া একদিকে ক্রমশ অধিক সংখ্যক মহিলাকে প্রভাবিত করছিলো, অন্য দিকে ঐতিহ্যিক হিন্দুদের বিদ্বিষ্ট করে তুলছিলো। এমনকি, কয়েক দশক আগে যে পুরুষরা মহিলাদের আগ্রগতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোভাবও প্রতিকূল করে তোলে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, বিশেষ কতোগুলো কারণে শতাব্দীর শেষ পাদে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের মনোভাব কঠোর হয়ে পড়েছিলো। মহিলাদের আধুনিকতার প্রতিও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পুরুষরা মেয়েদের কেবল এতোটুকু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যাতে মহিলারা উত্তম স্ত্রী হয়ে ওঠেন এবং চিঠিপত্র লিখতে ও দৈনন্দিন হিশাব রাখতে শেখেন। কিন্তু তাঁদের মতে কিছু মহিলা "উচচশিক্ষা" লাভ করে "বিজাতীয়" আচরণ শুরু করেছিলেন। ১৮৭০-এর দশকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ফলে মহিলাদের পাশ্চাত্যায়নের প্রতি অনেকের মনোভাব প্রতিকূল হয়ে ওঠে। কেশব

৪৫. **Census of India, 1901.** Vol. VIA, pt. 2 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 428, 431.

সেনের মতো "বিপ্লবীও" মহিলাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করেন।[৪৬] একই রকম, যে-শিক্ষিত পুরুষরা অবরোধ প্রথা খানিকটা শিথিল করে মহিলাদের যথার্থ সঙ্গিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই এখন মহিলা-দের "অতিরিক্ত আধুনিকতা" ও নির্লজ্জ আচরণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। আধুনিকাদের প্রথা-বিরুদ্ধ ব্যবহার বিশেষ করে পর্দা প্রথা পালনে তাঁদের অনীহা এমন কি অস্বীকৃতি, এবং চাকুরি গ্রহণ ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী পুরুষদের বিরূপ করে তোলে। তা ছাড়া, আধুনিকাদের মধ্যে সামাজিক রীতির প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশও পুরুষসমাজকে প্রতিকূল করে। তদুপরি, পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে, স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে আধুনিকাদের ঘনিষ্ঠতর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে একক অথবা বর্ধিত পরিবারের প্রতি তাঁদের পক্ষপাতও সাধারণদের মনোভাব প্রতিকূল করে। সন্দেহ নেই, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব মনোভাবের এ ধরনের পরিবর্তনে সহায়তা করেছিলো। তা ছাড়া, তথাকথিত সংস্কারকগণ মাহলাদের কেবল ততোটুকু স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, যা মহিলাদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করবে না। যখন কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে যথার্থ স্বাধীনতার লক্ষণ স্পষ্ট হলো তখন পুরুষদের প্রতিক্রিয়া গোপন থাকলো না এবং তাঁরা তাঁদের অবস্থান ও কৌশল পরিবর্তন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বামাবোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামোল্লেখ করা যায়। উমেশচন্দ্র তাঁর শক্তি ও সময়ের একটা বড়ো অংশই ব্যয় করেন মহিলাদের উন্নতির জন্যে এবং বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন "প্রগতিশীল" ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের "বৈপ্লবিক" নেতা। কিন্তু তাঁরা ১৮৭০ এর দশকে তাঁদের রচনায় আধুনিক নারী ও পুরুষ এবং মহিলাদের আধুনিকতার সমর্থক পুরুষ উভয়কে সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন।

উমেশচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের মতো অন্যান্য পুরুষরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, বাঙালি মহিলাদের অবস্থা সাধারণত যতোটা মন্দ মনে করা হয়, আসলে ততো মন্দ নয়। তাঁদের মতে, নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের পর্দা প্রথা মেনে চলতে হয় না এবং সকল ধরনের মহিলাদেরই স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। স্ত্রীদের যথেচ্ছা পাশ্চাত্যায়নের জন্যে তাঁরা স্বামীদের ধিক্কার দেন। তাঁরা বলেন, মহিলাদের অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়ার অথবা পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করার অভিজ্ঞতা না-থাকায়, স্বামীরা তাঁদের নিয়ে বাইরে গেলে অথবা অন্য পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলে তাঁরা অদ্ভুত আচরণ করেন। তাঁরা আরো যুক্তি দেখান যে, শিষ্টাচার

৪৬. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

এবং ভদ্রতা-বর্জিত সাধারণ মানুষরা প্রকাশ্য স্থানে দেখলেই মহিলাদের অপমান ও বিদ্রূপ করেন। সুতরাং তাঁরা উপদেশ দেন যে, মহিলারা যতো দিন না যথার্থভাবে শিক্ষিত হন, আদব-কায়দা না-শেখেন, এবং যতোদিন না তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, ততোদিন তাঁদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। তাঁরা দাবি করেন, এবং যথার্থভাবেই, যে, বাঙালি মহিলাদের পোষাক নিতান্ত অপ্রতুল ও অশালীন এবং পোষাকের সংস্কার না-করে তাঁদের অবরোধ মোচন করতে দেওয়া যাবে না। তাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার এক নতুন সংজ্ঞা দান করেন। অবরোধ মোচন অথবা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তাঁদের মতে স্ত্রীস্বাধীনতা নয়। তাঁদের সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ।[৪৭] পুরুষের সঙ্গে আলাপ না-করে পুরুষদের সঙ্গে আলাপের এবং অন্তঃপুরের বাইরে না-গিয়ে, মহিলারা কী করে পুরুষদের সঙ্গে আলাপের এবং বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, আলোচ্য লেখকগণ অবশ্য তার কোনো উপায় বাতলে দেন নি। তা ছাড়া পর্দা ভেঙে বিদ্যালয়ে না-গেলে কিভাবে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, এঁরা তাও স্পষ্ট করে বলেন নি লেখাপড়া শেখার এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর মহিলারা ঐতিহ্যিক আচরণে অবিচল থাকতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের জবাবও তাঁরা দেন নি। স্ত্রীস্বাধীনতাবিষয়ে এ-ই ছিলো সেকালের বৃহত্তর সমাজের জনপ্রিয় মনোভাব।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা

স্বাধীনতা অথবা মুক্তি সম্পর্কে বাঙালী মহিলাদের ধারণা একটি আধুনিক ব্যাপার। পুরোপুরি অবরোধবাসিনী এবং নির্যাতীত হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের প্রমাণাদি থেকে মনে হয় যে, মহিলারা তখন পরিবারে এবং সমাজে নিজেদের অবস্থা নিয়ে মোটামুটি তৃপ্তই ছিলেন। সম্ভবত য়োরোপীয় মহিলাদের দৃষ্টান্ত এবং নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপদেশ তাঁদের প্রথমবারের মতো অন্তঃপুরের বাইরে জগৎ সম্পর্কে এবং মানুষ হিশেবে তাঁদের ন্যূনতম আইনগত ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম দাবি

৪৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 'উন্নতি ও স্বাধীনতা', বামাপ, আষাঢ়, ১২৭৮, পৃ. ৬৮-৬৯; 'অবলাবান্ধব', বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ৯৬-৯৭; 'নরনারী'; বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ' ৩৩৬-৩৮; স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি; বামাপ, আষাঢ় ১২৮০, পৃ. ৬৯-৭২: 'বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি', অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬; 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা', তত্ত্বপ, অগ্রহায়ণ ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮), পৃ. ১৫৪-৫৫; ম, 'স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান?', বামাপ, আষাঢ় ১২৯৯, প. ৭৯-৮০।

করেন সম্ভবত কৈলাসবাসিনী দেবী। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত মহিলাদের দুর্দশা সংক্রান্ত তাঁর প্রথম গ্রন্থ এবং ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত মহিলাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীদের সমান করেই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু, পুরুষরাই মেয়েদের বন্দী করে রেখেছেন। তিনি আরো দাবি করেন যে, মহিলাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই পুরুষরা তাঁদের অশিক্ষিত করে রাখেন।[৪৮]

আগেই লক্ষ্য করেছি, ১৮৪৯ সালে ১২ বছর বয়সে কৈলাসবাসিনীর যখন দুর্গাচরণ গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর।[৪৯] ব্রাহ্ম আন্দোলনের একজন অনুসারী, দুর্গাচরণ সভ্যতার এক নতুন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই আদর্শের মূল বক্তব্য ছিলো সমাজে মহিলাদের মর্যাদা কতোখানি তা থেকেই প্রতিফলিত হয়, সেই বিশেষ সমাজ কতোটা সভ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতোটা সুখের হবে, তা অনেকটা স্ত্রীর মানসিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। এ জন্যেই গোপনে তিনি স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন এবং এক দশকের মধ্যেই কৈলাসবাসিনী দেবী বাঙালি মহিলাদের মধ্যে গ্রন্থরচয়িতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরিবর্তীকালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী দেবীও এমনি করে লেখাপড়া শেখেন। ব্রাহ্মআন্দোলন সম্ভবত ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকেই সব চেয়ে জোরদার হয়। এ দু দশকে আরো কয়েকজন মহিলা—তবে তাঁরা প্রায় সবাই ব্রাহ্ম—সমাজে মহিলাদের নিম্ন মর্যাদা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।

রমা সুন্দরী দাসীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজে মহিলাদের হীন মর্যাদা বিশ্লেষণ করে তিনি এই উপসংহারে উপনীত হন যে, বাঙালি মহিলারা পুরুষদের পদানত এবং খাঁচার পাখির মতো বন্দী। এই পরিবেশকে তিনি প্রাণ ধারণের অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। মুক্তির জন্যে তিনি তাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানান।[৫০] মেয়েদের বন্দী করার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে, সারদা দেবীও কম বেশি একই যুক্তি দেখান। তাঁর মতে, পুরুষরা মহিলাদের ইতর প্রাণীর মতো গন্য করেন। তিনি বলেন, পুরুষরা মহিলাদের অন্তঃপুরে আষ্টে পৃষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। কেননা পুরুষরা মনে করেন যে,

৪৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি, পৃ. ১১-১২।

৪৯. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫০. রমাসুন্দরী দাসী, 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫, পৃ. ৩৯-৪০।

অন্যথায় মহিলারা অসতী হবেন এবং পরিবারের ওপর কলঙ্ক আরোপ করবেন। তিনি এই ধারণাকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেন এবং সমাজে মহিলাদের ন্যায্য স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান।[৫১] সমাজে মহিলাদের কোনো মর্যাদা না-থাকার জন্যে রাজবালা দেবী পুরুষদেরই দায়ী করেন।[৫২] বঙ্গদেশে এখনো পর্যন্ত সম্ভবত কামিনী রায়কেই সব চেয়ে বড়ো মহিলা কবি বলে মনে করা হয়। কামিনী রায় একথা মেনে নিতে পারেন নি যে, মহিলাদের অবস্থা চিরদিনই অতো নীচু ছিলো। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গার্গী ও লীলাবতীর ন্যায় অসংখ্য মহিলার জন্ম হবে যদি মহিলাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়। তিনি ঘোষণা করেন, মহিলাদের পরাধীনতা মোচন না-করলে ভারতবর্ষও কখনো যথার্থভাবে জাগ্রত হতে পারবে না।[৫৩] মহিলারা যে নিজেদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন তা এঁদের রচনা থেকে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু যা বোঝা যায় না, তা হলো মুক্তি বা স্বাধীনতা বলতে তাঁরা ঠিক কী বোঝতেন। বন্দী থাকার যন্ত্রণা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঠিক কোন কোন বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান অথবা ঠিক কী করার স্বাধীনতা চান—এর স্পষ্ট সংজ্ঞা তাঁরা দিতে পারেন নি। ১৮৭১ সালে রাজশাহীর এক মহিলা স্বাধীনতা সম্পর্কে যা লেখেন তা বরং অনেকটা নির্দিষ্ট, তবে তাঁর প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞা সব চেয়ে আদর্শ সংজ্ঞা কি না, তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তিনি লেখেন:

> অস্মদ্ দেশীয় মহিলারা স্বাধীনতা অভাবে যে এক প্রকার জড় পদার্থের ন্যায় দিনাতিপাত করেন,...তাহারা সদা সর্বদা এক প্রকার স্থানে বাস ও এক প্রকার লোক দর্শন ভিন্ন আর কখনই সৎলোকের সহিত আলাপ ও উত্তম স্থান দর্শন করিতে পারেন না। এমন স্থান আছে যেখানে গমন করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় মঙ্গলই সাধিত হয়, এমন লোক আছেন যে তাহা-দের সহিত আলাপাদি করিলে নানা প্রকার সদুপদেশ পাওয়া যায় তাঁহারা ইহার কিছুরই নিকটবর্তী হইতে পারেন না। তবে দেখুন দেখি স্ত্রী লোকেরা এক স্বাধীনতার অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সুখ কি প্রকার বঞ্চিত।...স্ত্রীলোকেরা পরমাত্মীয় স্বামীর সহিত আর আর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত গমনাগমন করিবে ইহাতে কোন প্রকারেই মর্যাদার হানি হইতে পারে না। দেখুন অঙ্গনাগণ ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া

৫১ সারদা দেবী, 'বঙ্গদেশী লোকদিগের...', **বামারচনাবলী**, পৃ. ৯-১১।
৫২. রাজবালা দেবী, 'বামারচনা', **বামাপ**, ফাল্গুন ১২৮০, পৃ. ৩৯৫।
৫৩. কামিনী সেন, 'উদ্দীপনা' (কবিতা), **বামাপ**, চৈত্র ১২৮৬, পৃ. ১৮৬-৮৮।

আত্মীয়দিগের সহিত পর ব্রহ্মের উপাসনা ও সংকীর্তনে সমর্থ নহেন, বিদ্যালয়ে গমন করিয়া···জ্ঞানের প্রধান সোপানে পদার্পণ করিতে পারেন না। কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ কোকিলের ন্যায় এ পাশ ওপাশ ঘুরিয়াই কাল যাপন করেন, ইহাতে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল একেবারে সঙ্কোচ হইয়া অতি সংকীর্ণভাবে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অবস্থিত করিতে থাকে।···স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতে পারিবেন না।[৫৪]

এ অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, লেখিকা স্বাধীনতা বলতে যা বোঝেন তা হলো অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাওয়ার এবং বাইরের লোকেদের সঙ্গে আলাপের অধিকার। কলকাতার মায়াসুন্দরী নামক আর-একজন লেখিকার কাছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা আরো সীমিত। ক্ষুব্ধ লেখিকা বলেন:

স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না।[৫৫]

এই পরিস্থিতিতেই বাঙালি মহিলাদের একাংশ অবরোধ মোচনের দাবি জানান। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, স্নানের জন্যে মহিলাদের গঙ্গায় অথবা খোলা পুকুরে যাওয়ায় কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া স্নান সমাপন করে তাঁরা ভিজে কাপড়ে তাঁদের সর্বাঙ্গ প্রদর্শন করে ঘরে ফেরেন। এমন কি, পুরুষভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলায়ও তাঁদের নিষেধ নেই।[৫৬] তাছাড়া, বাসরঘরের নির্লজ্জ হাসিঠাট্টায়, প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পর 'পুনর্বিবাহ' নামক অশ্লীল অনুষ্ঠানে এবং গর্ভবতী হওয়ার পর স্বাদভক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তাঁদের বারণ করা হয় না।[৫৭] অথচ ভদ্র ঘরের মেয়েরা শালীন পোশাক প'রে যথাযোগ্য আদবকায়দা মেনে স্বামী অথবা অন্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে গেলে অথবা শ্বশুর এবং ভাসুরের মতো নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ করলে লোকেরা সমালোচনায় মুখর হন।[৫৮] সেকালে বেশির ভাগ বাঙালি মহিলা যে পোশাক পরতেন, তা এই লেখিকাগণ

৫৪. বোয়ালিয়ার জনৈকা মহিলা, 'বঙ্গদেশের মহিলাগণের স্বাধীনতা বিষয়', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৬২-৬৪।

৫৫. শ্রীমতী মায়াসুন্দরী, 'নারী জন্ম কি অধর্ম', বঙ্গমহিলা, শ্রাবণ ১২৮২, পৃ. ৯৪।

৫৬. সৌদামিনী (পরবর্তীকালে গুপ্ত), 'লজ্জা', বামারচনাবলী, পৃ. ২৪।

৫৭. মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, 'অবৈধ লজ্জা', বামারচনাবলী, পৃ. ২০-২১।

৫৮. শ্যামাসুন্দরী, 'সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ', বামাপ, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ১৯৩; সৌদামিনী, 'লজ্জা', প. ২৪।

অনুমোদন করতে পারেন নি। এই পোশাক ছিলো কেবল একটি শাড়ি—তার নীচে ব্লাউজ অথবা পেটিকোট কিছুই ব্যবহৃত হতো না। ফ্যানি পার্কিস নামক সেকালের একজন য়োরেপীয় মহিলা এই পোশাক দৃষ্টে তাকে একান্ত অপ্রতুল এবং অদ্ভুত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি লেখেন যে, কোনো আন্তর্বাস পরা হতো না বলে শাড়ির ভেতর দিয়ে চামড়ার রঙ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি উভয়ই দেখা যেতো।[৫৯] একজন বাঙালি লেখক ১৮৬৩ সালে মহিলাদের দশ-হাতি শাড়ি পরিহিত হওয়া সত্ত্বেও উলঙ্গ বলে বর্ণনা দেন।[৬০] আধুনিকারা স্বীকার করেন যে, মহিলাদের পোশাক 'সংস্কৃত' হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই অজুহাতে তাঁদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা অনুচিত ('পরিশিষ্ট' ৩ দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও কৃষ্ণকামিনী দাসী উভয়ই বোম্বাই ভ্রমণ করেছিলেন। এরাঁ লেখেন যে, পশ্চিম ভারতে মহিলাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিলো এবং এই মহিলারা ঐতিহ্যিক সমাজের আপত্তি ছাড়াই যে কোনা জায়গায় যেতে বা যে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন। তাঁরা আরো বলেন যে, সেখানকার পুরুষরা যথেষ্ট শালীন এবং তাঁরা প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের দেখলে তাঁদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন না-যে, তাঁরা যেন (মহিলারা) আজব জন্তুবিশেষ অথবা তাঁদের অপমানও করেন না।[৬১] একই মনোভাবের শরিক হয়েছিলেন মিস অ্যানেট অ্যাক্রএড। মিস অ্যাক্রএড বঙ্গদেশে এসেছিলেন ভিন্ন এবং উন্নততর মনে করা হতো এমন একটি সংস্কৃতি থেকে। কলকাতায় আগমনের অব্যবহিত পরে কেশব সেনের এক সভায় মহিলাদের উপস্থিতির প্রতি পুরুষদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। পুরুষদের মধ্যে একাংশ তাঁর দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। এতে তিনি অবাক অথবা অসন্তুষ্ট হন নি; কারণ তিনি জানতেন যে, সকল সংস্কৃতিতেই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু উপস্থিত জনতার প্রধান অংশই তাঁব দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন তিনি একটি অদ্ভুত জন্তু। এতে তিনি বিব্রত বোধ করেন এবং সত্যিকারভাবে চটে যান।[৬২]

৫৯. F. Parks, **Wandering of a Pilgrim in Search of the Picturesque, during four-and-twenty years in the East with Revelations of Life in Zenana**, Vol. 1 (London : Pelham Richardson. 1850), p. 60

৬০. রাজকুমার চন্দ্র, দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম (কলকাতা : লেখক, ১৮৬৩), পৃঃ ৬-৭।

৬১. (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), 'আমাদের বোম্বাই ভ্রমণ', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৩৪৫-৪৬, কৃষ্ণকামিনী. 'স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম', বামাপ, শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৪০।

৬২, A. Akroyd's diary quoted in W.H. Beveridge, **India Called Them**, P. 90.

সেকালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, পর্দা প্রথা অমান্য করলে অথবা পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করলে মহিলারা তাঁদের সতীত্ব হারাবেন। কোনো কোনো শিক্ষিত মহিলা এই ধারণার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা দাবি করেন যে, এ অভিযোগ ও আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, য়োরোপীয় মহিলারা পর্দা মেনে চলেন না, তাই বলে তাঁদের সকলে অসতী নন।[৬৩] কৃষ্ণভাবিনী দাস বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন। তিনি বলেন, ইংরেজ মহিলাদের প্রকৃত অর্থেই সতী বলা যায়। তাঁর যুক্তি হলো:

> এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে; কিন্তু যাঁহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্মরত্নকে না হারান, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং তাঁহাদেরই মনের ও ধর্মের তেজ অধিক।[৬৪]

কৃষ্ণভাবিনী মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে ওকালতি করেন। তিনি বলেন, পর্দা ভেঙে ফেললে অথবা মহিলাদেরকে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে মেলামেশা করার অনুমতি দিলে মহিলারা অসতী হবেন না। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানের জন্যে তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন:

> ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিতে ভয় পান। কারণ স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরাধীনা থাকাতে তাহাদের মন এত দুর্বল ও তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন করিতে পারেন না। অবশ্য ইহা অনেকটা সত্য; কেহ অনেক বৎসর অধীন অবস্থায় থাকিয়া সহসা স্বাধীন হইলে কখনই স্বাধীনতার ঠিক ব্যবহার করিতে অথবা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে সকলকেই শিখিতে হয়, শিশু একেবারে চলিতে শিখে না। তাহাকে অনেকবার দেখাইয়া দিতে হয় ও ধরিতে হয় এবং সে অনেকবার পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীদের বর্তমান অবস্থা এইরূপ। তাহারা এত দুর্বল ও হীনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে যে পুরুষেরা তাহাদের আদর করিয়া ধরিয়া না তুলিলে, তাহাদের অবস্থার কখনই উন্নতি হইবে

৬৩. বোয়ালিয়ার জনৈকা মহিলা, 'বঙ্গদেশের মহিলাগণের...', পৃ. ৬৩; সৌদামিনী, 'লজ্জা', পৃ. ২৪।

৬৪. ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, পৃ. ১৫২।

না। এবং অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে প্রবর্তিত না-করিলে তাহারা কখনই নিজেদের শাসন করিতে শিখিবে না বা স্বাধীন হইয়া বেড়াইতে পারিবে না।[৬৫]

তিনি বাঙালি হিন্দুদের মোহনিদ্রা ত্যাগ করে জেগে ওঠার আহ্বান জানান:

আয় বোন! সবে পিঞ্জর কাটিয়ে,
প্রিয় ভ্রাতাগণে অথবা বুঝায়ে
দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে
জর্মন, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,
প্রফুল্লতাময়, সতেজ হৃদয়,
হীন অশ্রুজল ধরেনা নয়নে।
দ্যাখ, পুরুষেরা স্ত্রীলোক বলিয়ে,
নাহি করে হেলা "অকেজ" ভাবিযে;
পশুর মতন, নারীর জীবন,
"অন্দর পিঞ্জরে" রাখে না পুরিয়ে।

•

আর কতকাল গৃহ-কারাগারে
থাকিবেরে সবে বন্দীর মতন,
না জানি কি গেল, কোথায় কি হলো
জগতে অথবা ভারত মাঝারে।

•

গৃহকার্য বিনা, কিছুই দেখ না.......
বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদ
অধীন জীবনে স্বাধীনতা সুখ,
থাকিতে না চাবে আর কারাগৃহে
ঢাকিবে না আর ঘোমটাতে মুখ....[৬৬]

বঙ্গ মহিলা সমাজের বাৎসরিক প্রতিবেদনে স্বর্ণপ্রভা বসু (জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী) কেবল-যে মহিলাদের পর্দা ভাঙার ও পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করার প্রয়াসকেই সমর্থন জানান, তাই নয়, তিনি এ-ও লক্ষ্য করেন যে, পূর্বে যে-মহিলারা সামাজিক সমাবেশে জড়সড় হয়ে থাকতেন বা অস্বস্তি বোধ করতেন, তাঁরা এখন এ সব

৬৫. ঐ, প. ১৮৩-৮৪।
৬৬. ঐ, পৃ. ১৫৭-৫৮, ১৬৩।

পরিবেশে আগের তুলনায় অনেকটা সপ্রতিভ এবং জড়তামুক্ত। তিনি আরো বলেন, এ মহিলারাও বুঝতে পেরেছেন যে, এ সব অনুষ্ঠানে যোগদান করা সভ্য হয়ে ওঠার অন্যতম পথ।[৬৭] আধুনিকারা দাবি করেন যে, সভ্যতা এবং মহিলাদের উন্নতি সমার্থক।[৬৮] সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা উচচশিক্ষার অধিকার-সহ অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। স্বামী নির্বাচনের অধিকারও তাঁদের কেউ কেউ চাচ্ছিলেন, পরের অধ্যায়ে তা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে।

অবশ্য এ সব সত্ত্বেও, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাঙালি মহিলাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা ছিলো নিতান্তই অগভীর, কেননা তাঁরা তাঁদের চির-কালীন দাসত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু একমাত্র অবরোধ মোচনকেই মুক্তির প্রধান উপায় বলে গণ্য করেন। কিন্তু অনেকগুলি সন্তান ধারণ, সকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অন্তহীন গৃহকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়দের ওপর ষোলো আনা নির্ভরতা ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের আগে মহিলারা কোনো প্রশ্ন তোলেন নি।

১৮৯১ সালে একজন মহিলা এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ধাত্রী অথবা গৃহশিক্ষক হিশেবে কাজ করে, এমন কি চিকিৎসা করে, বাঙালি মহিলারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন। কিন্তু মহিলাদের সবেতনে অফিসে চাকুরী নেওয়ার ধারণা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তা ছাড়া, তিনি এ কথাও স্বীকার করেন নি যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীমুক্তি অসম্ভব।[৬৯] আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সরলা দেবী চাকুরি গ্রহণ করেন ১৮৯৫ সালে। তবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন তাঁর লক্ষ্য ছিলো না, তার বরং শখ হয়েছিলো পুরুষদের মতো আয় করবার। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাই তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং ছ মাসের মধ্যেই তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন।[৭০] পুরুষদের ওপর মহিলাদের তুলনা-মূলকভাবে কম নির্ভরশীল হওয়া উচিত ১৯০০ সালে বিনোদিনী সেনগুপ্ত এ কথা

৬৭. স্বর্ণপ্রভা বসু, 'বঙ্গমহিলা সমাজের বাৎসরিক রিপোর্ট', বামাপ, মাঘ ১২৮৬, পৃ. ১১৭-১৮।

৬৮. কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য', ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ২৪৪; 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬, পৃ. ৬১১, ৬১৫-১৬।

৬৯ 'বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, কার্তিক ১২৯৮, পৃ. ২১৫।

৭০. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

খুব জোর দিয়ে বলেন। তবে তিনি অবশ্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকে নারীমুক্তির পূর্ব শর্ত হিশেবে বিবেচনা করেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে অনেক মহিলাই অর্থনৈতিক অনটনে পতিত হন, এই কারণেই তাঁদের আয় করার ক্ষমতা থাকা উচিত—বিনোদিনী সেনগুপ্ত এমন যুক্তি দেখান।[৭১] দু-একজন মহিলা এ ধরনের সচেতনতা দেখালেও, সাধারণভাবে মহিলারা সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের মধ্যেকার যোগাযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন নি। অথচ তখন বঙ্গসমাজে বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন,—১৯১০ সাল নাগাদ মহিলাদের মধ্যে কমপক্ষে ৪৯ জন বি.এ., ৮ জন এম. এ. এবং জন তিনেক এম. বি. ও এল. এম.এস হয়েছিলেন, এমন কি কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যাও ছিলো কয়েক শত।[৭২]

আলোকপ্রাপ্ত এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো মহিলাও মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। ১৮৯১ সালে বাঙালি মহিলাদের সঙ্গে ফরাসি, সুইস ও আইরিশ মহিলাদের তুলনা করতে গিয়ে কৃষ্ণভাবিনী মন্তব্য করেন যে, য়োরোপীয় মহিলারা শিক্ষিত ও দক্ষ বলে পুরুষ আত্মীয়দের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারেন। এর ফলে ঐ সব দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো বোঝা-পড়া এবং সহযোগিতার ওপর স্থাপিত। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত মোটেই তেমন নয়। অপরপক্ষে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারেন বলে, য়োরোপীয় মহিলারা স্বামীদের যথার্থ সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন।[৭৩]

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর আগে কৃষ্ণভাবিনী তাঁর **ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা** (১৮৮৫) গ্রন্থে সক্রিয় অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করার জন্যে ইংরেজ রমণীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অন্য একটি রচনায়ও তিনি ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকার কর্মজীবী মহিলাদের প্রশংসা করেন। এতে তিনি দাবি করেন যে, উচ্চশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচ্য মহিলাদের স্ত্রীসুলভ গুণাবলী আদৌ বিনষ্ট করে নি, বরং উল্টো, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে পুরুষদের সহায়তা করার জন্যে এবং উচ্চশিক্ষার গুণে এই মহিলাদের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়।[৭৪]

৭১. বিনোদিনী সেনগুপ্ত, 'রমণীর কার্যক্ষেত্র', **বামাপ**, বৈশাখ ১২০৭, পৃ. ৫-৭।

৭২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ স্নাতকদের পূর্ণ তালিকার জন্যে 'পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য।

৭৩. 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী', **সাহিত্য**, পৌষ ১২৯৯, প. ৪৪৪-৪৬।

৭৪. 'শিক্ষিতা নারী', **সাহিত্য**, আশ্বিন ১২৯৮, পৃ. ২৮৯-৯০।

কৃষ্ণভাবিনীর এ সব রচনার বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে, সকল বাঙালি মহিলা যাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করেন তিনি বোধ হয় তা-ই চাচ্ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিলো বেশ ঐতিহ্যিক। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত এক রচনায় তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন যে, সকল শিক্ষিত মহিলাকেই চাকুরি করে জীবিকা অর্জন করতে হবে। তিনি এভাবে প্রশ্ন করেন: এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবেন যে, শিক্ষিত মহিলারা চাকুরির খোঁজে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ঘুরে বেড়াবেন অথবা সামান্য কিছু টাকার জন্যে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে দপ্তরে কাজ করবেন? বস্তুত, বাঙালী মহিলাদের জন্যে তিনি এটা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, উপার্জনক্ষম পুরুষআত্মীয় নেই এমন মহিলারা যদি নিজেদের পরিবারের জন্যে উপার্জন করতে পারেন, তা হলে অনেক অসম্মান ও হীনতা থেকে তাঁরা বাঁচতে পারেন।[৭৫] কৃষ্ণভাবিনী যেরূপ প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিলেন, তেমনি ছিলেন যথেষ্ট মাত্রায় আধুনিক। তা সত্ত্বেও, মহিলাদের অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যদি এতোটা রক্ষণশীল হয়, তা হলে ঐতিহ্যিক মহিলারা এ বিষয়ে কতোটা বিদ্বিষ্ট ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

অবশ্য পরবর্তীকালে মহিলারা তাঁদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়ার পরে অবস্থার বোধ হয় খানিকটা পরিবর্তন হয়। এর সূচনা হয় বেগম রোকেয়া থেকে। ১৯০৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রকাশিত কতোগুলো রচনায় তিনি এ যুক্তি দেন যে, মহিলারা আর্থিক দিক দিয়ে পুরুষ-আত্মীয়দের নিকট কতোখানি কম নির্ভরশীল, তার ওপরই তাদের স্বাধীনতার মাত্রা নির্ভর করে।[৭৬]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে মহিলাদের সচেতনতা যেমনই থাক না কেন, মহিলারা পুরুষদের সমান কি না—এ প্রশ্ন তাঁদের ভাবিত করেছিলো। যদিও বেশির ভাগ মহিলাই মনে করেন, পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা নির্ধারিত আছে; তবু তাঁরা এ-ও দাবি করেন যে, মহিলাদেরকে পুরুষদের খেলনা হিশেবে গণ্য করা অনুচিত। মানকুমারী বসু যেমন লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালি মহিলাদের সব সময়ে স্বামীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে হয়, ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে মনন, রুচি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের লালন করতে পারেন না।[৭৭]

৭৫. 'শিক্ষিতা নারীর প্রতিবাদের উত্তর', সাহিত্য, মাঘ ১২৯৮, পৃ. ৪৭৫।

৭৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: 'স্ত্রীজাতির অবনতি', রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ২৯-৩০।

৭৭. মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা', বামাপ, ফাল্গুন ১৩০১, পৃ. ৩২৬।

নগেন্দ্রবালা যুক্তি দেখান, সৃষ্টিকর্তা চান নি যে মহিলাদের মনন এবং আশা পুরুষদের ইচ্ছানুসারেই গঠিত হবে।[৭৮] অধিকতর "প্রগতিশীল" মহিলারা অবশ্য এতো কৈফিয়ৎ-নম্র ছিলেন না। তাঁরা দাবি করেন যে, প্রতিটি বিষয়েই মহিলাদেরকে পুরুষদের সমান বিবেচনা করা উচিত এবং পুরুষরা যে-সব অধিকার ভোগ করেন মহিলাদেরকে তার সবই দেওয়া উচিত।[৭৯]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাঙালি মহিলাদের ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়ন দৃষ্টে ১৮৭০-এর দশকে এক শ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষরা সাধারণভাবে মহিলাদের আধুনিকায়ন এবং বিশেষভাবে তাঁদের পাশ্চাত্যায়নের তীব্র সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। অথচ এই পুরুষরাই প্রথম দিকে নারীমুক্তির সমর্থক ছিলেন। শিক্ষিত মহিলাদের একাংশেও মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই মহিলারা বেশ কয়েকটা যুক্তি দেখান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন বলেন যে, মহিলাদের বারবার বাইরে যেতে হলে গৃহকর্ম ও সন্তান ধারণ বিঘ্নিত হবে। তাঁরা আধুনিকাদের "পুরুষালি" বলে আখ্যায়িত করেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, পূর্ববর্তী মহিলাদের সেবা, ভক্তি, আতিথেয়তা এবং আত্মত্যাগ আধুনিকাদের মধ্যে নেই। কেউ কেউ লক্ষ্য করেন যে, মহিলারা স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের প্রতি ক্রমশ অধিকতর অবাধ্য হচ্ছেন।[৮০] আধুনিকারা যে পাশ্চাত্য অথবা "সংস্কৃত" পোশাক ও জুতো পরছিলেন এবং প্রসাধনী ব্যবহার করছিলেন —এ ছিলো তাঁদের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ।[৮১] এ সব ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উত্থাপন করা হয় যে, তাঁদের অতিরিক্ত প্রত্যাশাজনিত আচরণের ফলেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছিলো।[৮২]

বস্তুত, তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ঐতিহ্যিক পরিবারের মহিলাদের মধ্যে নারীমুক্তিসংক্রান্ত একটা সংজ্ঞা বিকাশ লাভ করছিলো। তাঁদের সংজ্ঞা অনুসারে নারীমুক্তির অর্থ নারীদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতা। তাঁদের মতে, সমগ্র সংসারই মহিলাদের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়।[৮৩] এই রক্ষণশীল

৭৮. নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, 'গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্তব্য', বামাপ, পৌষ ১৩১০, পৃ. ৩০৭।

৭৯. মানকুমারী বসু যেমন এরূপ যুক্তি দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য তাঁর 'বিগত শতবর্ষে ...', বামাপ, কার্তিক, ১২৯৮, পৃ. ২১৬-১৭।

৮০. ঐ, পৃ. ২৪১-৪২। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮১. ঐ, বামাপ, শ্রাবণ ১৩০২, পৃ. ১৩৭-৩৯।

৮২. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮৩. নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, 'হিন্দু রমণী', বামাপ, ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ১৮৮-৯১;

লেখিকারা মহিলাদের ঐতিহ্যিক ভূমিকার ওপরই গৌরব আরোপ করেন এবং দাবি করেন যে, বঙ্গদেশের যা কিছু গৌরব তার মূলে আছে পুরুষদের কাছে মহিলাদের অধীনতা।[৮৪]

এক শ্রেণীর শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, নারীমুক্তির প্রতি মহিলাদের মনোভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলাদের একটা বড়ো অংশই উপলব্ধি করেছিলেন যা মানকুমারীর ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা যায়:

> পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্তা ও আশ্রয়দাতা।...কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিবেন, কি স্ত্রীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া কেবল নিজেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবেন, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। সন্তান প্রসবকরণ, শিশুপালন, গৃহধর্ম সংরক্ষণ এগুলি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঐশিক নিয়ম হইলেও উহা যে রমণী জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এ কথা নিঃস্বার্থভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন।[৮৫]

স্বাধীনতার সীমানা

এখন নারীমুক্তি বলতে যতোখানি বোঝায় এক শতাব্দী আগে তার সামান্যই বোঝাতো, বিশেষ করে বঙ্গদেশে। আমরা দেখেছি, বাঙালি মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ছিলো অত্যন্ত নীচু। হীনাবস্থা থেকে মহিলাদের উদ্ধার করতে গিয়ে সেকালের সমাজ সংস্কারকগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো হলো মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষা দান, অবরোধমোচন, একটি শালীন পোশাক উদ্ভাবন, বিবাহ-বিষয়ক নানা ধরণের সংস্কার, মহিলাদেরকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্তকরণ, মহিলাদের সমিতি সংগঠন এবং চাকুরি গ্রহণে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দান। পুরোপুরি অশিক্ষিত থাকায় প্রথম দিকের মহিলারা নিজেরা আধুনিকতা সম্পর্কিত ধারণা পোষণে অসমর্থ ছিলেন। শুরুতে তাই স্বাধীনতার জন্যে তাঁদের নির্ভর করতে হতো সেই পুরুষদের ওপর যাঁরা তাঁদের বন্দী করে রেখেছিলেন। সুতরাং তাঁরা প্রথম দিকে যা লাভ করেন তাকে নিজেদের চেষ্টায় অর্জিত কোনো বস্তু না-বলে,

মানকুমারী বসু, 'বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৯৮, পৃ. ২৪২-৪৩।

৮৪. মানকুমারী বসু, 'বাঙালী স্ত্রীলোকের ...', পৃ. ২৪১।

৮৫. ঐ. পৃ. ২৪২।

পুরুষদের উপহার বলাই শ্রেয়। মা ও স্ত্রীরূপে ঐতিহ্যিক ভূমিকায় মহিলাদেরকে অধিকতর ও ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্যে এবং সে সময়ের ইংরেজানুসারী ক্রমপরিবর্তনশীল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী এবং আধুনিকা করে তোলার উদ্দেশ্যে পুরুষরা মহিলাদের কেবল ন্যূনতম স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া, নারী মুক্তি বলতে পুরুষরা তখন যা যা বুঝতেন, তা হলো অতি হীনাবস্থা থেকে মহিলাদের যৎকিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তোলা।

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংলণ্ডে অনেকে এক ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পালন করতে শুরু করেন[৮৬] এবং শতাব্দীর শেষ দু দশকে ছোটো পরিবারকে নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিশেবে গণ্য করেন, তবু বাঙালি নারী-পুরুষ কেউই সন্তান ধারণ ও সন্তান লালনপালন করার সমস্যাকে নারীমুক্তির সঙ্গে সংপৃক্ত প্রশ্ন বলে মনে করেন নি। উল্টো, বরং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো আধুনিকাও মহিলাদের এই ভূমিকার ওপর গৌরবারোপ করেন।[৮৭] কারো কারো মতে, গুণবতী মহিলার জন্যে এই দুই ভূমিকাই ছিলো সবচেয়ে উত্তম। একই কথা প্রযোজ্য গৃহকর্ম সম্পর্কে। সেকালে একে মহিলাদের অপরিহার্য গুণ বলে বিবেচনা করা হতো। বোধ হয় একালেও করা হয়।

Owen-অনুসারী স্ত্রীস্বাধীনতাপন্থী ক্যাথারিন ওয়াটকিন্স্ ১৮৪৩ সালে ঘোষণা করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না-পারলে মহিলাদের কখনো সত্যিকারভাবে স্বাধীন করা যাবে না। তিনি দেখান, পুরুষের কাছে মহিলাদের দাসত্ব কিভাবে ধর্মীয় বিধিবিধান দিয়ে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী করা হয়েছে।[৮৮] অপরপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে বাঙালি নারীপুরুষরা ছিলেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এবং তাঁদের উন্নতি ও মুক্তির জন্যে তাঁরা বস্তুত বিধাতার নিকটই প্রার্থনা করেন। বাঙালি মহিলারা পর্দা প্রথার ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন,

৮৬. For details see A.H. Nethercot, **The First Five Lives of Annie Besant**, pp. 109-10.

ইংলণ্ড ও ফ্র্যান্সে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই।

৮৭. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', পৃ. ২৬৪-৭৩।

৮৮. B. Taylor, 'The Women-Power', P. 137.

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯০৪ সালে নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে তিনি দাবি করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মহিলাদের দাসত্বকে স্থায়িত্ব ও ধর্মীয় রূপ দান করেছে।—**রোকেয়া রচনাবলী**, পৃ. ১১।

কেননা তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে, পর্দাই তাঁদের অন্তঃপুরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু পুরুষদের ওপর তাঁদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যা তাঁদের দেহ ও মনকে যথার্থই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলো, সে বিষয়ে তাঁরা কোনো সচেতনতা প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯১ সাল নাগাদ ইংলণ্ডে ১৪৬,৩৭৫ জন মহিলা শিক্ষক হিশেবে, ৫৩,০৫৭ জন প্রশিক্ষিত সেবিকা হিশেবে এবং ১৭,৮৬৯ জন সেক্রেটারি ও কেরানি হিশেবে কাজ করছিলেন।[৮৯] ১৮৯৬ সালে দেশের মোট শিক্ষকদের শতকরা ৭০ জনই ছিলেন মহিলা।[৯০] অপরপক্ষে ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে মাত্র ১,১৫৬ মহিলা শিক্ষক, ৭৪৯ জন সেবিকা এবং ৬৬ জন কেরানি ছিলেন।[৯১] বলা বাহুল্য এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন য়োরোপীয়।

সমাজের বিধিনিষেধ মেনে চলার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ এবং একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে বর্ধিত কিংবা একক পরিবারের পক্ষে-যে এই মহিলারা ওকালতি করেন, তা-ও নয়। আমি এ যাবৎ কেবল একজন মহিলার একটি রচনা পেয়েছি, যাতে সরাসরি একান্নবর্তী পরিবারের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।[৯২] সুতরাং, বলা যায়, স্বাধীনতা বলতে বাঙালি মহিলারা বুঝতেন শুধু তাঁদের অতি নীচু সামাজিক মর্যাদার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি,---যথার্থ মুক্তির ধারণা তখনো তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় নি।

৮৯. International Congress on Women, **Women in Professions**, Vol. I (London: T. Fisher Unuwin, 1900), pp. 31-32.

৯০. **Royal Commission on Equal Pay 1944-46 Report** (London : His Majesty's Stationery Office, 1946), p. 23.

৯১. **Census of India, 1901**, Vol. VIA, pt II, P. 428, 431, 433.

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ব্রাহ্ম ও দেশীয় খৃস্টান পরিবারের বহু মহিলা আগ্রহের সঙ্গে চাকুরি করতে শুরু করেন। সীতানাথ তত্ত্বভূষণের ছয় কন্যাই চাকুরি নিয়েছিলেন।—See S. Tattvabhushan's **Autobiography**, pp. 109-10.

৯২. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিতর্কিত ভাবমূর্তি : সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা

সেকালের সমাজে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদা অবশ্যই নিম্নতর ছিলো, কিন্তু এই হীনতা বৃদ্ধি পায় ঐতিহ্যিক মূল্যবোধবশত এবং নিজেদের সম্পর্কে মহিলাদের নীচু ধারণা থেকে। আগের দুটি অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও অবরোধ মোচনের প্রয়াস ঐতিহ্যিক সমাজের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং এ নিয়ে সমাজে যথেষ্ট হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়। অর্ধ-শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য প্রভাবিত ভদ্রলোকের আন্তরিক প্রযত্নের ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষা কেবল সীমিত পরিমাণে গৃহীত হয়েছিলো এবং পর্দা প্রথার কড়াকড়ি আংশিকভাবে হ্রাস পেয়েছিলো। বস্তুত, স্ত্রীশিক্ষার অভিঘাত এবং অবগুণ্ঠন মোচনের ফলাফল ব্রাহ্ম ও দেশীয় খৃস্টানদের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের বাইরে তেমন অনুভূত হয় নি। অবশ্য সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে বঙ্গদেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, যে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে, বৃহত্তর ভদ্রলোক সমাজে তাব যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিলো। এর ফলে, এ সব পরিবাবে মহিলাদের ভূমিকা ঈষৎ পবিবর্তিত হয়, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অংশত পুনর্নির্ধারিত হয় এবং তাঁদের জীবনধারাও খানিকটা পাল্টে যায়। এ সব পরিবর্তনের প্রতি মহিলাদের মনোভাব এবং নিজেদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। তদুপরি, ভদ্রলোকদের অতো প্রিয় একান্নবর্তী পরিবার প্রথাও ভেঙ্গে যেতে আরম্ভ করে। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও অবরোধ মোচন যেমন চারদিকে খুব আলোড়ন সৃষ্টি কবে, এসব পরিবর্তন ছিলো তার উল্টো,—তা সংঘটিত হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। বস্তুত, এ পরিবর্তন দীর্ঘকাল সকলের প্রায় অলক্ষ্যে ছিলো। কিন্তু একবার সংঘটিত হওয়াব পর, উল্টো পথে এগিয়ে এ পরিবর্তন খণ্ডনের আর উপায় ছিলো না।

একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রীর স্থান

একান্নবর্তী পরিবারে 'স্ত্রী' এবং 'কর্ত্রী' শব্দ দুটি সমর্থক ছিলো না। এ ধরণের পরিবারের কর্তা হতেন সাধারণত শাশুড়ী অথবা তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্রের

স্ত্রী। অবশ্য শাশুড়ীর মৃত্যুর সময়ে স্ত্রীর বয়স খুব কম হলে বা স্ত্রী নিঃসন্তান হলে, শ্বশুরের বিধবা ভগ্নী অথবা তাঁর মতো কোনো বর্ষীয়সী মহিলা কর্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হতেন। দশ-বারো বছর বয়স হলেই সেকালে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর থেকে কম বয়সেও, এমন কি কয়েক মাস বয়সী শিশু কন্যারও বিয়ে হতো।[১] দশ বছর বয়সী একটি বিবাহিত মেয়ের সামাজিক মর্যাদা এক দিক দিয়ে একই বয়সের একটি কুমারী মেয়ের তুলনায় উন্নত ছিলো; কারণ বিবাহিত হলে মেয়েরা বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতেন। অপরপক্ষে, বিবাহিত মেয়েদের আবার পর্দা প্রথা মেনে চলতে হতো, এবং সার্বক্ষণিকভাবে শাশুড়ীর কড়া দৃষ্টিতে থাকতে হতো, অনেক গৃহকর্ম করতে হতো এবং বাপের বাড়িতে অবিবাহিত কন্যার যেটুকু স্বাধীনতা থাকে, তা-ও হারাতে হতো এদিক দিয়ে তার সামাজিক মর্যাদা ছিলো কুমারী মেয়ের চেয়ে নীচুতে। বস্তুত, বালিকা-বধূর সামাজিক মর্যাদা ছিলো নিতান্তই অধীনতার। নিজের ইচ্ছামতো তার কিছুই করার অধিকার ছিলো না। বরং সে গুরুজনদের, বিশেষত শাশুড়ীর ইচ্ছানুসারে সব-কিছু করবে, এটাই ছিলো প্রত্যাশিত। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তখনকার বালিকা-বধূকে সারাক্ষণ ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখতে হতো এবং শাশুড়ীর নির্দেশ মতো প্রত্যুষ থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত গৃহ-কর্ম করতে হতো। এরকম বাধ্যগত বধূই 'লক্ষী' স্ত্রী হিশেবে প্রশংসিত হতো।[২]

শাশুড়ীর নিকট বধূর ষোলো আনা আনুগত্য এমন বহুলভাবে স্বীকৃত নিয়ম ছিলো যে, বিয়ে করতে যাবার সময়ে বর সাধারণত মাকে বলতো: তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি[৩] সুতরাং দাসীর যা করবার কথা নয়, বধূ তেমন কিছু করলে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হতো, এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে প্রহার করা হতো। শাশুড়ী ও ননদরা বধূদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন এবং তার ফলে বধূরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতেন—এমন ঘটনা সেকালে বিরল ছিলো না।[৪] বালিকা-বধূকে নিপীড়ন করলে কম-বয়সী (সাধারণত কিশোর

১. দ্রষ্টব্য: অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি (কলকাতা: ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৫৬) পৃ. ৬৯; 'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি...', অবোধবন্ধু, ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ৯৯; তত্ত্বপ, আষাঢ় ১৭৬৮ শকাব্দ (১৮৪৪), পৃ. ২৯৮; 'স্ত্রীস্বাধীনতা', বঙ্গমহিলা, মাঘ ১২৮৩, পৃ. ২৩৩।

২. রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পৃ. ২৯, ৫২।

৩. ভুবনমোহন সরকার, 'পারিবারিক সংস্কার', বঙ্গমহিলা, মাঘ ১২৮২, পৃ. ২৩৬।

৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়; 'মাণিক্যময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা, বামাগ, শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ১৩০-৩১।

ও সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত) স্বামী তাঁর পিতামাতা এবং ভগ্নীদের পক্ষই সমর্থন করতেন। এর কারণ ছিলো এই যে, এ ধরণের স্বামীরা কেবল বয়সে তরুণ ছিলো না, জীবিকার জন্যে তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো তাদের একান্নবর্তী পরিবারের ওপর এবং স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিলো সামান্যই।

সাধারণত বিয়ের কয়েক বছর পরে বালিকা-বধূ যৌবন প্রাপ্ত হতেন। এই উপলক্ষে ঘটা করে বিভিন্ন আচারের মাধ্যমে 'পুনর্বিবাহ' অনুষ্ঠান পালিত হতো এবং তারপর প্রথম বারের মতো তাঁকে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এবং শয্যা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হতো।[৫] প্রাপ্ত পরোক্ষ প্রমাণাদি থেকে আমার মনে হয় স্বামীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বধূর মর্যাদা কিঞ্চিৎ উন্নত হতো। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে স্বামীরা উপার্জনক্ষম ছিলেন, সে সব ক্ষেত্রেই এই মন্তব্য অধিকতর প্রযোজ্য। স্বামী অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল এবং কম বয়সী হলে তার স্ত্রীর মর্যাদা তেমন উন্নত হতো বলে মনে হয় না। যৌবন প্রাপ্তির পর স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বোধ হয় এই যে, যৌনমিলনে পরিতৃপ্ত স্বামী এ সময়ে স্ত্রীকে ভালোবাসতে এবং পরিবারের শাসন থেকে অংশত রক্ষা করতে আরম্ভ করতেন।

সে যুগের একজন মহিলা দাবি করেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তখন মোটেই ঘনিষ্ঠ ছিলো না।[৬] দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দিনের বেলায় তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ করার অথবা আলাপ করার অধিকার ছিলো না।[৭] তা ছাড়া, পুত্র তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালোবাসছে—এ দেখলে পিতামাতা অসুখী হতেন। এ সব ক্ষেত্রে পুত্রকে "নষ্ট" এবং স্ত্রৈণ বলে এবং পুত্রবধূকে ডাইনি বলে মনে করা হতো।[৮] এর কারণ সম্ভবত এই যে, পুত্রকে স্ত্রীর অনুরক্ত দেখলে পিতা-মাতা আশঙ্কা করতেন, পুত্র হয়তো স্ত্রীর জন্যে অধিকতর অধিকার দাবি করবেন অথবা স্ত্রীর কথা অনুসারেই কাজ করবেন। তেমন অবস্থায় পরিবারের অন্তর্গত পারস্পারিক সম্পর্কসমূহে প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটবে এবং তার ফলে একান্নবর্তী পরিবারের ভবিষ্যৎও বিনষ্ট হতে পারে। এ সব কারণে একান্নবর্তী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী কৃচিৎ পরস্পর সত্যিকার সঙ্গী-তে পরিণত হতেন। সন্তানদের

৫. 'পুনর্বিবাহ বিষয়ক কথোপকথন', বামাপ, কার্তিক ১২৭২, পৃ. ১৩৪-৩৬।

৬. নিস্তারিনী দেবী, 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য', বামাপ, মাঘ ১২৯০, পৃ. ৩২০। আরো দ্রষ্টব্য: 'পারিবারিক সুখ', বামাপ, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ১৬৫-৬৬।

৭. পূর্বে দ্রষ্টব্য.

৮. স্বর্ণলতা চৌধুরী, 'বৌমা', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ৭৬-৭৭।

সত্ত্বেও পিতামাতার সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ হতো না; কেননা অল্পবয়সী পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের বিশেষ যত্ন নিতে, এমন কি তাঁদের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দিতে পারতেন না – পরিবারের অন্যান্য সন্তানদেরও সমান দৃষ্টিতে দেখাই প্রচলিত রীতি ছিলো।

স্বামীর প্রণয় লাভ করলে একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা সব সময়ে বাড়তো কি না, স্থির করে বলা যায় না। কিন্তু তাঁর সন্তান, বিশেষ করে পুত্র, হলে তাঁর মর্যদা অবশ্যই বৃদ্ধি পেতো। বালিকা-বধূর চেয়ে 'খোকার মা'-র মর্যাদা নিঃসন্দেহে বেশি ছিলো।[৯] 'খোকার মা'-র ওপর পর্দার কড়াকড়ি তুলনা-মূলকভাবে কম ছিলো এবং শাশুড়ীর শাসনও আগের মতো কঠোর হতো না। তখনকার দিনে হিন্দুরা প্রথম পুত্র সন্তানের জন্মকে খুবই গুরুত্ব দিতেন, কারণ পুত্রকে তাঁরা কেবল ইহলোকে তাঁদের উত্তরাধিকারী বলেই গণ্য করতেন না, বরং শাস্ত্রানুসারে তাকে পারলৌকিক মুক্তির উপায় বলেও মনে করতেন। এ জন্যেই 'খোকার মা' হওয়ার পর বধূকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি 'স্বাধীনতা' দেওয়া হতো।

তবে সাধারণত শাশুড়ীর মৃত্যুর পূর্বে বধূ সংসারের কর্ত্রী হতেন না। সংসারে কর্ত্রীর মর্যাদা ছিলো কর্তার পরেই। পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিলো যথেষ্ট এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অনেক সময়েই তাঁর একটা বক্তব্য থাকতো। বধূ থেকে কর্ত্রীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া ছিলো সত্যিই উল্লেখযোগ্য। এখানে রাসসুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্ত আবার উল্লেখ করা যেতে পারে তবে ব্যতিক্রম হিশেবে। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে খুব কম বয়সে কর্ত্রী হন, কারণ আকস্মিকভাবে তাঁর শাশুড়ী অন্ধ হয়ে যান। বালিকা-বধূ হিশেবেও রাসসুন্দরী তুলনামূলকভাবে বেশি মর্যাদা পান। তাঁর শ্বশুর ছিলেন না এবং তাঁর স্বামী ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তা ছাড়া, একক পরিবার বলা না-গেলেও, তাঁর পরিবার ছিলো প্রকৃতপক্ষে বর্ধিত পরিবার। তাঁর স্বামীই ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্র এবং কন্যাদের সকলেরই বিবাহ হয়ে গিয়েছিলো।[১০] বালিকা-বধূরা যে কী দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে, তা সহজেই ধরা পড়ে। এমন কি, রবীন্দ্রসাহিত্যসহ বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য থেকেও মনে হয়, পরিবারে

৯. M.M. Urquhart, **Women of Bengal** (London : Y.M.C.A., 1925), P. 33, 40.

১০. রাসসুন্দরী দেবী, **আমার জীবন**, বিশেষ করে চতুর্থ থেকে অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বালিকা-বধূর স্থান ছিলো খুবই নীচুতে। বালিকা-বধূর ওপর শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়রা কী দারুণ অত্যাচার করতেন রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা,' 'স্ত্রীর পত্র' এবং 'হৈমন্তীর' মতো ছোটগল্প তার চমৎকার নিদর্শন।

একান্নবর্তী প্রথার ক্রমবিলোপ এবং মহিলাদের ওপর তার প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে একান্নবর্তিতা আদৌ প্রচলিত ছিলো কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[১১] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এ প্রথা হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিম্নবিত্তের হিন্দু এবং মুসলমানরা অবশ্য কখনই এ প্রথা তেমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন নি; কারণ বোধ হয় এই যে, এঁরা ছিলেন প্রধানত দরিদ্র চাষী। অপরপক্ষে, হিন্দু ভদ্রলোকরা যাঁদের প্রায় সবারই জমিজমা থেকে কমবেশি আয় ছিলো, তাঁরাই কেবল এ প্রথাকে স্বাগত জানান। এই প্রথা জনপ্রিয়তা অর্জন করে সম্ভবত ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত হিন্দু আইনে জটিলতা দেখা দেওয়ায়। এই অনুমান যথার্থ হলে, বলতে হয় যে, একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসনের অন্যতম ফলাফল। অবশ্য ইংরেজ শাসনকালে নগরায়নসহ অন্য যে সব সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা আবার তারই ফলে ভেঙে পড়ে।

বঙ্গদেশে জমিদারির প্রায় সবটাই ছিলো হিন্দুদের। উনবিংশ শতাব্দীতে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব জমিদারি বিক্রয় এবং বিভাগের ফলে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়।[১২] সাত দশকের মধ্যে জমিদারির সংখ্যা কয়েক শত থেকে দেড় লক্ষের অধিকে পৌঁছে।[১৩] এ কারণে জমির ওপর নির্ভরশীল ভদ্রলোকরা তাঁদের জীবিকার জন্যে এখন আর জমির ওপর আগের মতো নির্ভর করতে পারছিলেন না। এঁদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা শহরে চাকুরির সন্ধান করতে থাকেন। ফলস্বরূপ অনেক একান্নবর্তী পরিবারই দু ভাগে

১১. T. Raychaudhuri, 'Norms of Family Life etc.', pp. 14-15.
তপনরায় চৌধুরী, ভারতচন্দ্র রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় ছিলো না।

১২ B.B. Misra, **The Indian Middle Classes** (London : London Univ. Press, 1961). pp. 130-32.

13. **Report on the Administration of Bengal, 1881-82** (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1882), p 294.
১৮৮১-৮২ জমিদারির সংখ্যা ছিলো ১৫১, ৯৩৪।

বিভক্ত হয়ে পড়ে—এক ভাগ পূর্বপুরুষের ভিটে আঁকড়ে গ্রামেই পড়ে থাকলো, অন্য ভাগ চাকুরিজীবী 'পুত্রে'র কর্মস্থল শহরে বাস করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতার কথা বলা যেতে পারে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির চাকুরি পেয়ে তিনি ১৮২০ সালেই তাঁর পরিবারের একাংশ হুগলির পৈতৃক বাড়ি থেকে উত্তর ভারতীয় শহর মীবাটে স্থানান্তরিত করেন।[১৪] সেকালে এটা ছিলো একটা বড়ো ব্যতিক্রম। কারণ তখনো সর্বজনগৃহীত নিয়ম ছিলো এই যে, শহরে চাকুরি করলেও, স্ত্রী ও সন্তানরা গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতেই বাস করবেন এবং চাকুরে নিজে বছরের মধ্যে কয়েকবার গিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে থেকে আসবেন। অনেক বছর পরে, ১৮৬৪ সালে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁর স্ত্রীকে কর্মস্থল বোম্বাই নিয়ে যান, তখন এটা তাঁদের মতো অভিজাত ভদ্রলোকের পক্ষে খুবই অসাধারণ বলে বিবেচিত হয়।[১৫] তবে যতোই সময় অতিবাহিত হতে থাকে, ক্রমশ অধিক ভদ্রলোক একান্নবর্তী পরিবার থেকে আলাদা হয়ে শহরে বা কর্মস্থলে বাস করতে আরম্ভ করেন। এভাবে নগরায়ণ বা চাকুরি গ্রহণের ফলে বহু পরিবার বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শিক্ষিত ও "প্রগতিশীল" বহু যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলেও, অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শশিপদ ব্যানার্জি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, অঘোরনাথ গুপ্ত এবং সেকালের নাম-করা বহু শিক্ষিত ব্যক্তির উদাহরণই এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্যে এঁদের সবাইকেই কমবেশি নিগ্রহ ভোগ করতে হয় এবং মূল পরিবার ত্যাগ করতে হয়। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে পৈতা ত্যাগ করার পর শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হন। অতঃপর পরবর্তী উনিশ বছরের মধ্যে তাঁর পিতা তাঁর মুখ দেখেন নি।[১৬] ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং তাঁর শিক্ষিত স্ত্রী ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা মূর্তিপূজা এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মীয় আচার পালন করতে অস্বীকার করেন। ক্ষেত্রমোহনের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এতে এতোই ক্রোধান্বিত হন যে, স্ত্রীকে নিয়ে ক্ষেত্রমোহন কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে সেখানেই বাস করতে বাধ্য হন।[১৭]

১৪. N. Mukherji **A Bengal Zamindar: Jaykrisna Mukherji of Uttar-para and His Times**, P. 10.

১৫. দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট ১'।

১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৭. **কুমুদিনীর চরিত**, পৃ. ১৬-১৭, ৫১।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টান্তও অনুরূপ।[১৮] রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা তাঁর ওপর খুবই বিরক্ত হন। অবশ্য এজন্যে তাঁরা রাজনারায়ণকে পৈত্রিক ভিটে ছাড়তে বাধ্য করেন নি। কিন্তু তিনি যখন তাঁর দুই খুড়তুত ভাইকে বিধবা বিবাহ করতে সহায়তা করেন, তখন তাঁর মা এবং খুড়া তাঁকে পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এরপর রাজনারায়ণ স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে মেদিনীপুর শহরে বাস করতে থাকেন।[১৯] এক দশক পরে তিনি যখন গ্রামে ফিরে আসেন, তখন তাঁর খুড়া তাঁকে পৈত্রিক ভিটে থেকে খানিকটা দূরে একখানা নতুন ঘর তৈরি করে সেখানে বাস করতে বাধ্য করেন। তাঁর খুড়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, রাজনারায়ণ পৈত্রিক ভিটেয় বাস করলে সমগ্র বসু পরিবারকেই হয়তো সমাজচ্যুত হতে হবে।[২০] শশিপদ ব্যানার্জিও মোটামুটি একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।[২১] আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু বিধবা বিবাহ করায় তাঁরাও মূল পরিবার থেকে আলাদা বাস করতে বাধ্য হন।[২২]

তদুপরি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশহেতু নগরবাসী যুবকদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দানা বাঁধতে শুরু করে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে মহিলাদের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। এই শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমাজ ও সংসার থেকে আলাদাভাবে ব্যক্তির মতো ভাবতে আরম্ভ করেন। আপনাপন সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির চিন্তা এবং নিজেদের সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা খাটানোর আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশ প্রবল হচ্ছিলো। এই ঘটনাকে বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের এবং আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই নব্য যুবক-যুবতীরা একক অথবা বর্ধিত পরিবারের পরিমণ্ডলে ঘনিষ্ঠতর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ও সন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনের পক্ষপাতী ছিলেন।[২৩] তাঁরা স্বামী ও স্ত্রীকে

১৮. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী. **ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত ঘটনা** (কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৮২), বিভিন্ন স্থানে।

১৯. **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী**, পৃ. ৬৩; **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত** পৃ ১০০-০১।

২০. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ. ১১১।

২১. A R. Banerji, **An Indian Path finder**, pp. 60-61, 82-83, Passim.

২২. **বামাগ**, আশ্বিন ১২৭৬, পৃ. ১১৭; শিবনাথ শাস্ত্রী **আত্মচরিত**, পৃ. ৭৬-৭৮, ৮৫-৮৬।

২৩ ভুবনমোহন সরকার, **'পারিবারিক সংস্কার'**, পৃঃ ২৩৪-৩৭।

মনে করেন পরস্পরের সঙ্গী হিশেবে। তাঁরা অনুভব করেন, স্বামী-স্ত্রীর এ রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একক পরিবারেই গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং তাঁরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করেন। একক পরিবারের প্রতি তরুণদের পক্ষপাতিত্বকে ঐতিহ্যিক সমাজ অবশ্য বিশেষ করে স্ত্রীদের স্বার্থপরতা বলে আখ্যায়িত করেন।

বলা শক্ত, ঠিক কখন থেকে একক পরিবারের ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। তবে পূর্বোক্ত তরুণ ব্রাহ্মরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে সরে আসেন ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে। আগেই লক্ষ্য করেছি, সত্যেন্দ্রনাথ এটা করেন ১৮৬৪ সালে, কেশব সেন ১৮৬২-তে, ক্ষেত্রমোহন ১৮৬১-র দিকে, শিবনাথ ১৯৬৯-এ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বিপিন পাল ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে। একক পরিবারে বাস করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে—এ বিষয়ে মহিলারা ঠিক কখন সচেতন হন, তা অবশ্য বলার উপায় নেই। সে যুগে যে-মহিলারা একক পরিবারে বাস করেন, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই সম্ভবত প্রথম আত্মজীবনী লিখেন। সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদাকে যে-পত্রাদি লেখেন তা থেকে বোঝা যায় যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভেতরে পারস্পরিক সম্পর্ক কখনো কখনো অপ্রীতিকর হয়ে উঠতো।[২৪] জ্ঞানদা নিজে যে-আত্মকথা লেখেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি একক পরিবারে বাস করে সুখী হয়েছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্মিত হয়েছিলো বোঝাপড়া ও ভালোবাসার ওপর; কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি সরাসরি একথা কোথাও বলেন নি যে, একক পরিবারই তিনি পছন্দ করতেন। সুতরাং কেন একক পরিবার পছন্দ করতেন, তা ব্যাখ্যা করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ও তিনি দীর্ঘ ছুটিতে কলকাতায় এলে তাঁরা সাধারণত জোড়াসাঁকোয় না উঠে, আলাদা বাসায় বাস করতেন।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত একটি লেখায় *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় বলা হয় যে আধুনিকা স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে একক পরিবারেই বাস করতে চান এবং সেখানে পরিবারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হতে চান।[২৫] স্ত্রীদের এই সচেতনতা একান্নবর্তী প্রথাকে একেবারে ভেতর থেকে নাড়া দেয়। ফলস্বরূপ, জোড়াসাঁকো-ঠাকুরপরিবারের মতো ঘনিষ্ঠবন্ধনে আবদ্ধ

২৪. জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি, পত্র সংখ্যা ৩১, ৫০, ৫২ ও ৭২, *পুরাতনী*, পৃ. ৯০, ১০৯, ১১২ ও ১৩৩।

২৫. 'নব্যবঙ্গ মহিলা', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, ৩৫৩।

এবং রক্ষণশীল পরিবারেও, পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিকতা হারাতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিবারে ফাটল ধরে। ভালো চাকুরি এবং স্বাধীন আয়ের অধিকারী হয়ে কেবল-যে সত্যেন্দ্রনাথই পরিবার থেকে সরে যান, তাই নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথও একই পথ অনুসরণ করেন; এমন কি ১৮৯০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথও। একান্নবর্তী পরিবারে বাস করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, না তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী অসুখী হয়েছিলেন, না কি দুজনেই, তা জানা যায় না। কিন্তু তাঁরা জোড়াসাঁকোর বাইরে বাস করতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত এই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ সমর্থক হয়ে ওঠেন। তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, এ সময়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে তিনি স্ত্রীকে অন্তঃপুরের বাইরে নিয়ে আসেন। এমন কি, এসময়ে তিনি স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়তে শেখান।[২৬] একজন বাঙালি মহিলার পক্ষে এখন ঘোড়ায় চড়া তেমন বিস্ময়কর না-ও হতে পারে, কিন্তু এক শতাব্দী আগে, তা নিতান্তই প্রথাবিরুদ্ধ ও পুরুষালি বলে গণ্য হতো এবং অনুমোদনের অযোগ্য ছিলো। জোড়াসাঁকোর এই বাহ্যত শান্তিপূর্ণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অভিজ্ঞতাও আদৌ সুখের ছিলো না।[২৭] ১৮৯৮ সালের জুন মাসে মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে, তাঁর পক্ষে জোড়াসাঁকোয় বাস করা ক্রমাগত অসম্ভব হয়ে পড়ছিলো।[২৮] উত্তরে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে আরো কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেন। এই চিঠিতে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সন্তানদের সঙ্গে তাঁকে তিনি শিলাইদহে নিয়ে আসবেন এবং সেখানেই তাঁরা সকলে একত্রে বাস করবেন।[২৯] পরের বছরের শুরুতে মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে যান এবং তারপরে আর কখনো স্থায়িভাবে জোড়াসাঁকোতে ফিরে আসেন নি। শিলাইদহের মতো অজপাড়াগাঁয়ে বছর দুয়েক বাস করার পর মৃণালিনী দেবীর কাছে সেখানে বাস করা যখন অসম্ভব বলে মনে হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন; তবু মৃণালিনী জোড়াসাঁকোয় ফিরে যান নি।

২৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮।

২৭. মৃণালিনী দেবীর অভিজ্ঞতাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) গল্পে প্রতিফলিত হয়।

২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ সং; কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭১), পৃ. ৪৮১।

২৯. মৃণালিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ১৬ (জুন ১৮৯৮), চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং; কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৬৬), পৃ. ৩৬।

শতাব্দীর শেষ নাগাদ আধুনিকা স্ত্রীদের প্রকৃত ব্যবহার এবং শ্বশুরবাড়ির রক্ষণশীল আত্মীয়রা তাঁদের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলেন— এর মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা দেয় যে, বহু পরিবারেই স্ত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্ক পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও ঘৃণায় পূর্ণ হয়। ফলে আধুনিকারা একান্নবর্তী পরিবারে বাস করা খুবই অপছন্দ করতে আরম্ভ করেন। বামাবোধিনী পত্রিকা-র ভাষায়, তাঁরা ভাবেন:

> "স্বামীর চাকরি হইবে, স্বামীর সহিত কর্মস্থানে যাইব, শাশুড়ী ননদিনীদিগের হাত এড়াইয়া রাঁধুনী, চাকরাণী প্রভৃতির উপরে সম্রাজ্ঞী হইব" ইহাই ইঁহাদিগের চরম সুখেচ্ছা।[৩০]

এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার দরুণ তাঁদের স্বার্থপর বলে দোষারোপ করা হলেও, আধুনিকারা সত্যি সত্যি একক অথবা বর্ধিত পরিবারে বাস করতে চাইতেন।

সেকালের কিছু শিক্ষিত মহিলা লিখেছেন যে, ভদ্রলোকদের একটি অংশ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে একক এবং অথবা বর্ধিত পরিবারপ্রথার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।[৩১] ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে যে-ব্রাহ্ম মহিলারা একক পরিবারে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁরা সে বিষয়ে কিছু না লিখলেও, পরবর্তী মহিলাদের কেউ কেউ একক পরিবার কেন পছন্দ করেন, সে বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের সুষমাসুন্দরী দাস যেমন স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল প্রতিবেশ থাকে বলে একক পরিবার প্রথা সমর্থন করেন।[৩২] শরৎকুমারী চৌধুরানী একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে সেকেলে বলে অভিহিত করেন এবং আধুনিককালের অনুপযোগী বলে মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আগের যুগে যাতায়াত ব্যবস্থা এতো বিপজ্জনক ছিলো যে, তীর্থে যাবার পূর্বে লোকেরা 'উইল' করে যেতেন। তখন পৈত্রিক বাড়ি থেকে পরিবার নিয়ে কর্মস্থলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব কাজ ছিলো। কিন্তু, তিনি দাবি করেন, যাতায়াত ব্যবস্থার, বিশেষ করে রেলওয়ের উন্নতি হওয়ায়, পৈত্রিক বাড়ি থেকে দূরে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানরা একত্রে বাস করতে চান।[৩৩] একক পরিবারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কুমুদিনী রায়ও

৩০. 'স্ত্রীশিক্ষা', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ. ২২৯।

৩১. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেয়ে', পৃ. ৩৯২; মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীর অবস্থা', বামাপ, ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ১৩৭।

৩২. সুষমাসুন্দরী দাসী, 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার উপায়,' বামাপ, আষাঢ় ১২৯৬, পৃ. ৯৬।

৩৩. 'শরৎকুমারী চৌধুরাণী, 'একাল ও একালের মেয়ে', পৃ. ৩৯২।

শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একক পরিবারের বিকাশ সহজতর হয়েছে।—'নারীর কার্যক্ষেত্র, পারিবারিক ও সামাজিক' প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ পৃ. ১৩৫।

লক্ষ্য করেন। তিনি নিজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথার সমর্থক হলেও, স্বীকার করেন যে, একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের অনেক সময়েই ঝগড়াঝাটি হয়, বিশেষত জা ননদ ও ভ্রাতৃবধূদের মধ্যে।[৩৪]

একান্নবর্তীপ্রথা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলে স্ত্রীদের প্রত্যাশিত ও প্রচলিত ব্যবহার অনেকটা পাল্টে যায়। এর ফলে তাঁদের সম্পর্কের ভূমিকা ও মর্যাদা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। শিক্ষিত স্ত্রীরা এখন তাঁদের অধিকার সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছিলেন এবং নিরঙ্কুশ অধীনতা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের কাছে তাঁদের হ্রাস পেয়েছিলো এবং এখন তাঁরা আর আগের মতো গৃহকর্ম করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বস্তুত, এখন তাঁরা পরিবারেব মধ্যে তাঁদের ভূমিকার ঈষৎ পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাব

একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে একক এবং/অথবা বর্ধিত পরিবার ধীরে ধীরে প্রচলিত হওয়ায় আধুনিক স্বামী-স্ত্রীরা তাঁদের সম্পর্ক এবং বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের পুনর্মূল্যায়ন করতে আরম্ভ করেন। তখনো পর্যন্ত হিন্দু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিলো পুত্রলাভ।[৩৫] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাহ-সংক্রান্ত একটি নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব হয়। পুত্রলাভের জন্যে বিবাহ করার ধারণাকে তাঁরা নীচু ও সভ্য ব্যক্তিদের অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। শারীরিক মিলনের মাধ্যমে পুত্র জন্ম দেওয়াই যে-বিবাহের লক্ষ্য এবং যে-বিবাহ পারস্পরিক প্রণয়ের ওপর রচিত নয়, তা তাঁদের মতে নারকীয়। তাঁরা দাবি করেন যে, এ ধরনের বিবাহ ঐতিহ্যিক সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত হলেও, তা আসলে পৃথিবী এবং তার পরিবেশকে কলুষিত করে তুলছে।[৩৬] পরবর্তীকালে মহিলারাও এ ধরনের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী দাস এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি

৩৪. কুমুদিনী রায়, 'হিন্দুনারীর গার্হস্থ্য ধর্ম', বামাপ পৌষ ১৩০১, পৃ. ২৮৪-৮৫।

৩৫. বামাপ, আশ্বিন ১২৭৪, পৃ. ৫৮২।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—এ প্রাচীন সংস্কৃত উক্তি থেকেই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়।

৩৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, পৃ. ৯০; বামাপ, আশ্বিন ১২৭৪, পৃ. ৫৮৩।

যে, তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংলণ্ডে বাসকালে সেখানকার নারীমুক্তি আন্দোলনসহ বহু পাশ্চত্য ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।[৩৭] তিনি স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ও বিবাহকে ঐতিহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন নি। বস্তুত, তিনি যখন দাবি করেন যে, মহিলার জন্ম কেবল পুরুষদের সম্ভোগ ও সুবিধার জন্যে এ ধারণা নীচ ও অসভ্যজনোচিত, তখন তাঁকে সেকালের অধিকাংশ মহিলার তুলনায় প্রাগ্রসর মনে না করে পারা যায় না। তিনি যুক্তি দেখান, এরূপ ধারণা অসভ্যদের মধ্যে (ইঙ্গিতে বলেন বাঙালিদের মধ্যে) এতোই প্রবল ছিলো যে, তারা ভাবতেই পারতো না, পুরুষদের ভোগে লাগা ছাড়া মহিলাদের সৃষ্টি করার পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো।[৩৮] এভাবে আধুনিক বাঙালি মহিলারা হিন্দুবিবাহ-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। তাঁরা অনুভব করছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপুরি পাশ্চাত্য ইহলৌকিকতার আলোকে সংস্কার করা প্রযোজন। তাঁরা ভাবী স্বামীদের সম্পর্কেও সচেতন হচ্ছিলেন; কারণ স্বামীদের শিক্ষা, পারিবারিক পটভূমি, পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাস এবং বিবাহ ও স্ত্রীবিষয়ক মনোভাব সবই তাঁদের সুখের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসেন কি না—এ প্রশ্ন একান্নবর্তী ও একক উভয় শ্রেণীর পরিবারস্থ বধূদের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়; কেননা, পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে, এর ওপরই পরিবারে বধূর মর্যাদা কমবেশি নির্ভর করতো। সিমলায় কয়েক বছর বাস করার পর শা. দাসী ১৮৮১ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। এ সময়ে তিনি মেয়ে মহলে একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হন। তিনি দেখতে পান, একত্রিত হলে মেয়েরা আর আগের মতো পরস্পর এ প্রশ্ন জিগেস করেন না যে, শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়রা 'ভালো' এবং সহানুভূতিশীল কি না, বরং স্বামী ভালো মানুষ কি না এবং স্ত্রীকে ভালোবাসেন কি না, সেটা জানতেই তাঁদের আগ্রহ। তিনি অবাক হয়ে আরো লক্ষ্য করেন যে, কোনো কোনো স্ত্রী স্বামীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন, অথচ আগে স্বামীর নামোল্লেখ রীতিমতো নিষিদ্ধ ছিলো। তাঁর লেখা থেকে মনে হয়, কোনো কোনো পরিবারে বধূদের ওপর শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের

৩৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্য: 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতা; **ভারতী ও বালক** শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ. ১৯৩-২০২।

৩৮. কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', **ভারতী ও বালক**, ফাল্গুন ১২৯৬, পৃ. ৬১৫-১৬।

শাসন ও নিয়ন্ত্রণ আগের মতো কঠোর ছিলো না। স্বামীর ঔদার্য ও ভালোবাসার ওপরই বহু পরিবারে বধূর মর্যাদা ও স্থান নির্ভর করছিলো।

শা. দাসী আরো লক্ষ্য করেন যে, একান্নবর্তী পরিবারে বিবাহিত পুত্রের সঙ্গে তাঁর পিতামাতার সম্পর্ক, বিশেষ করে মাতার সঙ্গে সম্পর্ক, ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছিলো। কারণ বধূকে কঠোর শাসন করায় পুত্র প্রতিবাদ করতে পারছিলেন না, আবার প্রসন্ন মনে তাকে মেনেও নিতে পারছিলেন না।[৩৯] শা. দাসী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রতি এই পরিবর্তিত মনোভাবের নিন্দা করেন নি সত্য, কিন্তু এই পরিবর্তনকে তিনি যে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, এটা তাঁর রচনা থেকে বোঝা শক্ত হয় না। মনে হয়, তিনি যা লিখেছিলেন তা সঠিক। বামাবোধিনী পত্রিকা-য়ও তাঁর বক্তব্যের সমর্থন মেলে। মোটামুটি একই সময়ে বামাবোধিনী-তে বলা হয়, আধুনিক স্বামী তাঁর স্ত্রীকে শকুন্তলা প্রভৃতি কালিদাসের নায়িকাদের মতোই সুন্দরী ও কোমল বলে বিবেচনা করেন, এবং এহেন স্ত্রীকে গৃহকর্ম করতে বললে মাকে গণ্য করেন নিষ্ঠুর বলে।[৪০] বামাবোধিনী-র সম্পাদকের মনোভাবকে এখন গর্বান্ধ পুরুষালি মনোভাবের মতো মনে হতে পারে; কিন্তু সেকালে এ ধরনের মনোভাবই ছিলো জনপ্রিয়। এবং আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাবো, মেয়েরা নিজেরাও এরূপ মনোভাবের শরিক ছিলেন।

স্বামীর ভালোবাসা এবং সহানুভূতির ওপরই যদি পরিবারে বধূর মর্যাদা তথা সুখ অতোখানি নির্ভর করতো, তা হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মেয়েরা তাঁদের পছন্দসই স্বামী পেতে চাইবেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তখন অভিভাবকরা বর ও কনের মতামত ছাড়াই বিয়ের আয়োজন করতেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর ও কনে বিয়ের আসরেই পরস্পরকে প্রথম বারের মতো দেখতে পেতেন। অবশ্য অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে বেশ কয়েকজন লেখকই অনুভব করেছিলেন যে, এরকম বিবাহ সংসারে সকল অশান্তির মূল এবং সে কারণে এ রকম বিবাহপ্রথা উচ্ছেদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৪১] দু-এক দশকের মধ্যে কিছু

৩৯. শা. দাসী, 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ', **ভারতী**, ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৮৮, পৃ. ২৩৩, ৩৬৬।
৪০. **বামাপ**, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ১৩।
৪১. অক্ষয়কুমার দত্ত, **বিদ্যাদর্শন**, কার্তিক, ১২৪৯, **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র** তৃতীয় খণ্ডে উদ্‌ধৃত, পৃ. ৫৭৩; **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**, ভাদ্র ১৭৬৭ শকাব্দ (১৮৪৫), **ধর্মনীতি**, পৃ. ৬৭; কালীপ্রসন্ন ঘোষ, **নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব**, পৃ. ২২৮-২৯; 'বিবাহ', ভাদ্র ১২৭৪, পৃ. ৫৮১-৮২; **জ্ঞানাঙ্কুর**, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬১-৬২; 'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজসংস্কার', **বঙ্গমহিলা**, চৈত্র ১২৮২, পৃ. ২৭৯।

মহিলাও এ বিষয়ে সচেতন হন। বিবাহার্থী নর ও নারীর একে অন্যকে পছন্দ করে নেওয়া উচিত,—এ সম্পর্কে তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। নগেন্দ্রবালা উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে লেখিকা হিশেবে বেশ নাম করেছিলেন। বর-কনের সম্মতি ছাড়াই-যে অভিভাবকগণ বিবাহের আয়োজন করেন—একে তিনি অন্যায় বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অভিভাবকগণ এটাও বিবেচনা করেন না যে. প্রস্তাবিত পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে আদৌ কাঙ্ক্ষিত মিল হতে পারে কি না। তাঁর মতে, সমাজ যদি পুরুষ ও নারীদের পরস্পরকে পছন্দ করে বিবাহ করার অনুমতি দেয়. তা হতে স্বামী স্ত্রীর অপ্রণয়জনিত সমস্যাদি সহজেই দূরীভূত হতে পারে।[৪২] নগেন্দ্রবালা ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারের কন্যা এবং স্ত্রী। তাঁর অভিভাবক সম্ভবত তাঁর সম্মতি ছাড়াই তাঁর বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর রচনা থেকে মনে হয়, তাঁর বিবাহিত জীবন সুখেরই হয়েছিলো। কিন্তু সমকালীন চিত্রই তিনি তাঁর লেখায় বিধৃত করেন। তাঁর যুক্তিতে যে খুব স্বকীয়তা ছিলো, তা-ও নয়; কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় কুমার দত্তের ধর্মনীতি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাবে বহুদিন আগে যা লেখা হয়েছিলো তারই প্রতিধ্বনি করেন।[৪৩] কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলারা তাঁদের বিবাহ-সংক্রান্ত অধিকার এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন।

এই সচেতনতা বৃদ্ধি হেতু গত শতাব্দীর শেষ দু দশকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক হিন্দু মহিলা তাঁদের নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ বসু তাঁর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুব নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে বিবাহ হবে এই প্রশ্নে রাজনারায়ণ ও কৃষ্ণকুমারের মতানৈক্যবশত বিবাহের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরূপে কৃষ্ণকুমার মিত্র বিবাহ করতে চান ১৮৭২

৪২. নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, 'প্রয়োজনীয় প্রার্থনা', বামাপ, আশ্বিন ১৩০১, পৃ. ১৯১-৯২।

৪৩. কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত মহিলা নর্মাল বিদ্যালয় ও বেথুন বিদ্যালয়—উভয় বিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়েদের জন্যে অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মনীতি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, পাঠ্য হয়। মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্রষ্টব্য: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী.) দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি (দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের (দ্রষ্টব্য: নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব) মতো ব্যক্তিদের ওপর অক্ষয়-কুমার দত্তের প্রভাব ছিলো সুবিপুল। মহিলারাও যে অনুরূপভাবে তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এটা ছিলো স্বাভাবিক।

সালের তিন আইন তথা ব্রাহ্মবিবাহ আইনানুসারে। এই আইনানুসারে বিবাহ কেবল একটি সামাজিক চুক্তি বলেই বিবেচিত হয়, ধর্মীয় স্যাক্রামেণ্ট বলে গণ্য হয় না। অপরপক্ষে, আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান নেতা রাজনারায়ণ বসু প্রণয়নকালে প্রস্তাবিত এই আইনের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। সুতরাং তিনি চান যে, তাঁর কন্যার বিবাহ হবে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার ও রীতি অনুসারে। এই আচার ও রীতি হিন্দু আচার ও রীতি থেকে মূলত অভিন্ন ছিলো, কেবল হিন্দুদের প্রতিমাপূজাসংক্রান্ত আচারসমূহ ব্রাহ্মদের অনুষ্ঠান থেকে বর্জিত হয়েছিলো। আগের যুগে হলে রাজনারায়ণ বসুর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো এবং বিবাহটি নির্ঘাত ভেঙে যেতো। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের মনোভাব যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তিত হওয়ায়, তিনি ঠিক করেন এ বিষয়ে তিনি তাঁর কন্যার মতামত জেনে নেবেন। লীলাবতী কৃষ্ণকুমারকে বিবাহ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ফলে রাজনারায়ণ কৃষ্ণকুমারের সঙ্গেই কন্যার বিবাহের আয়োজন করেন। রাজনারায়ণ নিজে এ বিবাহে সম্মত ছিলেন না; বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না; কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিবাহ-কর্ম সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানেও কন্যা সম্প্রদান করেন রাজনারায়ণের ছোটো ভাই এবং অনুষ্ঠানে পরে রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।[৪৪]

সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম নেতা চণ্ডীচরণ সেন যখন তাঁর বড়ো মেয়ে কামিনী সেনের বিয়ে দেন, তখন কামিনীর বয়স ৩০ এবং এ বয়স সেকালে বিবাহের জন্যে খুবই বেশি বলে বিবেচিত হতো। আগেই বলা হয়েছে, কামিনী খুব মেধাবী ছাত্রী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রথম কয়েক জন মহিলা গ্র্যাজুয়েটের অন্যতম। তা ছাড়া, তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর কাব্য গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) প্রকাশিত হলে তিনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহিলা কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, তিনি ১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি একজনের প্রেমে পড়েছিলেন। হয় তাঁর পিতা এ বিবাহে সম্মত হন নি, নয়তো অন্য কোনো কারণবশত এ বিবাহ হতে পারে নি। কামিনী এতে দুঃখিত ও হতাশ হন। অতঃপর প্রায় এক দশক পরে তিনি কেদারনাথ রায় নামক যে সিবিলিআনকে বিবাহ করতে সম্মত হন, তিনি ছিলেন কামিনীর একজন প্রধান ভক্ত। আলো ও ছায়া প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেদারনাথ এ কাব্যের প্রশংসামূলক একটি সমালোচনা

৪৪. তত্ত্বপ, ভাদ্র ১৮০৩ শকাব্দ (১৮৮১), পৃ. ৯৮; বামাপ, শ্রাবণ ১২৮৮, পৃ. ১২৫-২৮।

আশ্চর্যের বিষয় রাজনারায়ণ এ বিষয়ে তাঁর আত্মজীবনে কিছুই উল্লেখ করেন নি।

প্রকাশ করেছিলেন।[৪৫] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ চিকিৎসাবিদ, কামিনীর কনিষ্ঠ যামিনী সেন আদৌ বিয়েই করেননি।[৪৬]

কুমুদিনী খাস্তগীরের সঙ্গে এক জায়গাতে কামিনীর দৃষ্টান্ত অভিন্ন, সে হলো ৩০ বছর বয়সের আগে কুমুদিনীরও বিয়ে হয় নি। তিনি কামিনীর এক বছর পর—১৮৮৭ সালে বি.এ. উত্তীর্ণ হন। কুমুদিনীর পিতা অন্নদাচরণ খাস্তগীর ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং ১৮৭২ সালের দেশীয় অযাজকীয় বিবাহ আইন (যা ব্রাহ্ম বিবাহআইন নামেই সমধিক পরিচিত হয়) প্রণয়নে তিনি খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু আইন প্রণীত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই একজন খুব যোগ্য সিবিলিআন পাত্র পেয়ে তিনি এ আইনের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা দেখিয়ে বড়ো মেয়ে সৌদামিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এ বিয়ে হয়েছিলো হিন্দু রীতিতে। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো।[৪৭] বিয়ে সম্পর্কে সৌদামিনীর মনোভাব যথেষ্ট আধুনিক ছিলো বলে জানা যায়।[৪৮] এ বিবাহের সময়ে তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বছর এবং এ বিয়ে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের প্রতি কেউই তেমন কোনো মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু পরবর্তী দশকে কুমুদিনী ভিন্ন ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পিতার পছন্দ মতো পাত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু এ ধরনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সরলা দেবীর। প্রথমে লোকেন পালিত এবং তারপর মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু এঁদের কারো সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা হয় নি কারণ কী বলা শক্ত। হতে পারে যে, তিনি মনে করেন নি এঁদের কেউ স্বামী হিশেব ভালো হবেন। অথবা হতে পারে যে, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, লোকেন এবং মনোমোহন কায়স্থ বলে তাঁর অভিভাবকগণ কিছুতেই তাঁদের কারো সঙ্গে তাঁর বিয়েতে রাজি হবেন না।[৪৯]

৪৫. 'আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ১৬৮।

৪৬. যামিনী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্যে দ্রষ্টব্য: কামিনী রায়, 'ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন', বঙ্গনারী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৩৯।

আরো দ্রষ্টব্য: হেমলতা সরকার, 'স্বর্গীয় ডাক্তার যামিনী সেন', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৮, পৃ. ৮৪৬-৪৮; 'স্বর্গীয় যামিনী সেন', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ. ৭৩৮।

৪৭. 'শোচনীয় ঘটার বিবাহ', বামাপ, কার্তিক ১২৭৯, পৃ. ২২৩-২৪।

৪৮. ঐ: পৃ. ২২৩।

৪৯. সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ৯৬-৯৭, ১৭৮।

আত্মজীবনীতে সরলা কায়স্থদের প্রতি তাঁর মনোভাব গোপন করেন নি। তবে এ মনোভাব সম্ভবত তাঁর যৌবনকালের নয়।

সুতরাং তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের ওপর সরলার মাতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। তিনিও সরলাকে বিবাহে সম্মত করাতে পারেন নি। দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট ঐতিহ্যিক ছিলেন; তিনি জানতেন, মেয়েদের পক্ষে অবিবাহিত থাকা সমাজের চোখে দারুণ লজ্জার বিষয়। তাই তিনি একখানা তরবারীর সঙ্গে সরলার বিয়ে দিতে বলেন।[৫০] এ ধরনের বিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কখনো কখনো হতো। তিনি আশা করেন, অন্তত তরবারীর সঙ্গে বিয়ে হলেও সমাজ হয়তো সরলার সমালোচনা করবে না, অথবা কম করবে। সরলার বড়ো বোন হিরণ্ময়ী দেবী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং মামাতো বোন ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। ফণিভূষণ এবং প্রমথ উভয়ে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং হিরণ্ময়ী ও ইন্দিরার বিয়ের ব্যাপারে কোনো জটিলতা দেখা দেয় নি; তাদের পছন্দ করা পাত্রদের সঙ্গেই তাঁদের বিয়ে হয়।[৫১] এসব উদাহরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষিত মহিলারা তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে এবং ফলত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে ক্রমশ অধিকতর সচেতন হচ্ছিলেন।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে মহিলাদের মনোভাব কেমন করে পাল্টে যাচ্ছিলো, তা তখনকার দুজন নাম-করা লেখিকা -- মানকুমারী বসু ও শরৎকুমারী চৌধুরানীর লেখা থেকে বোঝা যায়। মানকুমারী এবং শরৎকুমারী প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন (মানকুমারী ১৮৬৩ সালে, শরৎকুমারী ১৮৬১ সালে). কিন্তু তাঁদের পারিবারিক পটভূমিতে ছিলো দুস্তর ব্যবধান। মানকুমারী ছিলেন ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতিনিধি, শরৎকুমারী আধুনিক মূল্যবোধের। মানকুমারী যশোহরের একটি রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিয়েও হয় রক্ষণশীল পরিবারের এক যুবকের সঙ্গে। গ্রামের বিদ্যালয়ে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা তাঁর রক্ষণশীল চিন্তাধারাকে সামান্যই উদার করতে পেরেছিলো। তদুপরি মাত্র সাড়ে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর, তিনি আরো বেশি ঐতিহ্যিক হয়ে পড়েন।[৫২] ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় মানকুমারী বলেন যে, পাশ্চাত্যায়নের ফলে পুরোনো মূল্যবোধসমূহ পাল্টে যাচ্ছে। আধুনিকা স্ত্রী স্বামীকে

৫০. ঐ, পৃ. ১০৭।

৫১. ঐ, পৃ. ৫৬। বিয়ের আগে ইন্দিরা ও প্রমথ যে-পত্রাদি লেখেন তার মধ্যে ৩৩টি সাহিত্য সংখ্যা দেশে (১৯৮০) প্রকাশিত হয়েছে। একটি চিঠি থেকে দেখা যায়, ইন্দিরার পিতা-মাতার এ বিয়েতে সম্মতি ছিলো। দ্রষ্টব্য: ইন্দিরার চিঠি (১৫.৯.১৮৯৪), পৃ. ২৪-২৫।

৫২. দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. মানকুমারী বসু, (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২), পৃ. ৫-১৩।

বন্ধুর মতো গণ্য করেন এবং স্বামীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, এতে মানকুমারী পরিতাপ করেন। তিনি দাবি করেন, স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা মিশ্রিত না-থাকলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কখনোই আদর্শ স্থানীয় হতে পারে না।[৫৩] অপরপক্ষে, শরৎকুমারী চৌধুরানী স্বামী-স্ত্রীর সে ধরনের সম্পর্কের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান যা সমতা ও পারস্পরিক ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত একটি লেখায় তিনি আগের যুগের স্ত্রীদের সঙ্গে আধুনিক কালের স্ত্রীদের তুলনা করেন এবং আধুনিকাদের পক্ষে রায় দেন। তিনি লেখেন:

> সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন, একালের মেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকে।... সেকালের মেয়েরা স্বামী-নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং স্বামীকেও সকল কথা কহা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে স্বামীর সহিত তাঁহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না। একালে স্বামী-স্ত্রীকে কতকটা বন্ধুভাবে দেখেন...একালের স্বামীকে ততদূর ভয় করেন না বরং তিনিই বাটীর গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্বদা তাঁহার স্নেহ যত্ন পাইয়া থাকেন। একালে স্নেহভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্থটি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না[৫৪]

শৈশবকাল থেকেই শরৎকুমারী চৌধুরানী বঙ্গদেশের বাইরে সুদূর পাঞ্জাবে মানুষ হন। তাঁর পিতা শশিভূষণ বসু ছিলেন বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের শিষ্য এবং স্ত্রীশিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক। প্যারীচরণের আদর্শে প্রভাবিত শশিভূষণ তাঁর কন্যাকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি যে-শিক্ষা লাভ করেন,তা ছিলো যথেষ্ট মাত্রায় অনৈতিহ্যিক। তবে তাঁর বিবাহ হয় মাত্র ৯ বছর বয়সে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন স্বামী পান, যিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও উদার। তাঁর স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এম. এ. বি. এল. এবং কলকাতা হাইকোর্টের একজন সফল উকিল। তাছাড়া, তিনি কবি হিশেবেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিয়ের পর তিনি শরৎকুমারীকে শিক্ষাদানের জন্যে একজন ইংরেজ মহিলাকে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎকুমারী উভয়ই সাহিত্যখ্যাতি লাভ করেন এবং মহিলাদের আধুনিকায়নের পক্ষপাতী হন। স্বামী-স্ত্রী হিশেবে তাঁদের

৫৩. মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে', পৃ. ১০৭-০৮।
৫৪. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেয়ে', পৃ. ৩৯৬।

সম্পর্ক ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভালোবাসার ওপর রচিত।[৫৫] তাঁর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণ তাই সহজেই বোঝা যায়। আধুনিকতার প্রতি দৃশ্যত তাঁর পক্ষপাত সত্ত্বেও, আধুনিকা স্ত্রী ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ বেশ নিরপেক্ষ ও সঠিক বলেই মনে হয়,—অন্তত তা সেকালের অন্যান্য তথ্যাদির সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতামতও যথেষ্ট আধুনিক। **ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা** গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ইংরেজসমাজ ও বাঙালিসমাজে প্রচলিত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এভাবে তুলনা করেন:

> লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই...উত্তর দিবেন "পৃথিবীতে জীবনের একজন সমসুখদ:খভাগিনী, সহধর্মিণী, সহকারিণী, পাইবার জন্য।" এ দেশীয় স্ত্রীরা যে স্বামীর সুখদু:খভাগিনী, সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। স্ত্রীপুরুষ সমভাবে সুখদ:খ ভোগ করেন, এক সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং স্ত্রী অনেক সময়ে নানা কার্যে স্বামীর সাহায্য করেন। অনেক সময়ে স্বামী অপারগ হইলে স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া স্বামীর ও সন্তানদের আহার জোগাইয়া থাকেন।...
>
> কোন কার্য করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী আগে স্ত্রীর পরামর্শ লন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভু না ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয়সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমতো চেষ্টা পান। এজন্য ইংরাজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া অন্য কোন বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এক কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত...।
>
> আমাদের দেশের দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধ স্ত্রী স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না। এবং স্ত্রী কি রূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ীর গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজান বৈঠকখানায় বসিয়া হুকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান; কিন্তু গৃহিণীরা সেই বাড়ীর ভিতর বসিয়া এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন। তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন

৫৫. (স্বর্ণকুমারী দেবী), শুভবিবাহ-রচয়িত্রী', ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃ. ৪৬৮-৬৯।

তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পান না বা জানেন না। স্ত্রীপুরুষে যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই বুঝেন।...ভারত ললনাদের সুদৃঢ় সতীত্ব-বন্ধন থাকিলেও নানা কারণে দম্পতিরা পরস্পরের সুখের মর্ম বুঝিতে পারেন না।[৫৬]

আর-একটি লেখায় কৃষ্ণভাবিনী দাবি করেন যে, পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান। স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সুখী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে সমতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে।[৫৭]

অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ভদ্রলোকদের একটি ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন করে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে, তা বিপ্রতীপ দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত ১৮৩০-এর দশকের, রাসসুন্দরী দেবীর; অন্যটি ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকের, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। রাসসুন্দরী দেবী তখন কয়েকটি সন্তানের জননী। তাঁর শাশুড়ী আগেই পরলোকগমন করেছিলেন এবং শ্বশুর বাড়ির এমন কোনো আত্মীয় ছিলেন না, যাঁদের তাঁকে ভয় করে চলতে হতো। তা সত্ত্বেও তিনি এমন কথা ভাবতে পারতেন না যে, দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করা অথবা আলাপ করা যায়। স্বামী সম্পর্কে তিনি এতোই লাজুক ছিলেন যে, একদিন হঠাৎ স্বামীর ঘোড়া বাড়ির পেছনের আঙিনায় চলে এলে, তিনি তাড়াতাড়ি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন—পাছে ঘোড়াটি তাঁকে দেখে ফেলে। ঘোড়াটি তাঁর স্বামীর বলে তিনি একে সশ্রদ্ধ ভয়ের চোখে দেখতেন এবং তার দৃষ্টির সামনে পড়াকে অতীব লজ্জার বিষয় বলে মনে করতেন।[৫৮] তাঁর সমগ্র আত্মজীবনীতে তিনি মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশেই স্বামী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তা থেকে তাঁর পাঠক তাঁর স্বামী-যে মোটাসোটা এবং মামলাবাজ ছিলেন কেবল এটুকু জানতে পারেন।[৫৯]

অপরপক্ষে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর নিজের বয়স ১২ হওয়ার আগেই স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর প্রেমে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর স্বামী লণ্ডন এবং বোম্বাই থেকে তাঁকে যে-চিঠিপত্র লেখেন তা থেকে তাঁদের সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠতা সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুত, জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ক

৫৬. কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, পৃ. ১৮২-৮৪।
৫৭. কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', পৃ. ৬১১।
৫৮. রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পৃ. ৬৭-৭১।
৫৯. ঐ, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ১২৭-৩১।

ধারণা ছিলো পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধরনের। জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয় একটি ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারে এবং তিনি লালিত হন যশোহরের একটি অজপাড়াগাঁয়ে। অতএব এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর স্বামীই তাঁর মূল্যবোধ গড়ে তোলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি স্বামী সম্পর্কে যে-স্মৃতিচারণ করেন এবং যেভাবে এ স্মৃতি-চারণ করেন—উভয়ই প্রমাণ করে যে, স্বামীর সঙ্গে তাঁর এমন অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যা সেকালের আচারসর্বস্ব হিন্দু বিবাহের আওতার অনেক উর্ধ্বে ছিলো। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বোম্বাই বাস এবং দেশের বাইরের অভিজ্ঞতা উভয়ই আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাব প্রতিফলিত করে।[৬০] এক প্রজন্ম আগে, এমন কি ঠাকুর পরিবারেও, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রকৃতি ছিলো ভিন্ন ধরনের। জ্ঞানদার শাশুড়ী সারদা দেবী কোনো আত্মজীবনী রেখে যান নি। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তাঁর কন্যারা, পুত্ররা ও পুত্রবধূরা এবং আরো অনেকে যে-স্মৃতিচারণ করেছেন, তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজ সংস্কারে অতো উৎসাহী হলেও স্ত্রীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিলো নিতান্তই ঐতিহ্যিক এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সারদার সম্পর্ক ছিলো সংক্ষেপে সশ্রদ্ধ ভীতির। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধরনের পরিবর্তন ঘটে যা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

অবশ্য আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, নতুন মূল্যবোধ কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিকীর্ণ হচ্ছিলো। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তখনো স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কসহ পুরাতন মূল্যবোধকেই আঁকড়ে রেখেছিলো এবং তাকেই মহিমান্বিত করছিলো। শিক্ষিত মহিলাদের একটা বড়ো অংশও আত্ম-ত্যাগ ও সহনশীতাকেই মহিলাদের সব চেয়ে মহৎ দুটি গুণ বলে গণ্য করতেন।[৬১]

হেমাঙ্গিনী চৌধুরী যেমন তাঁর রচনাসমূহে মহিলাদের আত্ম সুখ বিসর্জন দিয়ে অন্যদের, বিশেষত স্বামীদের, সুখী করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> পতি রাগান্ধ হইয়া কটু কাটব্য বলিলে অথবা মর্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গল এবং পত্নীর কর্তব্য। পতির অবাধ্যতা প্রকাশ করা যারপর নাই গর্হিত কর্ম। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্যকে বলা উচিত নহে।[৬২]

৬০. দ্রঃ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, যত্রতত্র।

৬১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্যঃ হেমাঙ্গিনী চৌধুরী, 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য', অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯), পৃ. ৯০-৯২; গিরিবালা দেবী, 'সাধ্বী', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ (ভাদ্র ১৩০৮) পৃ. ১৭৪-৭৫; নগেন্দ্রবালা, 'প্রকৃত স্ত্রী', বামাবোধিনী, পৌষ ১৩০৪, পৃ. ৩২৩-২৬।

৬২. হেমাঙ্গিনী চৌধুরী, 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য', পৃ. ৯১।

আদর্শ স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত তার একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে গিরিবালা দেবী ১৯০১ সালে যা লেখেন, তা হেমাঙ্গিনী দেবীর তুলনায় অনেক রক্ষণশীল। তিনি লেখেন:

> চাহিয়া দেখ একটি গৃহে নিষ্ঠুর পতির অত্যাচার সরল পতিগতপ্রাণা যুবতী অম্লান বদনে নীরবে সহ্য করিতেছেন। ঐ দেখ ঘোর উচ্ছৃঙ্খল বেশে উন্মত্তভাবে সুরাপায়ী যুবক তাহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল, পতিপ্রাণা স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, পতিকে দেখিয়া ভক্তিভরে দাসীর ন্যায় তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, মুখে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে কিন্তু ঘৃণার লেশমাত্র নাই, অন্তর দারুণ যাতনায় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তাহাতে ক্রোধের ভাব নাই। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবর্জিত পশু অকারণে পত্নীর কোমল দেহে পদাঘাত করিল, পত্নী পতির চরণ স্পর্শ দেবতার আশীর্বাদ লাভ বলিয়া মনে করিলেন। মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত হইতেছে, পতির দোষ না দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার চরণ পূজা করিয়া নারীধর্মের অক্ষয়তা লাভ করিতেছেন।[৬৩]

এই একটি অনুচ্ছেদ থেকেই বোঝা যায়, বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেও মহিলাদের মধ্যে 'স্বামী পরম দেবতা' কিংবা 'স্বামী পরম গুরু' ইত্যাদি প্রবাদোক্ত মূল্যবোধ দৃঢ়মূল ছিলো। তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন যে, আত্মবিসর্জন করে স্বামীকে ভালোবাসতে এবং ভক্তি করতে হয়।

মহিলাদের পরিবর্তনশীল ব্যবহার ও কর্মভূমিকা

বিবাহ প্রতিষ্ঠান এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিকাদের মনোভাব পাল্টে যাচ্ছিলো বলে স্ত্রীর ব্যবহার-রীতি এবং তার কর্মভূমিকাও ক্রমশ প্রত্যাশিত ব্যবহার-রীতি ও কর্মভূমিকা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো। মানকুমারী বসু এর জন্যে সার্বিক সামাজিক পরিবর্তনকে নয়, বরং আধুনিকা স্ত্রীকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যায়নের ফলেই আধুনিকা স্ত্রী স্বার্থপর ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন:

> 'স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা। যে গৃহে ইহা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে গুরুজন আর ভক্তি পান না, স্বামী আর স্ত্রীর হাতের অন্ন পান না, শিশু আর মাতৃস্তন্য পায় না। প্রতিবাসী আর দুর্দিনে সাহায্য পান না। পাইবেন কেমনে? যাহারা আপনাকে লইয়া, আপনার সাজগোজ লইয়া ব্যস্ত, তাহারা কি পরের বিষয় ভাবিবার সময় পায়?'[৬৪]

৬৩. গিরিবালা দেবী, 'সাধ্বী', পৃ. ১৭৪-৭৫।

৬৪. মানকুমারী বসু, 'বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম', বামাপ, ফাল্গুন, ১২৯৬, পৃ. ৩৬০।

আমরা দেখেছি, একান্নবর্তী পরিবারে বধূর মর্যাদা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য এবং শাশুড়ীর ইচ্ছানুসারেই তাঁর সব কিছু করতে হতো। কিন্তু একান্নবর্তিতা হ্রাস পাওয়ায় এবং স্ত্রীর মর্যাদা খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়ায়, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের প্রতি, বিশেষত শাশুড়ীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সেকালের লোকেরা এর বিশেষ কড়া সমালোচনা করেন। রেবা রায় ১৮৯১ সালে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: শাশুড়ী বধূর পছন্দ নয় এমন কিছু করলে বা বললে শিক্ষিত বধূ শাশুড়ীকে তিরস্কার করতে ছাড়েন না।[৬৫] আর একজন মহিলা সমকালে যা লেখেন, তার মধ্যে দোষারোপের মাত্রা অধিকতর:

> আজি কালি যে সকল "লক্ষ্মীরূপা বধূমাতারা" গৃহে আসিতেছেন, তাহাতেই শ্বশ্রূকে অশ্রুজলে ভাসিতে ও সংসার জালে চতুর্গুণ জড়িত হইতে হইতেছে। আধুনিক প্রথানুসারে বধূমাতাদিগের "শরীর অসুস্থ", তাঁহারা "ছেলে মানুষ" কিংবা "তাঁদের কোলে কচি ছেলে", সুতরাং শাশুড়ীকেই গৃহকার্য স্বহস্তে নির্বাহ করিতে হয়। বৌমা সংসারের যত্ন বোঝেন না, তাই ছুচটী হারাইয়া গেলে, নুনটুকু পড়িয়া গেলে, কি হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া গেলে শাশুড়ীর সহ্য হয় না, তিনি প্রাণপণে সেই সকল গুছাইতে গুছাইতে নিজের ধর্মাচরণের কথা পর্যন্ত ভুলিয়া যান।[৬৬]

বধূ কোনো গৃহকর্মই করতেন না, সবটাই করতে হতো শাশুড়ীর—এটা বোধহয় তখনকার বাস্তব অবস্থার সঠিক বা সত্য বিবরণ নয়। তবে এ মন্তব্যে সামান্য সত্য থাকা অসম্ভব নয়, বিশেষত কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে যে-তিক্ততা ও ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যে দায়ী বোধহয় স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণে আকস্মিক পরিবর্তন। শরৎকুমারী চৌধুরানী অবশ্য মনে করেন যে, কন্যা ও পুত্রবধূকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার ফলেই এ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে, শাশুড়ীরা চিরকালই পুত্রবধূদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। সুতরাং নিজের কন্যার জন্যে প্রতিদিন রান্না করতে হলে তিনি কিছু মনে করেন না, কিন্তু পুত্রবধূর জন্যে দু-একবার রান্না করতে হলেও, তিনি হৈচৈ লাগিয়ে দেন। শরৎকুমারী যুক্তি দেখান যে, বিধবাদের অন্যের হাতে রান্না খাওয়া বারণ বলে শাশুড়ীকে সাধারণত নিজের জন্যে রান্না করতেই হয়। সুতরাং তিনি যদি আর-একটু কষ্ট

৬৫. রেবা রায় (কটক), 'মাতৃ ও শাশুড়ী ভক্তি', বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ১৫৮
৬৬. 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ১৬৫। আরো দ্রষ্টব্য: বামাপ, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ১২-১৩।

করে নিজের পুত্র ও নাতিনাতনীদের জন্যে দু-একটি পদ বেশি রান্না করেন, তাতে কোনো ক্ষতি হয় না।[৬৭]

সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, মধ্যবিত্ত পরিবারে বধূ নিজেই সাধারণত সকল গৃহকর্ম করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ বিশ্বাস বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো যে, বধূ গৃহকর্ম করার ব্যাপারে অনুৎসাহী এমন কি অনিচ্ছুক। কুলবালা দেবী বা সরলাবালা দাসীর মতো রক্ষণশীল মহিলারা মনে করেন যে, গৃহকর্ম এবং রন্ধনই মহিলাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।[৬৮] তাঁর সাহিত্যিক ভূমিকা সত্ত্বেও, মানকুমারী বসু দাবি করেন যে, বিবাহিত মহিলার গৃহকর্মই মুখ্য দায়িত্ব।[৬৯] অপরপক্ষে, গৃহকর্মে পুরোপুরি শরিক হলেও, আধুনিক স্ত্রীরা অবশ্য মনে করতেন না যে, গৃহকর্ম অথবা সন্তানের লালন-পালনই তাঁদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। খিদিরপুরের একজন মহিলা ১৮৮৫ সালেই এমন মত প্রকাশ করেন।[৭০] ছ'বছর পরে আর-একজন মহিলা লেখেন যে, গৃহকর্ম, গর্ভধারণ এবং সন্তান পালন মহিলাদেরই কাজ বটে, কিন্তু তাই বলে এগুলোই মহিলাদের একমাত্র অথবা সর্বপ্রধান কাজ নয়।[৭১] কৃষ্ণভাবিনী দাস এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক ধারণায় অনেক বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরাও প্রায় একই কথা বলেন। তাঁরা বলেন, গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তান লালন এবং সূচিকর্ম বিশেষ-ভাবে মহিলাদের কাজ; কিন্তু, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে, এ সব করাই মহিলাদের মুখ্য কাজ নয়।[৭২] মনে হয় বেশির ভাগ শিক্ষিত মহিলাই ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী ও জ্ঞানদানন্দিনীর মতো—ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী। তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে তাঁদেরকে অন্তঃ-পুরের চতুর্দেয়ালের বাইরে তাকাতে হবে এবং সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে; তবে বাঙালি মহিলাদের ঐতিহ্যিক ভূমিকাসমূহও তাঁরা অস্বীকার করতে পারছিলেন না। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী কাল বেশির ভাগ শিক্ষিত মহিলার আচরণই ছিলো এই আদর্শভুক্ত।

৬৭. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেয়ে', পৃ. ৩৯০।

৬৮. কুলবালা দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ৫৪; সরলাবালা দাসী, 'রমণীর জীবনব্রত', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ১৫-১৯; বিনোদিনী ঘোষ, বামাপ, পৌষ ১৩০৭, পৃ. ৩০২-০৩।

৬৯. মানকুমারী বসু, 'বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম', প. ৩২২।

৭০. 'নারীগণের অন্নশিক্ষা', বামাপ, মাঘ-ফাল্গুন ১২৯১, পৃ. ৩৬২।

৭১. 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থা', পৃ. ২৪২।

৭২. কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য', ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ২৪৭; জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', পৃ. ২৬৩-৭৩।

সুতরাং, বলা যেতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গৃহকর্মসহ মহিলাদের কর্মভূমিকা সম্পর্কে যে-নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, তা পুরোপুরি ঐতিহ্যিক ছিলো না, অথবা পুরোপুরি আধুনিকও হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অবস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-নিরীক্ষক এই মূল্যবোধকে হয় ভালো, নয় মন্দ বলে গণ্য করেন। বামাবোধিনী পত্রিকা যেমন, গৃহকর্মের ওপর শিক্ষিত মহিলাদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার প্রতি তার অনুমোদনের অভাবের কথা বারবার ঘোষণা করে। শিশুকে স্তন্য পান করাতে আধুনিকাদের অনাগ্রহ বামাবোধিনীর কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এই মহিলাদের কেউ কেউ নাকি স্তন্যপান করানোকে অপমানজনক ও ভিখিরিসুলভ কাজ বলে মনে করতেন।[৭৩] প্রসঙ্গত এ কথা মনে রাখা যেতে পারে যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতো অভিজাত পরিবারে শিশুকে স্তন্য পান করানোর রীতি ছিলো না। সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের মতোই সরলা দেবীসহ কোনো সন্তানকেই স্তন্যপান করান নি। এ সব পরিবারে স্তন্যপান করানোর জন্য স্তন্যদাত্রী ধাত্রী নিয়োগ করা হতো।[৭৪] প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা কুন্দমালা দেবী মোটামুটি রক্ষণশীল পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন। নিজে শিক্ষিত হলেও, তিনি সেকালের শিক্ষিত মহিলাদের পরিবর্তনশীল কর্মভূমিকাকে একান্ত অবাঞ্ছিত এবং ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, শিক্ষিত মহিলারা কিছু গৃহকর্ম করেন বটে, কিন্তু তা করেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং দারুণ ঘৃণার সঙ্গে।[৭৫] যশোহরের কুমুদিনী রায় দাবি করেন যে, স্বল্প বেতনের (মাসিক ২০ টাকা) একজন কেরানির স্ত্রীও রাঁধুনির সহায়তা ছাড়া সকল গৃহকর্ম সম্পন্ন করতে পারেন না। একে তিনি শিক্ষিত মহিলার অমার্জনীয় অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেন।[৭৬] অপরপক্ষে, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শরৎকুমারী চৌধুরানী এমন পরিবারের সদস্য ছিলেন যেখানে অনেকগুলো ভৃত্য কাজ করতো। সুতরাং এঁরা ভৃত্য নিয়োগ করাব ব্যাপারে কোনো দোষ খুঁজে পান নি। বরং শরৎকুমারী ভৃত্য নিয়োগের পক্ষেই ওকালতি করেন। তিনি বলেন, গৃহকর্মের ধরণই অনেকটা পাল্টে

৭৩. 'সন্তান রক্ষা', বামাপ, মাঘ ১৮৭১, পৃ. ১৮৬-৮৮; 'শিশুদের আহার', বামাপ, বৈশাখ ১২৭৩, পৃ. ২৪৭-৪৮।

৭৪. সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ১।

৭৫. কুন্দমালা দেবী, 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?' বামাপ, আশ্বিন ১২৭৭, পৃ. ১৭৬-৭৮।

৭৬. কুমুদিনী রায়, 'হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম', বামাপ, কার্ত্তিক ১৩০১, পৃ. ২২৪।

গেছে। এখন বেলা দশটার মধ্যেই স্বামী কাজে ও সন্তানরা বিদ্যালয়ে গমন করেন। সুতরাং তার আগেই তাঁদের আহার প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আগের যুগের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা খেতেন সাধারণত অপরাহ্নে। সুতরাং, তাঁর যুক্তি অনুসারে, শহরের একক ও বর্ধিত পরিবার রাঁধুনির সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না।[৭৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী লক্ষ্য করেন যে, আধুনিক স্ত্রী কেবল রাঁধুনি বা ভৃত্য নিয়েই ভাবিত নন, তিনি এমন কতোগুলো অভাব সম্পর্কেও সচেতন যার কথা আগের দিনের বধূরা ভাবতেন না বা জানতেন না। যেমন, প্রসাধনী, ফ্যাশন-দুরস্ত কাপড়চোপড় এবং অলঙ্কারের প্রতি আধুনিক স্ত্রীর চাহিদা বেড়েছে। আরো মজার ব্যাপার, আধুনিকারা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চান।[৭৮] কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, তিনি আধুনিকাদের নিন্দা করেন নি, বরং মনে হয়, পরোক্ষভাবে তাঁদের সমর্থনই করেন।

মহিলাসহ প্রাচীনপন্থীরা আধুনিকাদের প্রসাধনীর চাহিদাকেই সবচেয়ে কঠোর নিন্দা করেন। বাঙালি মহিলারা নিশ্চয় বহু শতাব্দী ধরেই প্রসাধনী ব্যবহার করতেন ; সুতরাং এটা বোঝা শক্ত যে, প্রাচীনপন্থীরা প্রসাধনী ব্যবহারের প্রতি কেন এতো কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। আলোচ্যকালের প্রসাধনীসমূহ পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা এবং মহার্ঘ্য বলেই কি না, ঠিক বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐতিহ্যিক মহিলারা প্রসাধনী ব্যবহারের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্যামা-সুন্দরী নামক একজন পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা দাবি করেন যে, স্বামীর প্রসাধনী ও য়োরোপীয় পোশাক কেনার সঙ্গতি থাকলে আধুনিকা "কালো মেমসাহেব" সাজতে চান। আধুনিকাদের তিনি এ কারণে স্বামীর রক্ত-চোষা বলে আখ্যায়িত করেন।[৭৯] মানকুমারী বসুও এমন কথা লিখেছেন যে, নিম্নবিত্ত মহিলাদেরও সুগন্ধী, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন ইত্যাদি না-হলে চলে না।[৮০] ব্রাহ্মমহিলারাই ছিলেন পাশ্চাত্যের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রসাধনীর চাহিদা তাঁদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী ছিলো।[৮১] আর-একটি রচনায়

৭৭. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেয়ে, পৃ. ৩৯০-৯১, ৩৯৩।

৭৮. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'সখী সমিতি', পৃ. ৫০৫।

৭৯. শ্যামা সুন্দরী (বন্দ্যোপাধ্যায়), 'সতিত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ', বামাপ, আশ্বিন ১২৮১, পৃ. ১৪১।

৮০. মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারত...', পৃ. ১৩৯।

৮১. 'বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার পরিচ্ছদ', বামাপ, কার্তিক ১৩০৮, পৃ. ২৪১।

বলা হয়েছে যে, আধুনিক স্বামীকে অলঙ্কারের জন্যেও আগের তুলনায় বেশি ব্যয় করতে হয়।[৮২] বস্তুত, নিম্নমধ্যবিত্ত স্বামীর ওপর এ সময়ে যতোটা অর্থনৈতিক চাপ পড়ে, তেমন বোধহয় আগে কখনো পড়ে নি।[৮৩] আধুনিকাদের নতুন নতুন চাহিদাকে নয়, শরৎকুমারী চৌধুরানী এর জন্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকেই দায়ী করেন।[৮৪]

প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে অসংখ্য প্রবন্ধ, প্রহসন, উপন্যাস ও কবিতার মাধ্যমে আন্তরিক ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করলেও, আধুনিকারা প্রায় সকলের আগোচরেই নতুন মূল্যবোধকে স্বাগত জানান। গবেষণাকালে আমি কেবল একজন মহিলা---শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাই পেয়েছি, যিনি সরাসরি আধুনিকাদের সমর্থন করেন এবং মহিলাদের কর্মভূমিকা সম্পর্কে আধুনিকাদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের ন্যায্যতা প্রমাণ করেন। তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দেখান যে, পুরুষদের জীবনধারা পাল্টে গেলে মহিলাদের জীবনধারাও পাল্টে যেতে বাধ্য। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভদ্রলোকদের স্বীকৃত জীবনধারা থেকে শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জীবনধারা যথেষ্ট সরে এসেছিলো। তিনি বলেন যে, পুরোনো ভূমিকার অতিরিক্ত এবং/অথবা পুরোনো ভূমিকার পরিবর্তে মহিলাদের নতুন নতুন ভূমিকা পালন করতে বলা হচ্ছে। শহরের পরিবারে ভৃত্য নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন এবং একক পরিবারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কথাও মেনে নেন। তাঁর মতে, আগের যুগের মহিলারা তাঁদের সময় কাটাতেন গল্পগুজব ও পরনিন্দা করে; আর নতুন যুগের স্ত্রীরা সময় কাটান উপন্যাস পড়ে এবং কার্পেটের ওপর সূচিকর্ম করে। তাঁর মতে পূর্বের তুলনায় আধুনিকারা অনেকটা আত্মসচেতন এবং সম্ভবত গর্বিত। তাঁর নিজের দুঃখ ও অর্থ কষ্ট নিয়ে তিনি অন্যের সঙ্গে আলোচনা করেন না। এমন কি, তিনি তাঁর স্বামী এবং সন্তানদের সম্পর্কেও অন্যের কাছে কোনো নিন্দা করেন না। শরৎকুমারী আরো লক্ষ্য করেন যে, নব্য মহিলা তাঁর ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে এবং পরিষ্কার করে রাখতে চান এবং নিজের একক পরিবারের সদস্যদের ও অতিথি-দের পরিচর্যা করার দক্ষতাও তাঁর বেশি। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, আধুনিক স্ত্রীর রুচি আগের যুগের মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি মার্জিত এবং তাঁর মতে, এটাই আধুনিক স্বামী তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। তিনি তুলনা

৮২. 'পুনর্বিবাহ বিষয়ক কথোপকথন', বামাপ, পৃ. ১৩৬।
৮৩. 'নব্য বঙ্গ মহিলা', বামাপ, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ১৮০।
৮৪. শরৎকুমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেয়ে', পৃ. ৩৯৬।

করে বলেন, সেকালের মহিলারা শাড়ি দিয়েই তোয়ালের কাজ সারতেন, ফলে তাঁদের শাড়িতে চুন, কালি এবং হলুদের দাগ সর্বত্র লেগে থাকতো। অলঙ্কার, বস্ত্র পরে সেজেগুঁজে এলেও তাঁদের দেখতে খুব খারাপ লাগতো। অপরপক্ষে, নব্য মহিলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আচার-আচরণে ফ্যাশন দুরস্ত। তিনি এভাবে উপসংহার টানেন:

> আমাদের নব্য সম্প্রদায় ইংরাজী সম্প্রদায় দেখিয়া মুগ্ধ। তাঁহারা যথাসাধ্য সেইরূপ ধরণ ধারণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না-হইতে পারিয়া বোধ হয় মহিলাদিগকে সকুল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। ···আমাদের বাঙ্গালী যুবকদের রুচি রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনুসারেই একালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তা পেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় চওড়া সিন্দুর, কপালে বৃহৎ সিন্দুর টিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দুগাছা মল—ঝোটন করিয়া খোঁপা বাঁধা স্ত্রীর সহিত, বোধ করি একালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক ঘরে ঢুকিতে দিবেন না।[৮৫]

যদিও আধুনিক স্ত্রীর পক্ষে কেবল শরৎকুমারী একাই সরাসরি এ ধরনের যুক্তি সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন; তবু মনে হয় তাঁর দাবির মধ্যে সত্যতা ছিলো। কয়েক বছর পরে একজন ঐতিহ্যিক মহিলাও শরৎকুমারীর কোনো কোনো যুক্তি স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, পুরুষপ্রধান বাঙালি সমাজে মহিলাদের জীবন চিরকালই পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পুরুষরা যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন, মহিলারাও তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন; পুরুষরা যখন পরিশ্রমী ছিলেন, মহিলারাও তখন পরিশ্রমবিমুখ ছিলেন না। কিন্তু স্বামীদের মনোভাব বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধাচারণ করতে এবং গৃহকর্মে অবহেলা দেখাতে শুরু করেন। মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যে তিনি শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নব্য যুবকদেরই পুরোপুরি দায়ী করেন। তিনি এভাবে প্রশ্ন করেন: 'আজিকার এই বিদেশী জ্ঞানালোক প্রাপ্ত, রুচিমান, অলস, আশু সুখ পরায়ণ, চাকুরি অনুসন্ধিৎসু, বায়রণ-জয়দেব আবৃত্তিকারী, সুকুমার যুবকগণের গৃহে, গোময়লেপনকারী, বর্ণজ্ঞান শূন্য, কুসংস্কারপরায়ণা, কলহপ্রিয়া রমনীদিগের আবির্ভাব হইলে তাহারা কি প্রকৃত সুখী হইতে পারেন?'[৮৬]
তিনি প্রাচীনপন্থী মহিলাদের পোশাক, সাজসজ্জা এবং আচার-ব্যবহারের বর্ণনা দিয়ে

৮৫. ঐ, পৃ. ৩৮৯-৯১, ৩৯৩, ৫৬৬ (মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায়)।
৮৬. ম—, 'নব্য বঙ্গ মহিলা', বামাপ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১০, পৃ. ১৭৯-৮২।

বলেন যে, উচ্চ শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত যুবকদের পাশে স্ত্রী হিশেবে তাঁদের একান্তই অসমঞ্জস ও অদ্ভুত বলে মনে হবে।[৮৭]

আধুনিক স্ত্রীর পরিবর্তিত ভূমিকা ও জীবনধারার প্রতি মনোভাব

গত শতাব্দীর শেষ চার দশকে শিক্ষিত ও তথা-কথিত আধুনিক মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো; সেজন্যেই তাঁদের মনে করা হতো অ-সাধারণ বলে। এই মহিলারা তাঁদের ব্যতিক্রমধর্মী জীবন ধারা এবং সামাজিক আচারের প্রতি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে একটি নতুন গোষ্ঠী হিশেবে পরিচিত হন। তখনো পর্যন্ত এরূপ একটি অভিনব গোষ্ঠী বঙ্গদেশে অজ্ঞাত ছিলো। ব্লাউজ, পেটিকোট ও জুতো সমাহারে সজ্জিত তাঁদের "সংস্কৃত" পোশাক পরিধান, গৃহকর্মের জন্যে ভৃত্যের ওপর নির্ভরশীলতা, শিশুকে স্তন্যদান বর্জন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করণ এবং পর্দাপ্রথার মতো সামাজিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করাকে আধুনিকতা অভিহিত করা সঙ্গত কি না জানিনে, কিন্তু সে সময়ে এগুলোকে পাশ্চাত্যায়ন বলে মনে করা হতো। **বামাবোধিনী** পত্রিকা ছিলো ব্রাহ্মসমাজের "প্রগতিশীল" অংশের প্রতিনিধি এবং এ পত্রিকাকেও যথেষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৬৭ সালে এই পত্রিকায় সমালোচনা করা হয় যে, মহিলারা অতিরিক্ত পাশ্চাত্য অনুসরণ করছেন। অথচ তখনো পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিকতার বিকাশ সামান্যই হয়েছিলো। সন্দেহ হয়, তখন বঙ্গদেশে এক ডজন মহিলাও ছিলেন কি না যাঁদের যথার্থভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলা যেতো। **বামা-বোধিনী**-তে লেখা হয় যে, মেম সাহেবরা হলেন শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের আদর্শ এবং এঁরা পাশ্চাত্যায়ন ও প্রগতিকে সমার্থক মনে করেন।[৮৮] চার বছর পরে এ পত্রিকায় আবার এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, বাঙালি সমাজে সম্ভবত ১৮৩০-এর দশকের ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মতো একটি চরম পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মহিলাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে।[৮৯]

মহিলাদের প্রতি অবিচার করার জন্যে ইয়ংবেঙ্গলরা যদি প্রাচীন শাস্ত্রকার ও রক্ষণশীল হিন্দুদের স্বার্থপর ও ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করে থাকেন,[৮৯] তা হলে একই বিশেষণ শতাব্দীর শেষ ভাগের আপাত-উদার সংস্কারকদের প্রতিও প্রযোজ্য। এই সমাজসংস্কারকগণ যদি-বা পুরুষদের পাশ্চাত্যায়ন, সম্ভবত তার ইহলৌকিক

৮৭. 'প্রিয় প্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন', বামাপ, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৩৬।
৮৮. স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৩৩-৩৫।
৮৯. পূর্বে, দ্রষ্টব্য।

সুযোগ-সুবিধার জন্যেই, সমর্থন করতেন। কিন্তু তাঁরা এটা কখনোই চাইতেন না যে, মহিলারা পাশ্চাত্য জীবনধারা ও আদর্শ অনুসরণ করুন; কারণ তাঁরা মহিলাদের পুরোপুরি ঐতিহ্যিক হিশেবেই দেখতে চাইতেন। অবশ্য তাঁরা খানিকটা শিক্ষা দান করে এবং অবরোধ মোচন করে মহিলাদের আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে চান, যাতে তারা নিজেদের স্বার্থেই মহিলাদের অধিকতর কাজে লাগাতে পারেন। বস্তুত পুরুষ ও নারীর জন্যে তাঁদের দুটি ভিন্ন মানদণ্ড ছিলো। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধ-আন্তরিক সমাজসংস্কার প্রায়সের মধ্যেই এই রক্ষণশীলতা নিহিত ছিলো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো পরিবর্তন না-করেই অথবা ন্যূনতম পরিবর্তন করেই এই সংস্কারআন্দোলন সমাজকে সময়ের দিক দিয়ে আধুনিক করতে চেয়েছিলো।

প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, অ্যানেট অ্যাক্রএড ১৮৭৩ সালে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় নামে মেয়েদের একটি বোর্ডিং স্কুল খুলেছিলেন। বাঙালী মেয়েদের "উচ্চশিক্ষা" দান করাই ছিলো এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।[৯০] বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হওয়ার আগেই বামাবোধিনী পত্রিকা এই বলে আর-এক দফা আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা খুব সম্ভব পাশ্চাত্য পোশাক ও জুতো পরবে এবং ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাবে। পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে বলা হয়, এর ফলে কিছু কালো মেমসাহেব তৈরী হবে মাত্র।[৯১] অ্যানেট অ্যাক্রএডের ছাত্রী-নিবাসে ছুরি-কাঁটা প্রবর্তনের "আশঙ্কা" সত্যে পরিণত হয়েছিলো। যদিও ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়ায় ছাত্রীদের নারীসুলভ গুণাবলী বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি; তবু যে সব অভিভাবক তাঁদের কন্যাদের আদৌ এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নি, তাঁরাও এর তীব্র সমালোচনা করেন।[৯২] ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়াকেই যাঁরা অন্যায় মনে করতেন, গোমাংস বা শূকর-মাংসের মতো নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রতি তাঁদের মনোভাব সহজেই অনুমান করা যায়। তথাকথিত আধুনিকারা এ সব নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন অথবা মদ্য পান করতেন এমন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তবু বামাবোধিনী পত্রিকা একটি ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় এই কল্পিত মহিলাদের এবং যে-পুরুষরা এ সব খাদ্য ও পানীয় মহিলাদের মধ্যে প্রবর্তনের চেষ্টা করছিলেন বলে মনে করা হচ্ছিলো, তাঁদের নিন্দা করে।[৯৩] বস্তুত, বামাবোধিনী-র এ লড়াই ছিলো এমন সব শত্রুর বিরুদ্ধে যাঁদের তখনো জন্মই হয় নি।

৯০. পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৯১. 'মিস অ্যাক্রএড', বামাপ, মাঘ ১২৭৯, পৃ. ৩২৫।
৯২. P. Barr, The Memsahibs, P. 164.
৯৩. 'বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি' বামাপ, কার্তিক ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬।

১৮৭০-এর দশক থেকে শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পরে, তাঁরা পাশ্চাত্যায়নের, বিশেষত মহিলাদের পাশ্চাত্যায়নের অধিকতর সমালোচনা করেন। এমন কি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো যথেষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাবিত মহিলাও নির্বিচারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করাকে সমালোচনা করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই বঙ্গদেশে প্রথম জন্মদিন উদ্‌যাপন করার রীতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি এই বলে নব্য শিক্ষিতদের সমালোচনা করেন যে, এঁরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা জামাইষষ্ঠীর মতো দেশীয় উৎসব পালন না-করে, পাশ্চাত্য কায়দায় জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন, ইংরেজি নববর্ষে অভিনন্দন পাঠান এবং পয়লা এপ্রিল বন্ধুদের 'এপ্রিল ফুল' করেন। তিনি আরো বলেন যে, এঁরা খৃস্টান না-হলেও, ক্রিস্টমাস-কেক কিনে বন্ধুদের সঙ্গে খান, অথচ কোজাগরি পূর্ণিমায় বাঙালিদের মধ্যে নারকেল-কোরা ও চিঁড়ে খাওয়ার রীতি আছে, তাকে অবজ্ঞা করেন।[৯৪] মানকুমারী বসু দাবি করেন যে, পাশ্চাত্যায়ন মহিলাদের জন্যে ক্ষতিকারক এবং এর ফলে তাঁদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে না।[৯৫]

তুলনামূলকভাবে ঐতিহ্যিক এবং/অথবা জাতীয়তাবাদী মহিলাদের এ ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ সত্ত্বেও, এমন মনে করার কারণ নেই যে, সেকালের শিক্ষিত মহিলারা যথেষ্ট পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের মার্জিত এবং নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের পোশাক, প্রসাধনী ব্যবহার এবং প্রথা-বিরুদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের জন্যেই তাঁদেরকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়।—তবে এ সব আদৌ পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা হয়েছিলো কি না, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলারা প্রতিমাপূজা করতে অস্বীকার করেন। এর মধ্যে পাশ্চাত্য কিছু ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে পাশ্চাত্যায়নের স্বাক্ষর বলে গণ্য করা হয়।[৯৬] এই মহিলারা অনেকে নামের শেষে 'দেবী' ও 'দাসী' লেখার প্রাচীন রীতি ত্যাগ করে স্বামীর পদবী লিখতে আরম্ভ করেন। এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন রাসবিহারী বসু—১৮৬০-এর দশকে। তিনি তাঁর স্ত্রীর নামের শেষে 'দাসী' না-লিখে, 'বসু' লেখেন।[৯৭] পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ

৯৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার', পৃ. ১৩১-৩৫।

৯৫. 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থা', পৃ. ২১৫, ২৭৯-৮০।

৯৬. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য: রমাসুন্দরী, 'কাশী-দর্শন', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭০, পৃ. ৮৮; 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা...', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃ. ৭৩; সৌদামিনী রায়, বামাপ, পৌষ ১২৭২, পৃ. ১৮০; সারদা দেবী, 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের...,' পৃ. ৩৮৪।

৯৭. **Brahmo Public Opinion**, Vol I, No. 43 (Jan. 23, 1879).

ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত মহিলারা ব্যাপকভাবে এই রীতি অনুসরণ করেন। গত শতাব্দীর শেষ দু-তিন দশকে ব্রাহ্ম মহিলারা নামের শেষে পদবী লেখা ছাড়াও নামের আগে 'কুমারী' এবং 'শ্রীমতী' লিখতে শুরু করেন। অন্য মহিলাদের থেকে এর দ্বারাও অনেক সময়ে ব্রাহ্ম মহিলাদের সনাক্ত করা সম্ভব হতো। আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত মহিলারা অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন; কারণ তাঁরা 'দেবী' লেখাই বজায় রাখেন।[৯৮] নামের শেষে বংশ নাম এবং নামের আগে 'কুমারী' ইত্যাদি পদবী লেখার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অন্তত এর ফলে মহিলাদের স্ত্রীসুলভ গুণাবলী হ্রাস পেতো না কিন্তু তবু একেও পাশ্চাত্যায়ন বলে চিহ্নিত করে এর নিন্দা করা হয়।[৯৯] নামের সঙ্গে বংশ-নাম ও পদবী লেখা উচিত কি না এ নিয়ে রীতিমতো একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে এ বিতর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়।[১০০]

দুর্গামোহন দাসের পরিবারের মতো কোনো কোনো পরিবারে স্ত্রী ও সন্তানদের ইংরেজিতে কথা বলা শেখানো হয়। এটাও অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয়।[১০১]

সব কিছু মিলে আধুনিকারা রক্ষণশীলদের চোখে 'অদ্ভুত' বলে গণ্য হন। আধুনিকাদের প্রতি তাঁদের খানিকটা বিদ্বিষ্ট মনোভাবের জন্যে, খানিকটা তাঁদের হীনমন্যতার জন্যে অশিক্ষিত মহিলারা সযত্নে তাঁদের নিজেদেরকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত মহিলাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।[১০২] তা ছাড়া, আধুনিকাদের স্ত্রীসুলভ গুণাবলী বর্জিত বলেও মনে করা হতো।[১০৩] কেউ কেউ তাদের "পুরুষালি" বলে আখ্যায়িত করে তাঁদের নিন্দা করেন।[১০৪] সরলাদেবী তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন যে, দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা

৯৮. বংশনাম ব্যবহার করার প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা প্রায় বিদ্বিষ্ট ছিলেন। একটি কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত থেকে এটা বোঝা যায়। ১৯১০ সালে **ভারতী** পত্রিকায় কামিনী রায়ের ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই প্রবন্ধে কামিনী রায়ের নাম কামিনী দেবী বলে উল্লিখিত হয়, অথচ কামিনী কখনোই বংশ-নাম ছাড়া তাঁর নাম লিখতেন না। দ্রষ্টব্য: 'আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী', **ভারতী** জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ১৬৩।

৯৯. **সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়**, দুই খণ্ড (কলকাতা: বাল্মীকি প্রেস, ১৮৭৬-৭৭), পৃ. ৯৬ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

১০০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার', পৃ. ১৩২-৩৩; অজ্ঞাত, 'সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার' **ভারতী**; ভাদ্র ১২৯০, পৃ. ২১০-১৬।

১০১. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা**, পৃ. ৮৩।

১০২. —দেবী, 'একটি প্রস্তাব', **ভারতী**, বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ১৯।

১০৩. 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের...', পৃ. ২১৫; 'স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি', পৃ. ৭২।

১০৪. ঐ।

রায় পুরুষবন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে কখনো কখনো টেনিস খেলতেন।[১০৫] সরলা দেবী ছিলেন সরলা রায়ের ও সরলা রায়ের কনিষ্ঠ ভগ্নী শৈলর ঘনিষ্ঠ। অসম্ভব নয় যে, সে কারণেই তিনি সরলা রায়ের টেনিস খেলার সমালোচনা করেন নি। কিন্তু সরলা দেবীসহ ঠাকুর পরিবারের কোনো মহিলাই কখনো টেনিস খেলেন নি। অত্যন্ত অসাধারণ মনে হয়েছিলো বলেই, তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রকৃত-পক্ষে, আধুনিকাদের আচরণ এবং পরিবর্তিত ভূমিকা বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলার নিকট এতো প্রথাবিরুদ্ধ বলে মনে হয় যে, তাঁরা দীর্ঘকাল এসব মেনে নিতে অথবা এ ধরনের মহিলাদের গ্রহণ করতে পারেন নি। ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা এতোই তীব্র ছিলো যে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্রাজুয়েট' তখনকার একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় এরূপ মন্তব্য করেন যে, শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে বাস করার চেয়ে নরকে বাস করা অনেক শ্রেয়।[১০৬]

মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদার সীমিত পরিবর্তন

পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, একান্নবর্তী প্রথা ক্রমশ একক এবং/অথবা বর্ধিত পরিবারের নিকট জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিলো এবং পরিবারে মহিলাদের অবস্থানের ওপর এর একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব অবশ্যই পড়ছিলো। তা ছাড়া, সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলেও স্ত্রীর ভূমিকা অংশত পরিবর্তিত হয়েছিলো। তদুপরি, স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর আচার-আচরণের আদর্শেও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমনকি সম্ভবত বহু শতাব্দী ধরেই, বধূর যে ভাবমূর্তিটি নির্মিত হয়েছিলো, তা বদলে যায়। বধূর আশা-আকাঙ্খা, মূল্যবোধ এবং নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণাও যথেষ্ট মাত্রায় বিবর্তিত হয়। শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিবারের এই-যে বিবর্তন তা ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজের বৃহত্তর একটি অংশকে প্রভাবিত করে এবং প্রায় নিঃশব্দে ও সকলের অলক্ষ্যে মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা পুনর্নির্ধারিত হয়।

অবশ্য পূর্বোক্ত প্রায় সকল পরিবর্তনই ছিলো আংশিক, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এ সব পরিবর্তন ক্ষুদ্র একটি পরিধির মধ্যে, এমন কি হয়তো কয়েকটি পরিবারের মধ্যে, সীমাবদ্ধ থাকে। এই পরিবর্তন-যে কতোখানি সীমিত

১০৫. সরলা দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ৮৬।

১০৬. 'Contributed by a graduate of the Calcutta University (চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়), 'বিদ্যা বিড়ম্বনা', জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮০, পৃ. ১৯০।

ছিলো তার একটি নজির এই যে, পরিবারে নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান সম্বন্ধে ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধীনতা বিষয়ে বহু শিক্ষিত মহিলা সচেতন হলেও, তাঁরা আন্তরিকভাবে পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমতার দাবি করেন নি অথবা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর হীনতাও অস্বীকার করেন নি। বধূ কতোটা গৃহকর্ম করবে, বধূর ওপর শাশুড়ীর শাসন কতোটা থাকা বাঞ্ছনীয়, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বধূর কতোটা প্রভাব বর্তমান—এ সব প্রশ্ন বারবার উত্থাপিত হলেও, বধূর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হয় নি। তদুপরি আধুনিকারা পূর্বের তুলনায় অধিকতর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করলেও, তাঁরা মূলত তাঁদের গার্হস্থ্য ভূমিকায় অবিচল থাকেন। যেহেতু দেশাচার ছিলো সকল বড়ো রকমের পরিবর্তনের প্রতিকূল, সে কারণে নব্য মহিলাকে ঐতিহ্যিক ও আধুনিক এই দুই-এর মাঝামাঝি একটি জীবনধারা বেছে নিতে হয়েছিলো।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভুর পদাঙ্কানুসরণ: সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় পুনর্জাগরণকে রেনেইসান্স বলে আখ্যায়িত করা যাক অথবা না-ই যাক, এই জাগরণের ফলে এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাঙালির অনেকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সেক্যুলার মানবতার মূল্যমানে খানিকটা আধুনিক হয়ে ওঠে। এ সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে-উন্নতি হয় তা হয় প্রায় সকলের অগোচরে এবং সে উন্নতির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরপক্ষে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণের প্রয়াস বহু উচ্চকণ্ঠ বিতর্কের জন্ম দেয় এবং সামান্যই সাফল্য অর্জন করে। অবশ্য সাফল্যের মাত্রা যতো কমই হোক না কেন, এই জাগরণ ছিলো সেকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এর ফলেই বঙ্গদেশ মধ্যযুগীয়তা থেকে বেরিয়ে আসে। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা ইংলণ্ড যদি বঙ্গদেশের কিংবদন্তীমূলক ধন-সম্পদ হরণ করে থাকে, বিনিময়ে সে বঙ্গদেশকে দিয়েছিলো তার উদার শিক্ষা এবং চিন্তাধারা, এবং তার ফলেই বঙ্গীয়সমাজ আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়।

যে-পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে বাঙালি পুরুষরা স্ত্রীদের শিক্ষা দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, সেই পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই কতোগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করার জন্যে তাঁদের সচেতন করে। বাঙালি ভদ্রলোকেরা সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু করার প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখরা, পশ্চিম ভারতে মারাঠিরা এবং উত্তর ভারতে মুসলমানরা তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ আন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু এ সব সম্প্রদায়ের আন্দোলন এবং ভদ্রলোকদের আন্দোলনের প্রকৃতি ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। শিখ, মারাঠা ও মুসলমানদের আন্দোলন ছিলো মূলত ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন। তাঁদের মতে তাঁদের স্ব স্ব ধর্মে শাস্ত্রবহির্ভূত যে সব অর্বাচীন আচার-আচরণ অনুপ্রবেশ করেছিলো, তাঁরা সে সব উন্মূলিত করে তাঁদের ধর্মকে প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, তাঁরা ধর্মকর্মে লোকেদের অধিকতর আগ্রহী করে তুলতে চান। সুতরাং তাঁদের আন্দোলনকে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন না-বলে ধর্মীয় পুর্নজাগরণ বলাই সঙ্গত। বঙ্গদেশীয়

ভদ্রলোকরা অপরপক্ষে তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পাশ্চাত্য থেকে আনীত ধারণার আলোকে আধুনিক করে তোলার প্রয়াস পান। আদৌ চাইলেও, তাঁরা ধর্মীয় পুনর্জাগরণে তেমন আগ্রহী ছিলেন না।

বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—রামমোহন যখন থেকে উপনিষদসহ বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রের সযত্নে নির্বাচিত অংশসমূহ অনুবাদ করে এবং অভিনব ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন।[১] প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের নতুন ব্যাখ্যা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার করার ধারণা রামমোহন য়োরোপীয় রেনেইসাঁসের আন্দোলন থেকে পেয়েছিলেন কি না নিশ্চিত বলা শক্ত; তবে তিনি যে উপনিষদের যুগে ফিরে যেতে চান নি বরং সামনের দিকেই অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রয়োজনবোধে তিনি ইসলাম ও খৃস্টান ধর্ম থেকেও ধারণাসমূহ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।[২] তিনি ধর্মীয় বিতর্কমূলক যে গ্রন্থাদি এক দশক ধরে প্রকাশ করেন, তা দিয়ে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ প্রাচীন শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত ছিলো না। তা ছাড়া, বালবিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য পালন এবং কুলীন বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন।[৩] বাঙালি মহিলাদের দুর্দশার কথাও-যে তিনিই প্রথম তুলে ধরেন, সে কথা প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে।[৪]

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঐতিহ্যিক হিন্দুদের নেতা। এঁরা রামমোহন রায়ের মতো উদার নীতিতে এবং

১. তাঁর অনুবাদগ্রন্থগুলির প্রথমটি **বেদান্তসার** ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ সাল নাগাদ তিনি উপনিষদের আরো ছ খানা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত তিনখানা গ্রন্থসহ তিনি আরো বেশ কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

২. তিনি কিভাবে যত্নের সঙ্গে ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন করেন এবং তাদের নতুন ব্যাখ্যা দান করেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : S. N. Hay, 'Western and Indigenous Elements in Modern Indian Thought: The Case of Rammohan Roy', in M. B. Jansen (ed.), **Changing Japanese Attitudes Towards Modernization** (Princeton: Princeton University Press, 1965).

৩. ১৮ মে ১৮১৯ তারিখে **Calcutta Journal**-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ দ্রষ্টব্য। সংবাদটি সত্যজিৎ দাস সম্পাদিত **Selections from Indian Journals**, Vol. I (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়—পৃ. ১৫৯; আরো দ্রষ্টব্য: **রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি**, পৃ. ২০৬-০৭।

৪. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

"প্রগতিশীল" ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না বটে, তবু তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এমন কিছু আচার-অনুশাসন আছে যা পালন করা শক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এঁরা কেউই তাঁদের পরিবারে সতীদাহ প্রথা মেনে নেন নি। তবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন বলে তাঁরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি যে, ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সহায়তায় সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় কি না। ১৮২৯ সালে সতীদাহবিরোধী আইন প্রণীত হওয়ার পর, সমাজ-সংস্কারের প্রতি, বিশেষত, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্কারের প্রতি, তাঁদের মনোভাব প্রতিকূল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে তাঁরা এতোই রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন যে, সমাজসংস্কারের কোনো উদার আন্দোলনকে তাঁরা আর সমর্থন করতে পারেন নি। বোধগম্য কারণেই তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং এভাবে অংশত ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোশ করেন; কিন্তু প্রাচীন আচার-আচরণ ও রীতিনীতি যদ্দুর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখাব প্রয়াস পান। রামমোহন রায় এবং উদার নীতিতে বিশ্বাসী পরবর্তীদের মধ্যে যে-পার্থক্য তা যতোটা মাত্রাগত ততোটা প্রকৃতিগত ছিলো না। প্রশ্নটি ছিলো : তাঁরা পাশ্চাত্য থেকে কতোটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৪০-এর দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের কায়দায় সংস্কার শুরু করলেও, ১৮৬০-এর দশক নাগাদ মনোভাবের দিক দিয়ে তাঁরা জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হন।

কিন্তু ১৮৩০ এর দশকের ইয়ং বেঙ্গলদের সমাজসংস্কার সম্পর্কে স্বতন্ত্র ধারণা ছিলো। তাঁরা ছিলেন প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবিত, সে জন্যেই তাঁরা আংশিক সংস্কার অথবা আপোশে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরা পাশ্চাত্য আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করার পক্ষে ওকালতি করেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন একেবারে অ-রক্ষণশীল, সেহেতু তাঁরা কেউ কেউ এমনও ঘোষণা করেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কিছু ঘৃণা করেন, তবে তা হলো হিন্দুত্ব।[৫] বহুল প্রচলিত দেশাচারসমূহের প্রতিও তাঁরা প্রকাশ্যে অসম্মান প্রদর্শন করেন। রামমোহন রায় এবং রাধাকান্ত দেবের মতো তাঁরা ঈশ্বরমুখীন নন, ছিলেন মানবমুখীন। সুতরাং তাঁরা ধর্মীয় সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁরা বালবিধবাদের

৫. মাধবচন্দ্র মল্লিক লিখিত এবং ৩০ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের **Bengal Hurkaru** পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে একথা বলা হয়। দ্রষ্টব্য : A. F. S. Ahmed, **Social Ideas and Social Change in Bengal,** p. 49.

পুনর্বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন এবং কুলীন বহুবিবাহ রোধ করার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন,[৬] তবে প্রাচীন শাস্ত্রের অনুমোদনের কথা বিবেচনা করে তাঁরা এ আন্দোলন করেন নি, বরং যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসবশতই তাঁরা এ আন্দোলনের শরিক হন। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলগণ নিজেরাই তাঁদের প্রতিবাদী চরিত্র অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেন এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যথেষ্ট আপোষ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। যেহেতু তাঁদের নীতি ছিলো একান্তই বৈপ্লবিক এবং তাঁদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত সীমিত, সেজন্যে তাঁরা সামান্যই সাফল্য লাভ করেছিলেন অথবা অন্য ভাষায়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বরং সমাজসংস্কারকে খানিকটা এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে উভয়েই নাস্তিক বলে পরিচিত হলেও, ইয়ং বেঙ্গলদের তুলনায় অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগর ঐতিহ্যের অনেক নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁরা বিপুলভাবে পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, তবু কিছুকাল পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁদের খাঁটি হিন্দু বলেই মনে করেন। বিশেষত অক্ষয় দত্তের তুলনায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো অনেক বেশি। তিনি যে প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও পরে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি যে-একটি শিক্ষিত ও ঐতিহিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন, এটা তাঁকে সাধারণের চোখে অনেক বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলো। অক্ষয় দত্ত এবং বিদ্যাসাগর আপাত দৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব দুটি ধারার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁরা একই সঙ্গে রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় দোহাই এবং ইয়ং বেঙ্গলদের পাশ্চাত্য উদারনীতির সম্মিলন ঘটিয়ে সমাজসংস্কারের পক্ষে যুক্তি দান করেন। তাঁদের সংস্কার পদ্ধতি, বিশেষত বিদ্যাসাগরের পদ্ধতি এতোই দেশীয় বলে বিবেচিত হয় যে, তাঁরা ভদ্রলোকদের তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর একটি অংশের সমর্থন লাভে সমর্থ হন। শাস্ত্রের প্রতি ঐতিহ্যিক হিন্দুদের বিশ্বাস প্রবল হওয়ায়, বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে বারংবার শাস্ত্রেরই দোহাই দেন। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শাস্ত্র উদ্ধার করে এবং প্রচলিত শাস্ত্রের নতুনব্যাখ্যা দিয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিরোধী এবং কুলীন বহুবিবাহ-সমর্থক পণ্ডিতদেরকে বিতর্কে পরাস্ত করেন।[৭] অন্য পণ্ডিতগণ

৬. আমার অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য—'হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস ও বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬', (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭), পৃ. ২২-২৫, ১০২।

৭. ঐ, পৃ. ২৮-২৯, ৩১-৩২।

বহু বিবাহ-বিরোধী বিদ্যাসাগরের প্রশ্নগুলি হলো : ১. বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত

এই বিতর্কে তাঁকেই সমর্থন জানান। বিদ্যাসাগরের গভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষরা এতোই নিঃসংশয় ছিলেন যে, তাঁদের ঘরের বালবিধবাদের বিবাহ না-দিলেও তাঁরা অন্তত এটুকু বিশ্বাস করেছিলেন—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তা ছাড়া, সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো এবং তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। ফলে তিনি-যে কেবল ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তাই নয়, ১৮৫০-এর দশকের শেষ ক-বছর সাময়িকভাবে সমাজসংস্কারকেই তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে অন্তত মৌখিকভাবে সমর্থন জানানো জনপ্রিয় ফ্যাশনে পরিণত হয়।

এ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সাধারণ বাঙালি হিন্দুরা-যে বিধবাবিবাহ প্রচলন অথবা কুলীন বহুবিবাহ উৎখাত করেন নি, তার কারণ দেশাচার ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি তাঁদের অন্ধ আনুগত্য। উদারচিন্তার সঙ্গে অপরিচিত এবং অশিক্ষিত হওয়ায়, তাঁদের পক্ষে এ আচরণ অস্বাভাবিক ছিলো না। বস্তুত, বাহ্যত তা মনে না-হলেও বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্তের চিন্তাধারা ছিলো দারুণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত। সুতরাং তাঁদের সেক্যুলার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে ব্রাহ্ম যুবকরা ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। এর ফলে "প্রগতিশীল" ব্রাহ্মদের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে সমাজসংস্কার বেশ সাফল্য অর্জন করে। তাঁদের মধ্যেই বেশ কিছু বিধবার বিবাহ হয় এবং কয়েকটি সঙ্করবিবাহও অনুষ্ঠিত হয়।[৮] তা ছাড়া, কেশব সেনের নেতৃত্বে এই ব্রাহ্ম

কিনা এতদ্‌বিষয়ক বিচার, ২ খণ্ড (১৮৭১-৭৩); ২. **অতি অল্প হইল** (১৮৭৩); ৩. **আবার অতি অল্প হইল** (১৮৭৩); এবং ৪. **ব্রজবিলাস** (১৮৮৪)।

৮. **বামাবোধিনী পত্রিকায়** ১৮৬৪ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫০টি বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৯জন বিধবা ছিলেন ব্রাহ্ম। এছাড়া **Report on the Administration of Bengal for 1882-83** (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1883) গ্রন্থে বলা হয় যে, ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ আইনানুসারে ১০৬টি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মধ্যে ৩৬টি ছিলো বিধবাবিবাহ।

১৮৬৪ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে **বামাবোধিনী পত্রিকা**-য় ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১২টি সংকর বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়। —আমার অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট ঘ ও পরিশিষ্ট ছ।

এই সংকর বিবাহগুলির প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালের দোসরা অগস্ট। কেশবচন্দ্র সেন এই বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। সাধারণ মানুষরা এ ধরনের বিবাহের প্রতি এতোই প্রতিকূল ছিলেন যে, কেশবকে পুলিশ ডাকতে হয়। দ্রষ্টব্য: তত্ত্ব, শ্রাবণ ১৭৮৬ শকাব্দ

যুবকগণ বিবাহপ্রতিষ্ঠানটিকে ধর্মীয় আচারমুক্ত করে একে একটি অযাজকীয় চুক্তিতে পরিণত করার প্রয়াস পান। এ ধরনের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরে।[৯] অবশ্য এর আগেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিমা পূজার সংশ্রববর্জিত বিবাহপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন[১০] কিন্তু বিবাহপদ্ধতি হিন্দু আচারমুক্ত হলেও তাঁর নির্দেশিত বিবাহ ছিলো ধর্মানুষ্ঠান (স্যাক্রামেন্ট) বিশেষ। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত বিবাহটি ছিলো অযাজকীয় বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে তিক্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মদের অযাজকীয় বিবাহ রীতি স্বীকৃত হয়।

আচারপদ্ধতি মেনে অনুষ্ঠিত হয় নি এমন বিবাহসমূহকে সরকারি অনুমোদন দানের জন্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনুরোধ জানালে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে অযাজকীয় বিবাহ আইন (Civil Marriage Act) প্রণীত হয়। প্রধানত ব্রাহ্মদের উদ্‌যোগে প্রণীত হয় বলে পরবর্তী সময়ে এই আইন ব্রাহ্মবিবাহ আইন নামেও পরিচিত হয়। তবে সরকারিভাবে এ আইন থেকে "ব্রাহ্ম" কথাটি বাদ দেওয়া হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের আপত্তিহেতু। এ আইনানুসারে যাঁরা বিবাহ করতে চাইতেন, তাঁদের ঘোষণা করতে হবে যে, তাঁরা হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান অথবা বৌদ্ধ নন।[১১] এর ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে ভেদ বৃদ্ধি পায়; কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা নিজেদের অ-হিন্দু বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু আদিসমাজভুক্ত ব্রাহ্মরা নিজেদের "সংস্কৃত" অতএব খোদ হিন্দুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হিন্দু বলে দাবি করেন। এই আইন প্রণীত হওয়ায় বস্তুত ভারতবর্ষীয়

(১৮৬৪), পৃ. ১৬১; **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭১, পৃ. ১৬০; B.C. Pal, **Memories of My Life and Times**, Vol. I (Calcutta : Modern Book Agency, 1932), P. 333.

৯. 'সংস্কৃত বিবাহ', **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৪০০।

এ বিয়ের পাত্রী ছিলেন কিশোরীলাল মৈত্রের কন্যা রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর বয়স তখন ১৪ এবং তিনি তখন বেথুন স্কুলের ছাত্রী। পাত্রের নাম ছিলো প্রসন্নকুমার সেন। রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মণ ও প্রসন্নকুমার বৈদ্য হওয়ায় এটি ছিলো একটি সংকর বিবাহ।

১০. দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার অনুসারে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬১ সালে, যখন তিনি তাঁর কন্যা সুকুমারীর বিবাহ দেন।—**তত্ত্বপ**, শ্রাবণ ১৭৮৩ (১৮৬১)। এতে দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়রা এতোই অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁরা বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত হন নি। দ্রষ্টব্য: **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী**, পৃ. ৩১।

১১. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৩২-৩৮।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজ থেকে দূরে সরে যান, কেননা তাঁরা এখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা হিন্দু নন। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতিও হিন্দুদের মনোভাব কঠোর হয়ে পড়ে। অবশ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে, এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, এ আইনের ফলে হিন্দু বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত হয়। এ আইনানুসারে বর ও কনের ন্যূনতম বয়স স্থির হয় ১৮ ও ১৪। তা ছাড়া, বিবাহে বর ও কনের সম্মতি আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং বহুবিবাহের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।[১২]

১৮৭০-এর দশকে "প্রগতিশীল" ব্রাহ্মদের সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনা অবশ্য হ্রাস পায়। কারণ, এ সময়ে তাঁদের নেতা কেশবচন্দ্র সেন ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-বাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও শিবনাথ শাস্ত্রীসহ তাঁর অনেক অনুসারীই রাজনীতির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

বঙ্গীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনের এমন কতোগুলো সীমাবদ্ধতা ছিলো যে তা চোখে না-পড়ে পারে না। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত হলেও, বাস্তবে এ আন্দোলন ছিলো নারীমুক্তি আন্দোলন। ইংলণ্ডের যে-উনিশ শতকীয় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্কারের জন্ম হয়েছিলো, তার কিন্তু ভিন্ন লক্ষ্য ছিলো। ইংলণ্ডের সংস্কারকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো কলকারখানায় দরিদ্র শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন, বাঙালি সংস্কারকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন এ দেশের নির্যাতিত মহিলারা। বঙ্গদেশে শিল্পবিপ্লব জাতীয় কোনো কিছু না-ঘটায়, বঙ্গদেশে কলকারখানার দরিদ্র শ্রমিক বলতে গেলে ছিলোই না। তদুপরি, তাঁদের শ্রেণীচরিত্রহেতু গ্রামের বিপুল নিম্নবিত্ত চাষীদের দুর্দশা ভদ্র-লোকরা আদৌ দেখতে পান নি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঘরেই মহিলাদের হীনাবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং ভদ্রলোকদের সংস্কারের লক্ষ্য হন মহিলারা এবং তাঁরা মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন করার প্রয়াস পান।[১৩] এ জন্যে বলা যায়, বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র ছিলো সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোক সংস্কারকগণ-যে

১২. ঐ, পৃ. ২৩৮।
আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : 'The Brahmo Samaj and the Native Marriage Act', **Calcutta Review**, Vol. LIV, No. 108 (1872), pp.286-305.

১৩ D. Kopf, **The Brahmo Samaj** etc. pp. 14-15.

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং মহিলাদের "শালীন" পোশাক প্রবর্তনের এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য ও অবরোধ প্রথা দূরীকরণের প্রতি সচেতন হন, তার কারণ তাঁরা পরিবার ও পরিবারস্থ মহিলাদের কল্যাণ সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর সচেতন হচ্ছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পুরুষরা তথা সমগ্র সমাজই উপকৃত হবে যদি শিক্ষাদানের মাধ্যমে মেয়েদের উত্তম মাতা এবং উত্তম সঙ্গিনীতে পরিণত করা যায়। এ জন্যেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও অবরোধমোচনের কাজ ধীর কিন্তু অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলে. অথচ ১৮৭০-এর দশকের পর থেকে ভদ্রলোক-সংস্কারকগণ ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের প্রতি বেশ প্রতিকূল হয়ে পড়েন।

সংস্কার আন্দোলনের ভাঁটা

সাফল্য যতটুকুই আসুক না কেন, ভদ্রলোকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন জনপ্রিয় হয় অথবা নিদেনপক্ষে ফ্যাশনে পরিণত হয় ১৮৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই সামাজিক পরিবেশেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজে মদ্যপ হয়েও নব্যশিক্ষিতদের পানাসক্তি বিদ্রূপ করে একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯) প্রহসন রচনা করেন। আরো অনেকেই বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং কুলীন বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বিলোপ করার জন্যে ওকালতি করে নাটক, প্রহসন, কাব্য, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেন।[১৪] কিন্তু ১৮৬০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম বিশেষভাবে উন্মেষ লাভ করার ফলে সংস্কারের উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়ে। ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা ভদ্রলোকদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে না-পারলেও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা (১৮৬৭) জাতীয়তাবোধ বিকাশে নিঃসন্দেহে সহায়তা করেছিলো। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, নবোদ্ভূত হিন্দু জাতীয়তা সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে নিজেদের চিহ্নিত করার প্রশ্নে হিন্দুমেলা ভদ্রলোকদের অনুপ্রাণিত করেছিলো।[১৫] ১৮৫৯ সালে জাতীয় সভা যৌথ উদ্যোগে স্থাপন করেন এককালের "প্রগতিশীল" বলে পরিচিত আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ

১৪ আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য : পৃ. ৫৬-৫৭, ১০৩-০৪, ১০৯, ১১৮-১৯।

১৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (কলকাতা : মৈত্রী, ১৯৬৮)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, হিন্দুমেলার অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি পুরুবিক্রম (১৮৭৪) সহ প্রধান চারখানি নাটক রচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি সুপরিচিত গান রচনা করেন এই মেলার পরিবেশনের জন্যে। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই মেলায় আবৃত্তি করার জন্যে দুটি কবিতা রচনা করেন। জীবনস্মৃতি-তে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে হিন্দুমেলা এবং পরে সঞ্জীবনী সভার প্রেরণায় তিনি কিভাবে অতো কম বয়সেই দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন।

এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার রক্ষণশীল হিন্দুরা। হিন্দুমেলা তথা জাতীয় সভা বঙ্গদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। তা ছাড়া, নবগোপাল মিত্রের National Paper (১৮৬৫), শিশিরকুমার ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮), এবং মনোমোহন বসুর মধ্যস্থ পত্রিকাও (১৮৭১) এমন একটি ভূমিকা পালন করে যাকে রাজনৈতিক না-বলে পারা যায় না।

রীতিমতো রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার মঞ্চ এভাবে প্রস্তুত হয়। কেবল প্রয়োজন ছিলো একটি রাজনৈতিক সংগঠনের। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ ব্রাহ্ম বন্ধুদের সহায়তায় ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন, তখন এ অভাবও দূরীভূত হয়।[১৬] অতঃপর শিক্ষিত নগরবাসী ভদ্রলোকরা ক্রমশ অধিকতর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং অতীত ভারতকে গৌরবান্বিত করেন ও ঐতিহ্যিক সবকিছুকে সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। এই চিত্ত জাগরণ ছিলো পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজসংস্কার আন্দোলনের সরাসরি বিরোধী, কেননা সমালোচনার মাধ্যমে স্বদেশী সমাজের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করাই ছিলো সমাজ সংস্কারকগণের উদ্দেশ্য। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে। ভদ্রলোকদের মনোভাব পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আন্দোলনের প্রধান মাধ্যম বাংলা নাট্য রচনা ও রঙ্গালয়ের ওপর তার ছাপ পড়ে। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সমাজসংস্কার বিষয়ে বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হলেও, ১৮৭৬ সালে এরূপ নাটকের সংখ্যা হঠাৎ হ্রাস পায়। পরিবর্তে পুরাণ নির্ভর, প্রাচীন ভারত ও হিন্দু গৌরব-মূলক, দেশাত্মবোধক নাটক খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৭] জাতীয়তাবাদের প্রভাব এ সময়ে এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৩ সালে খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে একটি বক্তৃতা করেন।[১৮] অথচ এই রাজনারায়ণ বসুই ১৮৪০-এর দশকে গোমাংস ও বিস্কিট ভক্ষণ সহ হিন্দু ধর্মীয় বহু রীতিনীতি ভঙ্গ করেছিলেন। রাজনারায়ণের এই বক্তৃতার আয়োজন করে জাতীয় সভা এবং এতে সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ

১৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য: S.N. Banerjea, **A Nation in the Making** (London : Oxford University Press, 1925); L.A. Gordon, **Bengal : The Nationalist Movement** (New York : Columbia University Press, 1974).

১৭. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৪০-৪১।

১৮. রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা (কলকাতা : বাল্মীকি প্রেস, ১৮৭৩)।

ঠাকুর। সমসাময়িক পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, এই বক্তৃতার ফলে হিন্দু ভদ্রলোকেরা বিশেষ প্রভাবিত হন। রাজনারায়ণ বসুর মতো একজন সুপরিচিত ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলো না।[১৯]

যে-বিধবাবিবাহ আন্দোলন এক কালে ভদ্রলোকদের অমন প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিলো, আলোচ্য পর্যায়ে তা কেবল অতীতের ঘটনা বলেই গণ্য হলো না, বরং তা অপবিত্র ও নীচজনোচিত বলেও বিবেচিত হয়। যে-ভদ্রলোকরা বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পক্ষে আন্দোলন করেন, তাঁরাই ১৮৬৬ সালে কুলীন বহু-বিবাহ নিরোধক একটি আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন।[২০] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে ব্রাহ্মদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন সমর্থন করেন।[২১] কিন্তু তিনিই আবার ১৮৬৯-৭২ সালে প্রস্তাবিত ব্রাহ্মদের অযাজকীয় বিবাহ আইনের তীব্র বিরোধিতা করেন[২২] এবং ১৮৭৩ সালে ঘটা করে রবীন্দ্রনাথসহ তাঁর দুই কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।[২৩] বস্তুত, অতঃপর হিন্দু ভদ্রলোকরা দোষ-গুণ নির্বিশেষে প্রায় সকল হিন্দু ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। সহবাস সম্মতি বিল (Age of Consent Bill) নিয়ে সারাদেশে দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রস্তাবিত আই-নের সমর্থন করলেও, বাঙালি ভদ্রলোকরা এ প্রসঙ্গে প্রায় নীরবতা পালন করেন। বরং উল্টো বারো বছরের চেয়ে কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকদের একটি বড়ো অংশই প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন।[২৪]

১৯. **রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত**, পৃ ৮৮-৮৯ : শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**, পৃ. ২৮৬।

২০. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : **Report of the Committee appointed by Government to Consider the Question of Legislative Interference for Preventing the "excessive abuse" of Polygamy as Practised by the Kulin Brahmans dated 7th February, 1867** (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1867).

২১. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ৭ আষাঢ় ১৭৮৩ (১৮৬১) এবং ১৩ মাঘ ১৭৮৪ (১৮৬৩), **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী**, পৃ. ৩২, ৩৮।

২২. দ্রষ্টব্য : **ধর্মতত্ত্ব**, আশ্বিন-কার্তিক ১২৭৮; **তত্ত্বপ**, বেশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ (১৮৭২); 'The Brahmo Samaj and the Native Marriage Act', **Calcutta Review**, pp. 294 305.

২৩ আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৩৬।

২৪. P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal**, p. 128.

আগের যুগের জাতীয়তাবাদীদের মতো এই শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যুক্তি দেখান যে, বহিরাগত সরকারের সহায়তা নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কার করা অনুচিত।[২৫] সমাজ-সংস্কার না-করে এই সময়ে ভদ্রলোকরা অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ও সিবিল সার্বিসে অধিকসংখ্যক পদের দাবি করেন। এই জন্যেই সহবাস সম্মতি বিলের (১৮৯০-৯১) তুলনায় ইলবার্ট বিল বঙ্গদেশে অনেক বেশি উৎসাহের সৃষ্টি করে।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ছাড়াও, আর-একটি কারণে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা লাগে, সে হলো এর আংশিক সাফল্য। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার সময় থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত হিন্দু বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।[২৬] বঙ্গ দেশের মোট জনসংখ্যা এবং মোট বালবিধবার তুলনায় এই সংখ্যা ছিলো খুবই নগণ্য। ১৯০১ সালে কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যেই ১২ বছরের চেয়ে কমবয়সী বিধবার সংখ্যা ছিলো ১,২৯০। আর এঁদের মধ্যে ২০ বছরের চেয়ে কমবয়সী বিধবার সংখ্যা ছিলো ১০,৮৯১।[২৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিধবাবিবাহের যথেষ্ট প্রভাব ভদ্রলোকদের ওপর পড়েছিলো। এর ফলে প্রথমত ভদ্রলোকরা কুলীন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ ইত্যাদি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ পরিবারেই বিধবার পুনর্বিবাহ না-হলেও, তার মর্যাদা ও সুখ-স্বাস্থ্য খানিকটা পেয়েছিলো। শিক্ষিত পরিবারে অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন যে, বিধবারাও মানুষ এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা উচিত।[২৮] এই পরিবর্তন সরলা দেবীর আত্মজীবনীতে প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্ত থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দৃষ্টান্তটি জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের বিধবা বড়ো মেয়ের। তিনি ছিলেন দারুণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত একটি পরিবারের নিঃসন্তান বালবিধবা কন্যা। তা সত্ত্বেও তাঁর পুনর্বিবাহ হয় নি। অবশ্য বিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে উচ্চশিক্ষা দান করে তাঁকে সংসারের কর্ত্রী আসনে বসানো হয়। সরলা দেবীর মতে, এই সংসারের সবাই এঁর

২৫. **Ibid.**, pp. 128-34.

২৬. এর মধ্যে ৭২টি বিবাহ হয় ১৮৭২ সালের ব্রাহ্মবিবাহ আইনানুসারে (১৮৭২-১৮৯২). দ্রষ্টব্য : **Report on the Administration of Bengal for 1882-83**, p. 497; and **Report on the Administration of Bengal for 1892-93** (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1893), p. 582.

২৭. **Report on the Census of India, 1901**, Vol. VIA, Pt. 2, pp. 292-95, 300-01.

২৮. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫২-৫৪।

কথামতো চলতেন এবং সংসারের সকল শিশুই যেন এঁর সন্তান ছিলো।[২৯] এই পরিবেশেই ১৮৮০-এর দশক নাগাদ লেখকরা বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয় সরকারের মতো ঐতিহ্যিক লেখকরা, বৈধব্য ও বিধবা উভয়কে গৌরবান্বিত করেন।[৩০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি কুলীন বহুবিবাহ পুরোপুরি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। ১৮৯৪ সালেও বরিশালের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বর্ধমানের কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো বহুবিবাহকারী কুলীনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ১০৭ টি বিবাহ করেছিলেন এবং কিশোরী মোহনের ৬৫ টি স্ত্রী তখনো বেঁচেছিলেন।[৩১] তবে এমন দৃষ্টান্ত নিশ্চয় অত্যন্ত বিরল ছিলো। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, মহিলারা নিজেরাও সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ছিলেন এমন কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান যে-পরিবারে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলো। কিন্তু সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়ায়, তাঁরাও কুলীন বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।[৩২]

বাল্যবিবাহের রীতিও খানিকটা দূর করা সম্ভব হয়, বিশেষত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেয়েদের বিয়ে হতো সাধারণত আট-দশ বছর বয়সে। কিন্তু শতাব্দীর শেষ নাগাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের বিয়ের বয়স অন্তত তিন বছর বৃদ্ধি পায়।[৩৩] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মরা বস্তুত প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি গ্রহণ করেন।[৩৪] নীচের পীঠিকা থেকে বোঝা যায় যে, বাল্যবিবাহ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলো :

২৯. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা**, পৃ. ৮৫-৮৬।

৩০ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য : অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না'; **সাবিত্রী** (কলকাতা: সাবিত্রী লাইব্রেরি, ১৮৮৬), পৃ ১৭৮-৭৯।

৩১. **বামাপ**, পৌষ ১৩০০, পৃ. ২৮৬।

৩২. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০৭-১১।

৩৩. প্যারীচরণ সরকার, 'দৃষ্টান্তের ফল', **হিতসাধক**, আষাঢ় ১২৭৫, পৃ. ১২৬; মনোমোহন বসু, **হিন্দু আচার ব্যবহার**, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: মধ্যস্থ প্রেস, ১৮৭৩), পৃ.৩৫; 'বাল্যবিবাহ ও **হিন্দু হিতৈষিণী**', **সোমপ্রকাশ**, আশ্বিন ১২৮৫, **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, চতুর্থখণ্ডে উদ্ধৃত পৃ. ২৮৫-৮৬।

৩৪. ইন্দিরা দেবীর বিয়ে হয় ২৬ বছর বয়সে, সরলা দেবীর ৩২-এ, কামিনী সেনের ৩০-এ, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতার ২৫-এ, অন্নদায়িনী লাহিড়ীর ২১-এ, অবলা বসুর (জগদীশ বসুর স্ত্রী) ২৩-এ, কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ২২-এ, কুমুদিনী খাস্তগীরের ৩০-এর দিকে এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর ২১-এ। ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মরা ১৮৭২ সালের ব্রাহ্ম বিবাহ আইনানুসারে বিয়ে দিতেন, এতে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ১৪ বেঁধে দেওয়া হয়। ১৮৭৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী ও কতিপয় ব্রাহ্ম যুবক মিলে একটি সমিতি করেন। এঁরা প্রতিজ্ঞা করেন ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো মেয়েকে এঁরা বিয়ে করবেন না বা বিয়ে দেবেন না।

পীঠিকা ৫[৩৫]

১৬ বছরের কম বয়সী বালক-বালিকার বৈবাহিক অবস্থা ঃ

প্রতি এক হাজারে বিবাহিতের সংখ্যা

	বছর ১৮৮১		বছর ১৯০১	
বয়স	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
০-৫	৫৪ (১ জন বিপত্নীক)	১১৩ (৬ জন বিধবা)	৯ (১)	২১ (১)
৫-১০			৭৫ (৩)	২০১ (১)
১০-১৫	২৩৮ (৮)	৬৮৬ (৩৪)	২১৫ (৩)	৬২১ (৩০)

অবশ্য নিম্নের পীঠিকা থেকে দেখা যায়, ১৯০১ সালেও সমস্যাটি এতোই প্রবল ছিলো যে, খোদ কলকাতা শহরেও পাঁচ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়ের বিয়ে হতো।

পীঠিকা ৬[৩৬]

কলকাতা শহরে প্রতি এক হাজার বালক-বালিকার বিবাহিতের সংখ্যা, ১৯০১

বয়স	বালক	বালিকা
০-৫	৫·৪	৬·৬
৫-১২	৪৫	১১২
১২-১৫	১৪৫	৭১৫

১৯০১ সালের লোকগণনার প্রতিবেদন থেকে আরো দেখা যায় যে, দশটি ব্রাহ্ম বালক এবং সাতটি ব্রাহ্ম বালিকার ১২ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে

৩৫. **Report on the Census of India, 1901**. Vol. VIA, pt. (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902), p. 266.

৩৬. **Report on the Census of India, 1901**, Vol. VII, pt. 3 (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902), pp. 72–73.

হয়েছিলো।[৩৭] এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি যিনি মেয়েদের সম্পর্কে অমন 'প্রগতিশীল' মনোভাব পোষণ করতেন, তিনিও ১৯০১ সালে তাঁর দ্বিতীয় মেয়েকে মাত্র সাড়ে দশ বছর বয়সে বিবাহ দেন। কারণ, কবির নিজের ভাষায়, প্রস্তাবিত বর 'একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব আমি বলিলাম, কর'।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত পাত্রটিকে খুব যোগ্য বলে বিবেচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ করা ডাক্তার এবং তিনি চাচ্ছিলেন অ্যামেরিকায় গিয়ে তদুপরি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নিতে। সম্ভবত এতেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন।* তা ছাড়া তিনি নিশ্চয় এটাও বিবেচনা করেছিলেন যে, পিরালি পরিবারের কন্যার জন্যে ব্রাহ্মণ পাত্র জোটানো কী শক্ত।[৩৯] এ ধরনের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ভদ্রলোকদের মনোভাব প্রতিকূল হচ্ছিলো। সমাজসংস্কার আন্দোলন এভাবেই কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করে।

সংস্কার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা অবশ্য ভদ্রলোকদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত ছিলো। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, এঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। সেকালে

৩৭. **Ibid.**

এই ব্রাহ্ম বালিকারা নিশ্চয় আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন।

৩৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্র জীবনী**, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সং; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১) পৃ. ২৯-৩০।

আরো দ্রষ্টব্য **চিঠিপত্র**, ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৭). পৃ. ৩৭। তিনি আরো লেখেন: 'ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী'।

* কবি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখেন, 'পাত্রটি মনের মতো হওয়ায়' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য: **চিঠিপত্র**, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ২০৫। সত্যেন্দ্রনাথের বয়স রেণুকার দ্বিগুণেরও বেশি ছিলো মনে হয়।

৩৯. জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের একজন পূর্বপুরুষ নাকি তাঁর জাত খুইয়েছিলেন, কারণ তাঁর সামনে স্থানীয় জমিদার পীর আলী গোমাংস ভক্ষণ করেছিলেন। এভাবে যে-ব্রাহ্মণদের জাত নষ্ট হয়েছিলো তাঁদের সংখ্যা ছিলো সামান্য, তা ছাড়া এঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে অন্য ব্রাহ্মণরাও জাত হারাবেন,—এজন্যে পিরালি পরিবারের কন্যাদের বিবাহ দেওয়া একটা সমস্যা ছিলো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার সাধারণত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাত্র জোগাড় করে তাঁদের কাছে কন্যা সম্প্রদান করতো। এ জন্যে এ পাত্রদের বহু অর্থ দিয়ে 'কিনতে' হতো এবং সাধারণত ঘরজামাই করে রাখতে হতো।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার কি করে পিরালি-তে পরিণত হয়, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্র জীবনী**, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২-৩।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর 'স্মৃতিকথায়' এই জামাই সংগ্রহকে 'জামাই কেনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তাঁর তিন জামাইকে প্রচুর অর্থ যৌতুক হিশেবে প্রদান করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট এক।

কলকাতার বাইরে ঢাকার মতো দু একটি মফস্বল শহর ছাড়া অন্যত্র এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের বাইরে অন্য বর্ণের হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা সামান্যই বিস্তার লাভ করেছিলো। অথচ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা তখন ছিলেন বঙ্গদেশের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষা এবং সমাজসংস্কার আন্দোলন উচ্চবর্ণের নগরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই এক রকম সীমিত ছিলো। তদুপরি, সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো খুবই অপ্রতুল। সুতরাং ভদ্রলোকদের এই আন্দোলন বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়তে কয়েক দশকের প্রয়োজন হয়েছিলো। ফলে, হরিশচন্দ্র মিত্র এবং রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো মফস্বলবাসী সংস্কারক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েই তাতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে নগরবাসী ভদ্রলোকরা নিজেরাই সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ হারিয়ে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।[৪০]

সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের সাড়া

সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের মনোভাব এবং সেই মনোভাবের ক্রম পরিবর্তন থেকে আধুনিকতার প্রতি মহিলাদের মনোভাব অনেকটা প্রতিফলিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলেও ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রায় কেউই গ্রহণ করেন নি। ১৮৬০ এবং ১৮৭০-এর দশকে বালিকা বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী বালিকার সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তবে এ সব বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার মান তখনো খুব নিচু ছিলো। বরং যে সব ব্রাহ্মমহিলা তাঁদের স্ব স্ব স্বামীর কাছ থেকে অথবা অন্তঃপুর শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বাড়িতে বসে লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মান খানিকটা উন্নত ছিলো। এই মহিলাদেরই কেউ কেউ প্রথম বামাবোধিনী পত্রিকা-য় এবং পরে অবলাবান্ধব, বঙ্গমহিলা এবং পরিচারিকা-য় তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন।

স্ত্রীশিক্ষা, পরিবার ও সমাজে মহিলাদের অবস্থান, গুরুজনদের সঙ্গে, বিশেষত শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রসঙ্গ মহিলাদের প্রথম দিককার রচনায় গুরুত্ব লাভ করে। বিধবা বিবাহ প্রচলন করা উচিত কি না, বাল্যবিবাহ এবং কুলীন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় কি না এ সব প্রশ্ন নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। তবে এ ধরনের সমাজ-সংস্কার বিষয়ক প্রসঙ্গ সামান্যই আলোচিত হয়, কেননা মহিলারা রচনা প্রকাশ করতে

৪০. আমার পি-এইচ ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৩৮-৩৯।

আরম্ভ করার আগেই সমাজসংস্কার আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। বিশেষত শতাব্দীর শেষ দু দশকে মহিলারা বিধবাবিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথার মতো ধর্মীয়-সামাজিক বিষয় নিয়ে কার্যত কিছুই লেখেন নি; যদিচ স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধ প্রথা, পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ইত্যাদি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে তারা বারংবার বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

প্রস্তাবিত সহবাস সম্মতি বিল ছিলো প্রত্যক্ষভাবে মহিলাদের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। কারণ অনুরূপ একটি আইন না থাকায় পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি বিপদগ্রস্ত হতেন। এই বিল নিয়ে দেশব্যাপী পুরুষদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলায় আইন প্রণয়নে দু বছর সময় লাগে এবং আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে সরকার মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে বারোতে নামাতে বাধ্য হন। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালি মহিলারা এই বিতর্ক চলাকালে পুরোপুরি নীরবতা পালন করেন। তাঁর বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে, ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মানকুমারী বসু বলেন, সহবাস সম্মতি আইন মহিলাদের মঙ্গলের জন্যে প্রণীত।[৪১] আমার বর্তমান গবেষণা-কালে, এই আইনের স্বপক্ষে লেখা মহিলাদের অন্য কোনো রচনা আমার চোখে পড়ে নি; অথচ আলোচ্য সময়ে বঙ্গদেশে কৃষ্ণভাবিনী দাস, শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী এবং কামিনী সেনের মতো স্পষ্টবাদী অনেক মহিলা তাঁদের প্রচুর লেখা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে কৃষ্ণভাবিনী দাসের নীরবতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা তিনি পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের শোষণ ও নিপীড়ন, ভারতবর্ষ ও বিদেশে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা, উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার জন্যে ইংরেজ মহিলাদের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধে সে সময় প্রকাশ করেছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্বামী অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন একজন উদার মানুষ। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ দাস ১৮৭০-এর দশকের নামকরা নাট্যকার ও নাটক-প্রযোজক ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তিনি ১৮৬৯ সালে এক বিধবাকে বিবাহ করেন এবং এঁর ফলে তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস ও অন্যান্য আত্মীয়রা তাঁর ওপর রুষ্ট হন।[৪২] শ্রীনাথ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু। কিন্তু পরিবারে এমন উদার পরিবেশ সত্ত্বেও,[৪৩]

৪১. মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীর..', পৃ. ৮৯।

৪২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৮১-৮৬।
বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালের শ্রাবণ মাসে।—বামাপ, আশ্বিন ১২৭৬, পৃ. ১১৭।

৪৩. আমার প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের...' দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২৮-৪৩।

কৃষ্ণভাবিনী সহবাস সম্মতি আইন বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত মতামত রাখতে পারেন নি, কারণ ১৮৯০-এর দশক নাগাদ প্রায় সকল ভদ্রলোকই ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহিরাগত সরকার কর্তৃক সংস্কার করার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেন। শরৎকুমারী,জ্ঞানদানন্দিনী এবং স্বর্ণকুমারীর নীরবতাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বস্তুত, যে সময়ে মহিলারা পুরুষদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন এবং ফলে তাঁরা এমন মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন যার প্রতি পুরুষদের সমর্থন ছিলো না। পুরুষ ও মহিলাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হলে, মহিলারাই পুরুষদের কাছে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হন।

বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার পর সংস্কারকগণ প্রত্যাশা করেছিলেন যে, মহিলারা বিশেষত বিধবারা এই আইনের প্রতি অনুকূল সাড়া দেবেন। কিন্তু তাঁরা আসলে অসম্ভব আশা করেছিলেন, কারণ যে-মহিলারা ছিলেন খুবই ঐতিহ্যিক এবং পুরোপুরি অশিক্ষিত, তাঁদের তরফ থেকে এমন সাড়া হতো অত্যন্ত অস্বাভাবিক। হতাশ হয়ে সম্বাদ ভাস্কর-এর সম্পাদক লেখেন: ‘পূর্বে শঙ্কা ছিল বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় বিধি প্রচার হইলেই বিধবারা দ্বিতীয় ধবে পুনঃসধবা হইতে চাহিবেন তৎপরে বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার হইয়া গিয়াছে, তথাচ ভদ্রজাতীয়া কোন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই...কোন অবলা কৌতুকচ্ছলেও বলেন নাই বিবাহ করিবেন,...[৪৪]

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাদেবী নামে এক মহিলা। ইনি ১৮৫৬ সালের অগস্ট মাসে সম্বাদ ভাস্কর-এ প্রকাশিত এক পত্রে বলেন যে, তিনি বৃদ্ধা, সুতরাং পুনর্বার বিবাহ করতে চান না। কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ আইন শত শত বিধবার দুঃখভার লাঘব করবে।[৪৫] বিদ্যাদেবীর এ চিঠি আদৌ কোনো মহিলার রচনা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তখন লেখাপড়া জানতেন মুষ্টিমেয় মহিলা, স্ত্রীশিক্ষার মানও ছিলো অত্যন্ত নীচু। সুতরাং তাঁদের কারো পক্ষে সংবাদপত্রে এমন একখানা চিঠি লেখা ছিলো দারুণ অসাধারণ ব্যাপার।

বিধবাদের পুনর্বিবাহের ধারণা জনপ্রিয় মনোভাবের এতোই প্রতিকূল ছিলো যে, বিধবাদের অথবা মহিলাদের পক্ষে একে সমর্থন জানানো সর্বৈবভাবে ব্যতিক্রম-ধর্মী ছিলো। বিধবারা কেন বিবাহ করতে চান না অথবা চাইলেও সেই ইচ্ছা

৪৪. **সম্বাদ ভাস্কর**, ৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬, **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৪৭।

৪৫. **সম্বাদ ভাস্কর**, ২১ অগস্ট ১৮৫৬, **সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র**, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩-৮৪।

তাঁরা কেন অন্যের কাছে প্রকাশ করেন না—এর ব্যাখ্যা স্বরূপ ১৮৭০ সালে একজন লেখক নিম্নলিখিত কারণসমূহ উদ্‌ধৃত করেন: ১. বিধবারা পুনর্বিবাহকে মহাপাপের কাজ বলে গণ্য করেন; ২. সমাজ পুনর্বিবাহের ধারণাকে ঘৃণার চোখে দেখে; ৩. বৈধব্যের সূচনায় বিধবারা বৈধব্যের ভাবী কৃচ্ছ্রসাধনা উপলব্ধি করতে পারেন না; ৪. বিধবা হওয়ার অব্যবহিত পরে তাঁরা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সান্ত্বনা, সহানুভূতি ও যত্ন লাভ করেন এবং মনে করেন চিরদিনই তাঁরা এটা পেতে থাকবেন; ৫. বিবাহের সম্ভাবনা খুবই সামান্য একথা জানেন বলেই তাঁরা বিবাহের কথা আদৌ বিবেচনা করেন না; এবং ৬. তাঁরা অন্য বিধবাদের দৃষ্টান্ত দেখে বৈধব্যের দারুণ যন্ত্রণা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেন।[৪৬] এ সব কারণ ছাড়াও, ১৯৬০-এর দশক নাগাদ যখন মহিলারা তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, ততোদিনে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিলো। এ জন্যেই এ আন্দোলনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ অতো সীমিত। তা সত্ত্বেও, মহিলাদের রচনায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশ পায় তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং তা থেকে আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব বোঝা সহজ হয়।

কৈলাসবাসিনী দেবী ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রতিমাপূজা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে একথা প্রমাণিত হয়।[৪৭] তবে হিন্দু ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি তাঁর উদ্‌বেগ এবং বামাবোধিনী পত্রিকা-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের অভাব থেকে মনে হয় যে, তিনি কেশবপন্থী "প্রগতিশীল" ব্রাহ্মদের মতো অতোটা অ-রক্ষণশীল ছিলেন না। **হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা** গ্রন্থে তিনি কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা এবং স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। সম্ভবত নিজে বিধবা না-হওয়ার দরুণই তিনি বিধবাবিবাহ সম্পর্কেও নির্দ্বিধায় তাঁর মতামত দেন। তিনি বৈধব্যের কষ্টকে অসহনীয় বলে গণ্য করেন। ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে-প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ দয়াকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে অভিহিত করেন, সেই একই শাস্ত্রকারকগণ নির্দয়ভাবে বালবিধবাসহ

৪৬. 'হিন্দু বিধবা', **বামাপ**, শ্রাবণ ১২৭৭, পৃ. ১০৪।

৪৭. তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ **হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস**-এ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের লেখা একটি প্রশংসাপত্র মুদ্রিত হয়েছে। এতে তিনি বলেন যে, তিনি অনেকদিন থেকে কৈলাসবাসিনীকে চেনেন এবং তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

সকল বিধবার জন্যে বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য উপবাস এবং অন্যান্য শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনার বিধান দেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, বিদ্যাসাগরের কঠোর পরিশ্রম এবং প্রভূত ব্যয় সত্ত্বেও, বিধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল নগণ্য সাফল্য অর্জন করে। শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষরা কেন বিধবাবিবাহ প্রচলন করে না এতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। উপসংহারে, দারুণ যন্ত্রণা থেকে বিধবাদের উদ্ধার করার জন্যে তিনি দেশবাসীদের কাছে আবেদন জানান।[৪৮]

বিধবাদের প্রতি কি রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, আর-একজন মহিলা ১৮৭০ সালে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দেন। অসংখ্য কমবয়সী বিধবার দুঃখ কষ্টের সমাধান পুনর্বিবাহের দ্বারাই হতে পারে—এ কথা স্পষ্টভাবে না-বললেও, তিনি বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাতে চেষ্টা করেন।

> বঙ্গদেশ মধ্যে বিধবা রমণীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিবার রীতি বহু দিবসাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। এই ঘৃণিত নিয়ম কেবল ইতর লোকের গৃহেই বিদ্যমান আছে এমত নহে। অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও ইহার বিদ্যমানতা শ্রুতিগোচর হয়। বিধবা হলেই বিধবা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এটী এ দেশের অনেকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। অনেক পিতা-মাতা শ্বশ্রূ ননদ ও অন্যান্য পরিজনগণ পদে পদে বিধবাদিগের ছল অন্বেষণ করেন। বিধবা যদি উত্তমবস্ত্র পরিধান করে, উত্তম দ্রব্য আহার করে, আসনে উপবেশন করে, এবং সমবয়স্ক রমণীদিগের সহিত হাস্য করে, তাহা হইলে অনেক গৃহিণী খড়গ হস্ত হইয়া উঠেন।... আমরা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি যে, অমুক তাহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাঁহার বিধবা কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকাপ্রহার করিতেছেন, অমুক তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন...[৪৯]

মুজাফফরপুরের সারদা দেবী ছিলেন "প্রগতিশীল" ব্রাহ্ম মহিলা। তিনি অবশ্য কেশব সেন প্রভাবিত ব্রাহ্ম পুরুষদের মতোই বিধবাবিবাহকে সরাসরি সমর্থন করেন। তিনি এভাবে যুক্তি দেন: স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষরা যদি বিয়ে করতে পারেন এবং তা যদি পাপের কাজ বলে বিবেচিত না হয়, তা হলে বিধবা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে দোষ হবে কেন? নিশ্চয়ই বিধাতা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করেন নি।[৫০]

৪৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, **হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা**, পৃ. ৩৫, ৬৯-৭২।

৪৯. 'বামাবচনা', **বামাপ**, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৬-৬৭।

৫০. সারদা দেবী, '**বঙ্গদেশীয় লোকদিগের..**,' **বামাপ**, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৪০২।

সারদা দেবীর এ যুক্তির মধ্যে কোনো মৌলিকত্ব ছিলো না। তাঁর আগে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর এবং অন্য অনেকেই একই ধরনের যুক্তি দিয়েছিলেন। রমাসুন্দরী[৫১] এবং ক্ষীরোদা মিত্র[৫২] প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত তাঁদের রচনায় যা বলেন তার মধ্যেও কোনো মৌলিকত্ব লক্ষ্য করিনে। কিন্তু তাঁদের রচনা দুটিকেও ব্যতিক্রমধর্মী বলতে হয় এ জন্যে যে, সেকালে বেশী মহিলা বিধবাবিবাহ প্রচলন সমর্থন করেন নি।

বারাসতের এক মহিলা[৫৩] এবং ব্রজবালা দেবী[৫৪] বিধবাবিবাহ বিষয়ে দুটি অসাধারণ কবিতা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, বিধবাদের দারুণ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হয় কারণ তাঁদের জন্যে নির্ধারিত সামাজিক রীতি-নীতি অত্যন্ত কঠোর। এ সব কঠোর লোকাচার পালনে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক সময়ে বিধবারা ভ্রষ্ট হন। এ সব সত্ত্বেও এবং বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দুরা তাঁদের বালবিধবাদের পুনর্বার বিবাহ দেন না। কারণ তাঁরা শাস্ত্রের তুলনায় দেশাচার ও লোকাচারকেই বেশি মানেন। ব্রজবালা দেবী তাই তাঁর কবিতায় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের জন্যে আবেদন জানান। তিনি এই বলে হিন্দুদের প্রশ্ন করেন: 'ওই যে কাতরা মলিন-বয়ান/ কাঁদিছে বিধবা দেখ না হায়।/... এই কি তোদের ধরম করম,/নাই কিরে জ্ঞান একটু সরম, কিসে যবনকে কসাই বল?' তিনি হিন্দুদের "পশুর অধম" বলে আখ্যায়িত করেন। কোনো মৌলিক যুক্তি না-থাকলেও আলোচ্য কবিতাদ্বয় তাদের আন্তরিকতা, জোরালো ভাব ও প্রচণ্ড আবেগের জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সমাজ সংস্কারের উৎসাহ জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছিলো। সে জন্যেই ১৮৭৬ সালে ব্রজবালা দেবী তাঁর কবিতা প্রকাশ করার অব্যবহিত পরেই কমপক্ষে দু জন মহিলা তাঁর প্রতিবাদ করেন। আগের দশকে বিধবাবিবাহের সপক্ষে মহিলারা তেমন কিছুই না-লিখলেও, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অন্তত তাঁরা কিছু লেখেন নি। কিন্তু এখন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে ভদ্রলোকরা যেহেতু তাঁদের অতীতের দিকে গর্বের সঙ্গে তাকাতে শুরু করেছিলেন, সুতরাং মহিলারা, এমন কি বিধবারা নিজেরাও বিধবাবিবাহকে লজ্জা ও অপরাধের

৫১. রমাসুন্দরী, 'এদেশের স্ত্রীশিক্ষা...', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃ. ৭১-৭৩।
৫২ ক্ষীরোদা মিত্র, 'দূষিত দেশাচারের নিমিত্ত বিলাপ', পৃ. ৩৪১।
৫৩. বারাসতের জনৈকা মহিলা, বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪, পৃ. ৫২৫-২৬।
৫৪. ব্রজবালা দেবী, 'আমি কি উন্মাদিনী', বঙ্গমহিলা, কার্তিক ১২৭৪, পৃ. ১৬৬-৬৭।

বিষয় বলে গণ্য করেন। যেমন ব্রজবালা দেবীর প্রতিবাদে কামনা দেবী বলেন যে, বিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য প্রশংসনীয় বিধান এবং এ নিয়ে ভারতবর্ষ গর্ব বোধ করতে পারে। ব্রজবালা দেবীর অনুকরণে তিনি বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কাছে এই বলে আবেদন করেন যে, তাঁরা যেন বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমর্থন না-করেন।[৫৫] কুসুমকুমারী দেবী নামে অন্য এক মহিলা ব্রজবালার দু মাস পরে তাঁর কবিতা প্রকাশ করেন, এতে তিনি ব্রজবালাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন।[৫৬]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু দশকে বৈধব্যবিষয়ক সংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাব ক্রমশ কঠোর হয়ে পড়ে। তাঁরা মনে করতে শুরু করেন যে, পুনর্বিবাহ নয়, পরিবার বিধবাদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিধবাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করা সম্ভব। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী নিজেই বিধবা ছিলেন। বিধবাদের আশ্রয় ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮৫ সালের দিকে একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করেন।[৫৭] বঙ্গদেশে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপ একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করেন ১৮৮৭ সালে।[৫৮] তিনি রমাবাই-এর কাছেই এ ধারণা পান। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে শশিপদ বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যে প্রায় ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি নিজের চোখের সামনে তাঁর পুনর্বিবাহিত এক বিধবা নিকটাত্মীয়াকে শারীরিক নির্যাতন ও অপমানের ভাগী হতে দেখেন।[৫৯] তিনি উপলব্ধি করেন যে, সমাজ বিধবার পুনর্বিবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে। সে জন্যেই তিনি এই বিধবা-আশ্রম খুলে বিধবার দুঃখকষ্ট লাঘব করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে কার্যকালে দেখা গেলো, তাঁর আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবাদের মধ্যে ৩৫ জন পুনর্বিবাহ

৫৫. কামনা দেবী, 'আমি ত বিধবা', **বঙ্গমহিলা**, অগ্রহায়ণ ১২৮৩, পৃ. ১৮৬-৮৯।

৫৬. কুসুমকামিনী দেবী, 'কে লিখিল ?', **বঙ্গমহিলা** মাঘ ১২৮৩, পৃ. ২৩৫-৩৮।

৫৭. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫২-৫৩।

৫৮. 'মহিলা শ্রম', **বামাপ**, চৈত্র ১২৯৪, পৃ. ৩৭১-৭৪। আরো দ্রষ্টব্য : A.R. Banerji, **An Indian Pathfinder**, pp. 84-85.

বিধবাশ্রম মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে—এই ধারণা ম্যাক্সমুলারসহ অনেকের মনোযোগই আকৃষ্ট করেছিলো। ম্যাক্সমুলার ভারতীয়দের প্রতি এই বলে আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন, অধিকসংখ্যক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বিধবাদের দুঃখ মোচন করতে চেষ্টা করেন।— **বামাপ**, আশ্বিন ১২৯৪, পৃ. ১৬১।

৫৯. D. Kopf, **The Brahmo Samaj** etc., P. 120; A.R. Banerji, pp. 61-62, 82-83.

করেন।[৬০] পরবর্তী তিন দশকে কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৯১৮), অবলা বসু ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (১৯১৯), সরজু গুপ্ত প্রমুখ মহিলা বেশ কয়েকটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করেন।

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা বিধবাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন, তবে তাঁরা বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমর্থন করেন নি। মানকুমারী বসু যখন বিধবা হন তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র সাড়ে আঠারো বছর। বিধবাদের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দানের পক্ষে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তা ছাড়া, তিনি বলেন যে, বাঙালি বিধবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাঁরা অধিকতর সহানুভূতি ও দয়ার্দ্র ব্যবহার পেতে পারেন।[৬১] কিন্তু তিনিও বিধবাদের পুনর্বিবাহ উচিত কি না—এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে ওকালতি করলে পাছে লোকেরা মনে করে যে, তিনি বোধ হয় নিজেই আবার বিয়ে করতে চান—এই ভয়েই তিনি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে নীরবতা পালন করেন কি না, বলা শক্ত। কিন্তু এটা একেবারে স্পষ্ট যে, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাব পুরুষদের মনোভাবের পথ ধরেই বিবর্তিত হয়। মহিলাদের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেও, মহিলারা পুরুষদের বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। অন্তত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাবের পরিবর্তন দৃষ্টে তা-ই মনে হয়।

বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মহিলারা অতো ঐতিহ্যিক এবং আত্মবিশ্বাসহীন বা সংশয়ী হলেও, কুলীন বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবে কোনো রকম স্ববিরোধ এবং দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করা যায় না। কুলীন বহুবিবাহ ছিলো নগণ্য সংখ্যক ব্রাহ্মণদের সমস্যা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, অব্রাহ্মণ মহিলাসহ, বহু মহিলা কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার দোষ সম্পর্কে লেখেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৈলাসবাসিনী দেবীর কথা পুনরায় বলা যায়। তিনি ছিলেন কায়স্থ। কিন্তু তবু **হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা** গ্রন্থে কুলীনদের বহুবিবাহ এবং তার দোষ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কৌলীন্য কতো অর্থহীন ও ঠুনকো এবং কুলীন বহু-বিবাহের ফলে বালবৈধব্য, বাল্যবিবাহ এবং বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর বিবাহ কিভাবে প্রশ্রয় পায় সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেন।[৬২] ক্ষীরোদা মিত্র, সারদা দেবী,

৬০. L.S.S. O' Mally, **Modern India and the West** (Reprint; London: Oxford Univesrity Press, 1968), P. 456.

৬১। মানকুমারী বসু, 'বিগত শতবর্ষে...,' পৃ. ৩২৭-২৮।

৬২. **হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা**, পৃ. ৭-১৮।

যোগীন্দ্রমোহিনী বসু[৬৩] প্রমুখ মহিলা মোটামুটি এই যুক্তির অবতারণা করে কুলীন বহুবিবাহের সমালোচনা করেন। এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় যে, বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মতবিরোধ থাকলেও, কুলীন বহুবিবাহ সম্পর্কে তাঁদের মতভেদ ছিলো না। ভদ্রলোক সংস্কারকদের আন্তঃবর্ণ চরিত্র অতো প্রকট থাকা সত্ত্বেও এতো অব্রাহ্মণ মহিলা কেন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সমস্যা নিয়ে লেখেন—তা বলা শক্ত।[৬৪] এটা খুবই সম্ভব যে, বহুবিবাহের দোষ সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতাই তাঁদের কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অতোটা প্রতিকূল করে তোলে।

অব্রাহ্মণ মহিলারাই যদি কুলীন-বহুবিবাহের প্রতি এতো বিদ্বিষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে কুলীন ব্রাহ্মণ মহিলারা এই রীতির প্রতি কতোটা প্রতিকূল হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁদের বিরুদ্ধতা কেবল তাঁদের রচনায়ই নয়, তাঁদের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপেও প্রকাশ পায়। ১৮৭০ সালে যেমন কৃষ্ণমণি নামে এক কুলীন স্ত্রী তাঁর স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে খোরপোষের জন্যে একটি মামলা করেন এবং তাতে জয়ী হন। আদালত এই বলে রায় দেয় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ভরণপোষণের জন্যে মাসে ১৫ টাকা করে স্ত্রীকে দেবে। কিন্তু দারিদ্র্যহেতু তা না-পারায়, লক্ষ্মীনারায়ণ জেলে যেতে বাধ্য হয়।[৬৫] হৈমবতী নামে এক কুলীন স্ত্রী অনুরূপ একটি মামলায় জয়ী হন ১৮৭৬ সালে।[৬৬] ললিত-মোহিনী নামে আর-এক কুলীন স্ত্রী মামলায় স্বামীর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এ অর্থ দিয়ে অন্যান্য কাজের মধ্যে ললিতমোহিনী এক ব্যক্তিকে তাঁর বাল্যবিবাহ-বিরোধী একটি গ্রন্থের জন্যে একটি পুরস্কার প্রদান করেন।[৬৭] স্বামীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় মামলা এখন আর তেমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে না-হতে পারে, কিন্তু আলোচ্য মামলাসমূহ যখন বিচারের জন্যে আসে, সেই যুগে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার ধারণা প্রায় অসম্ভব কল্পনা বলে বিবেচিত হতো।[৬৮] বস্তুত, সেকালে কুলীন স্ত্রীদের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ ছিলো, সারা বছর চরকায় সুতো কেটে কিছু অর্থ উপার্জন করে, তা দিয়ে স্বামীকে আকৃষ্ট করা—যাতে সে এসে বছরে অন্তত একবার এক রাতের জন্য দেখা দেয়।[৬৯]

৬৩. যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী, 'কৌলীন্য প্রথা', **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ১৯৬। ক্ষীরোদা মিত্র ও সারদা দেবীর প্রবন্ধের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

৬৪. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪৩৯, ৪৫৮।

৬৫. **বামাপ**, আষাঢ় ১২৭৭, পৃ. ১১১।

৬৬. **বামাপ**, আশ্বিন ১২৮৩, পৃ. ১২০।

৬৭. **বামাপ**, পৌষ ১২৯৮, পৃ. ২৮৫।

৬৮. কৃষ্ণভাবিনী দাস, **ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা**, পৃ. ১৮৪।

৬৯. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯১-৯২।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে কুলীন কন্যারা কুলীন বহুবিবাহ সম্পর্কে কেমন সচেতন হয়ে ওঠেন, তার একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত ঢাকার বিধুমুখী। ১৮৭০ সালে তাঁর পিতৃব্যরা এক কুলীনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ঠিক করেন। এ কুলীনের আগে থেকেই ১২/১৩টি স্ত্রী ছিলো। বিধুমুখী সামান্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বহুবিবাহকারী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে তাই তিনি তাঁর মাতুলদের অনুরোধ করেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি কলকাতায় পালিয়ে যান এবং সেখানে ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাস তাঁকে আশ্রয় দেন। তাঁর হতাশ ও ক্রোধান্ধ পিতৃব্যরা এতে তাঁর মাতুলদের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা করেন। বিধুমুখী আদালতে নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন এবং মামলায় জয়ী হন।[৭০] দুর্গামোহন দাস ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের কথামতো তিনি লেখাপড়া শিখতে থাকেন। তিনি সম্ভবত কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৭৪ সালে রজনীনাথ রায় নামক এম. এ. উত্তীর্ণ এক ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।[৭১] রজনীনাথ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কম্‌ট্রোলার হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পদে উন্নীত হন।[৭২] বহু বিবাহকারী এক কুলীনের স্ত্রী, বরং বলি উপপত্নী, হওয়ার পরিবর্তে তিনি এভাবে তাঁর জীবন ও ভাগ্যকে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তন করেছিলেন।

সমাজসংস্কারকগণ নিজেরাও বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন, ফলে ১৮৫০-এর দশকেই তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। নিম্নের পীঠিকা থেকে দেখা যাবে, সেকালে শিক্ষিত পরিবারেও বাল্যবিবাহ কী ব্যাপক মাত্রায় প্রচলিত ছিলো :

পীঠিকা ৭

নাম	বিবাহের সময় বয়স	স্ত্রীর বয়স
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪/১৫	৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৪	৮
রাজনারায়ণ বসু	১৭	১১
কেশবচন্দ্র সেন	১৮	৯

৭০. বামাপ, কার্তিক ১২৭৭, পৃ. ২১১; মাঘ ১২৭৭, পৃ. ৩১৩।
৭১. বামাপ, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ৩১।
৭২. বামাপ, বৈশাখ ১৩০৩, পৃ ৩০।

নাম	বিবাহের সময় বয়স	স্ত্রীর বয়স
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭	৭
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৪	
রমেশচন্দ্র দত্ত	১৬	
শিবনাথ শাস্ত্রী	১২/১৩	১০
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী		৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১	৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকর	১৯	৮

উৎস: সাহিত্য সাধক চরিতমালা ও অন্যান্য

বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে একবার সচেতন হওয়ার পর থেকেই সমাজসংস্কারকগণ এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭০-এর দশকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশ জাতীয়তাবোধের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করায় এই আন্দোলনের গতি খানিকটা মন্থর হয়। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এ সময়ে রচিত তাঁর একটি উপন্যাসের চরিত্র ইন্দিরা বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব খানিকটা প্রতিফলিত হয়। ইন্দিরার সংলাপটি এরকম: 'যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি?'[৭৩]

ভদ্রলোকদের একাংশের মনোভাবে এ ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও, শিক্ষিত মহিলারা বাল্যবিবাহকে মোটেই সমর্থন করেন নি। আসলে বাল্যবিবাহের কুফল তাঁরাই তো বেশি ভোগ করতেন। সম্ভবত বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে তাঁরা এতোই সচেতন হয়েছিলেন যে, এর পক্ষে তাঁরা আর কিছু লিখতে পারেন নি।

পুনরায় কৈলাসবাসিনী দেবীর কথাই উল্লেখ করতে হয়। তিনিই মহিলাদের মধ্যে সবার আগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন যে, মহিলা ও সমাজের শোচনীয় অবস্থার মুখ্য কারণ হলো বাল্যবিবাহ। তাঁর মতে বাল্যবিবাহ হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কখনোই যথার্থ সমঝোতার ভিত্তিতে স্থাপিত হতে পারে না। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর বারম্বার ঝগড়া থেকে আরম্ভ করে স্বামীর পক্ষে লম্পট হওয়া পর্যন্ত সবই সম্ভব।

৭৩. বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (পঞ্চম সং; কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৮), পৃ. ৩৭৪।

তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, প্রথম যৌবনে উপনীত স্বামী-স্ত্রীর সন্তান হলে সে সন্তান অবশ্যই স্বল্পায়ু এবং রুগ্ন হয়, এরকম স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভেঙে যেতে পারে। তা ছাড়া প্রসবকালে স্ত্রীর পক্ষে মারা যাওয়া সম্ভব এবং যেহেতু বড়ো সংসারের আয় নির্বাহের দায়িত্ব অল্পবয়সী স্বামীর ওপর অর্পিত হয়, সে কারণে এ ধরনের সংসার স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যগ্রস্ত হতে বাধ্য। তিনি আরো বলেন, শিশুদের মৃত্যুর হারই সবচেয়ে বেশি বলে বাল্যবিবাহের ফলে বালবৈধব্য বৃদ্ধি পায়। সেকালে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে স্ত্রীদের সম্পর্ক প্রায়শ খারাপ হতো। কৈলাসবাসিনী দেবীর মতে, এটাও প্রধানত বাল্যবিবাহের কুফল। উপসংহারে তিনি বলেন, বালবৈধব্যের এবং বহুবিবাহের সমস্যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না-করলে দূর করা সম্ভব হবে না।[৭৪]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সারদা দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী এবং মানকুমারী বসুসহ বহু মহিলাই বাল্যবিবাহ প্রথার নিন্দা করেন। তবে তাঁরা কমবেশি একই ধরনের যুক্তি দেখান। পীঠিকা ৫-এ আগেই আমরা লক্ষ করেছি যে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেও বাল্যবিবাহের সমস্যা বেশ গুরুতর ছিলো। সম্ভবত এ জন্যেই অতো বেশি সংখ্যক মহিলা বাল্যবিবাহ নিরোধ করার পক্ষে বারংবার ওকালতি করেন। বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন যেহেতু ঐতিহ্যিক সমাজকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মতো প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে নি, সে জন্যেই জাতীয়তাবোধের উদ্ভব সত্ত্বেও, এ আন্দোলন রুদ্ধ হয় নি। সত্য বটে ভদ্রলোকদের প্রধান অংশই সহবাস সম্মতি বিল সমর্থন করেন নি কিন্তু তা বাল্য-বিবাহের প্রতি সমর্থনহেতু নয়, বরং এ কারণে যে, বহিরাগত সরকারের সহায়-তায় ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা অনুচিত --ভদ্রলোকেরা এই নতুন মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে।[৭৫] বস্তুত, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা উভয়ের কাছেই অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত হয়।

সমাজসংস্কার আন্দোলনে মহিলাদের আংশিক সাড়া

মহিলারা সেকালে সামান্য শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। সুতরাং পুরুষরা যে সব সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ নেন নি, মহিলারাও-যে সে সব প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উৎসাহ দেখান নি —এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো

৭৪. **হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা**, পৃ. ৩৪, ৩৭-৪৩, ৪৫।

৭৫. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

না। উল্টো, বরং তাঁদের সংস্কারের উৎসাহ পুরুষদের অনুসরণে পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক মহিলারা যদি বিবাহ সংক্রান্ত আইনসমূহের সংস্কার এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণয়নের দাবি করতেন, তা হলে তাঁদের অনেক অসুবিধা ও দুঃখ হয়তো দূরীভূত হতো এবং পরিবারে তাঁদের মর্যাদাও হয়তো খানিকটা বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তাঁরা এমন আন্দোলনের কথা ভাবেন নি। ইংরেজ মহিলারা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সম্পত্তিতে বিবাহিত মহিলাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করেন। তাঁরা এ নিয়ে আদালতে মামলা করেন, পার্লামেন্টে দরখাস্ত প্রেরণ করেন এবং প্রস্তাবিত বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন সম্পর্কে জনমত গঠন করেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ১৮৭০ সালে প্রস্তাবিত আইন-সংক্রান্ত বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে ১৮৮৭ সালে এই আইন প্রণীত হয়। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইনও অনুরূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু মহিলা-সংস্কারকদের ঐকান্তিক ও দীর্ঘকালের প্রযত্নের ফলে ১৮৫৭ সালে এ আইন প্রণীত হয়। তারপর ১৮৫৮, ১৮৮৪ ও ১৮৯৬ সালে উপর্যুপরি সংশোধনের মাধ্যমে মহিলাদের কাছে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়।[৭৬] বাঙালি হিন্দু মহিলাদেরও সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিলো না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আন্দোলন করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু বিবাহ ও পারিবারিক আইন ভারত স্বাধীন হওয়ার ৯ বছর পরে ১৯৫৬ সালের আগে পর্যন্ত প্রণীত হয় নি; অথচ প্রায় সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতার আলোকে সংস্কার করার আন্দোলন করেছিলেন। এ থেকেই ইংরেজ মহিলাদের তুলনায় বাঙালি মহিলাদের সচেতনতার অভাব অনুধাবন করা যায়। বস্তুত, আলোচ্যকালে পুরুষরা যা অনুগ্রহ করে তাঁদের দান করেন, বাঙালি মহিলারা তা-ই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অন্তত পুরুষশাসিত সমাজে উচ্চতর মর্যাদার জন্যে তাঁরা সে সমাজের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি।

৭৬. R. Strachy, pp. 73-76.

উপসংহার

বাঙালি মহিলাদের "মুক্তির" আন্দোলন শুরু করেন পুরুষরা। সুতরাং, সত্যিকার অর্থে, এ আন্দোলন পুরুষদের শাসন থেকে নারীদের পুরোপুরি স্বাধীন করার আন্দোলন ছিলো না। উল্টো, বরং বলা যায়, পুরুষরা অংশত তাঁদের নিজেদের জগৎকে আধুনিক করে তোলার জন্যেই এ আন্দোলন শুরু করেন। পাশ্চাত্য ধারণার দ্বারা যাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই পুরুষরা মহিলাদের হীনদশা এবং স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের অপকৃষ্ট অবস্থা সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হয়ে ওঠেন। মহিলারা-যে নিরক্ষর এবং বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী বর্জিত, এবং তার ফলে স্বামীদের সমাজ-জীবনের সাফল্য ও গৌরবের শরিক হওয়ার অনুপযুক্ত--এ-ও পুরুষরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ ধরনের অসম্পূর্ণতার একটি উপলব্ধি ছাড়াও, তাঁরা মহিলাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেন। কারণ, তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সতীদাহ, বালবিধবাদের বাধ্যতা-মূলক ব্রহ্মচর্য, কুলীন বহুবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রথার দরুন মহিলারাই নিপীড়িত হন। তাঁরা এ সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কার করার এবং শিক্ষা দান করে মহিলাদের উন্নততর স্ত্রী ও মাতায় পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে-ছিলেন। মহিলাদের অধিকতর গুণ সম্পন্ন সঙ্গিনীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের সমাজ-জীবনকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য, পুরুষরা মহিলাদের অবরোধ প্রথাও ভাঙতে আরম্ভ করেন। সুতরাং পুরুষরা-যে মহিলাদের উন্নতির জন্যে তৎপর হন সে কেবল মহিলাদের মঙ্গলের জন্যেই নয়, বরং একই সঙ্গে তাঁরা নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণতার কথাও বিবেচনা করেন।

কিন্তু মহিলারা যখন কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেন এবং, ফলত, নিজেদের জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু নতুন ধারণা অঙ্গীকার করেন, তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বেরও খানিকটা বিকাশ হয়। এই সব কিছুই স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের ভূমিকা ও মর্যাদা অংশত পরিবর্তিত করে। এতে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী পুরুষরা মহিলাদের সমালোচনা করতে শুরু করেন এবং এরূপ পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। এমন কি পাশ্চাত্য-প্রভাবিত "প্রগতিশীল" ব্রাহ্মদের একাংশ যাঁরা এ যাবৎকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে ওকালতি করে আসছিলেন, তাঁরাও এখন মহিলাদের সনাতন প্রথা-বিরোধী অ-রক্ষণশীল ব্যবহারের প্রতি, তাঁদের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পুরুষদের এই আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তনের কারণ এই যে, তাঁরা চেয়েছিলেন সংস্কারের দ্বারা মহিলাদের কিছু মাত্রায় আধুনিক করে তুলতে। কিন্তু, তাঁরা এটা আগে থেকে অনুধাবন করতে পারেন নি যে, এই সংস্কারের ফলে মহিলারা একদিন তাঁদের ওপর পুরুষদের আধিপত্যকেই চ্যালেঞ্জ করবেন। বস্তুত, সামান্য মাত্রায় হলেও, মহিলাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ লক্ষ্য করে পুরুষরা সচকিত হয়ে ওঠেন। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে আধুনিকাদের ব্যবহার ও পরিবারের মধ্যে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। কারণ, স্ত্রীদের নিকট থেকে অন্যদের প্রত্যাশিত আচরণধারা ও ভূমিকা এবং স্ত্রীদের প্রকৃত আচরণধারা ও ভূমিকার যথেষ্ট পার্থক্য রচিত হয়েছিলো। শিক্ষাদান ও অবরোধ মোচন করার পর "স্বাধীন" মহিলাদের ঐতিহ্যিক ব্যবহারধারা ও মূল্যবোধ অপরিবর্তিত থাকবে—সমাজসংস্কারকগণের এ আশা ছিলো অবাস্তব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অধিকাংশ ভদ্রলোকই এমন আশা পোষণ করেছিলেন। এতে, একদিকে, সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তির প্রতিই পুরুষদের মনোভাব বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে; অন্যদিকে, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক অস্বাভাবিক চাপের সম্মুখীন হয়।

ফলস্বরূপ, নারীমুক্তি আন্দোলন বাধা প্রাপ্ত হয় এবং বহু পরিবারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নতুন মূল্যবোধের ওপর স্থাপিত ও কঠোরভাবে পরিবর্তিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিলিয়ান পালিতের কথা উল্লেখ করা যায়। লিলিয়ান ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।* তিনি প্রথম স্বামীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এটা তখনো পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে রীতিমতো অদ্বিতীয় ঘটনা ছিলো। এর আগেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিশ্চয় অসংখ্য বার সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং তার ফলে হয় স্বামী স্ত্রীকে "আচ্ছা শিক্ষা" দিয়ে "সোজা" করেছে; নয়তো চিরদিনের জন্যে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছে। কুলীন স্ত্রী স্থায়ীভাবে প্রথমে বাপের সংসারে এবং পরে বড়ো ভাইদের সংসারে বাস করবে— এ ছিলো স্বীকৃত নিয়ম। কিন্তু কিঞ্চিৎ আধুনিকায়নের ফলে স্ত্রীর মনোভাবের এবং পরিবর্তন তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সে আর নীরবে স্বামীর অন্যায় ও অসম ব্যবহার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। সে তাই স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার, এমন কি তাঁকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবতে শুরু করেন।

নারী মুক্তি বিষয়ে "মোহভঙ্গ" ছাড়াও, জাতীয়তাবোধের উদ্ভব আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যায়ন উভয়ের প্রতি ভদ্রলোকদের মনোভাবকে কঠোর করে তোলে।

*তারকনাথ পালিতের কন্যা ছিলেন লিলিয়ান।

আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া বাইরে থেকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য থেকে আরোপিত একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য হয়। ফলস্বরূপ নারীমুক্তিসহ সমগ্র সমাজসংস্কার আন্দোলনই বিপর্যস্ত হয়। ১৮৬০ ও ১৮৭৩-এর দশকে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অবরোধ মোচনের কয়েকটি চমকপ্রদ, এমন কি, দুর্বিনীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও, তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ, যিনি যৌবনে অত্যাধুনিক ও ফ্যাশন দুরস্ত বলে পরিচিত হন, তিনি ১৮৮০ বা ১৮৯০-এর দশকে অবরোধ মোচনে তাঁর অগ্রজদের অনুসরণ করেন নি। বস্তুত, তিনি ঐতিহ্যের সঙ্গে এতো বেশি আপোশ করেন যে, তাঁর স্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর তুলনায় অর্ধেকও "স্বাধীন" হতে পারেন নি। তা ছাড়া, তিনি কন্যাদের কোনো প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সর্বোপরি, তিনি কন্যাদের খুবই কম বয়সে বিয়ে দেন, যদিও সত্যেন্দ্রনাথ তা করেন নি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন)।

মনোভাবের এ জাতীয় পরিবর্তন মহিলাদের মধ্যেও লক্ষণীয়, বিশেষ করে রাজনীতিরত মহিলাদের মধ্যেও এমন মহিলাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হলেও, তাঁদের পরিবর্তন হয়েছিলো নিঃসন্দেহে। জাতীয়তাবাদী পুরুষদের মতোই এ মহিলারাও ঐতিহ্যের দিকে তাকান সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। উদাহরণস্বরূপ সরলা দেবীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটেছিলো নিশ্চিতভাবে এবং এক সময়ে তাঁর চিন্তাধারাও ছিলো বৈপ্লবিক। বিবাহের প্রস্তাব এলে তিনি পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের পছন্দ করা পাত্রকে বিবাহ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে তিনি এমন একজন মধ্য-বয়সী বিপত্নীককে বিবাহ করতে সম্মত হন, যাকে তিনি বিবাহ-আসরের আগে কখনো দেখেন নি। এই ভদ্রলোক-যে একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ছিলেন এটা সরলা দেবীকে এতোই মুগ্ধ করে যে, ভদ্রলোক-যে দোজবরে এ-ও তিনি আমলে নেন নি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ভারতীয় বহুবিবাহ প্রথার পক্ষেই ওকালতি করেন। তিনি বলেন, 'সকলে পারে না, কিন্তু যদি কেউ পারে, তবে কি সেটা দোষের? একটা সমগ্রজাতি যদি পারে তবে সে জাতি কি নিন্দনীয়?'[১] তদুপরি, তিনি নিজে একটি কট্টর একেশ্বরবাদী পরিবারে জন্মে থাকলেও এবং সেই পরিবেশে লালিত পালিত হলেও, তিনি তাঁর স্বামীর পরিবারে প্রচলিত প্রতিমাপূজা সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করতে রাজি হন।[২] এমন চরম দৃষ্টান্ত না-হলেও, জ্ঞানদানন্দিনী

১. সরলা দেবী, **জীবনের ঝরাপাতা**, পৃ. ১৮৫, ১৮৯।
২. ঐ, পৃ. ১৯২-৯৩।

দেবী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের মধ্যেও এ ধরনের আপোশমূলক মনোভাব লক্ষ্য করি। প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, ১৯০৮ সালে স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে হারানোর পর কৃষ্ণভাবিনী হঠাৎ ঐতিহ্যের দিকে খুব ঝুঁকে পড়েন।[৩]

জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে নারী মুক্তির উদার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হলেও, যে-মহিলারা আংশিকভাবে "মুক্ত" বা "স্বাধীন" হয়েছিলেন, তাঁরা আর পর্দার অন্তরালে ফিরে যেতে অথবা কেবল সাংসারিক ভূমিকা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতার যে-আস্বাদ পেয়েছিলেন, তা-ও তাঁরা বিসর্জন দিতে পারলেন না। এর ফলে এই স্বাধীনচেতা মহিলা ও পুরুষদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই মহিলারা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন।

আলোচ্য মহিলারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে যতোটা আধুনিক হয়ে ওঠেন, আজকের দিনে নারী স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তার তুলনায় তা ছিলো নিতান্তই নগণ্য; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহিলাদের যে-অবস্থা ছিলো, তার সঙ্গে তুলনা করলে তাকে অবশ্যই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হয়। এ মহিলারা-যে মোটামুটি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁরা-যে নতুন ধারণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরা-যে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা-যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে খানিকটা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্জন করেছিলেন, তাঁরা-যে নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা-যে ধর্ম সম্পর্কে "সংস্কৃত" ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেন, তাঁদের সামাজিক সম্পর্ক-যে খানিকটা বিবর্তিত হয়, তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক-যে মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো সংকটের সম্মুখীন হয়, তাঁরা-যে মহিলাদের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপনে সফল হন এবং তাঁরা-যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন– এ সবই প্রমাণ করে যে, মাত্রা যতোটুকুই হোক না কেন, তাঁরা আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। আধুনিকায়ন সর্বত্র সমানভাবে না-হলেও এবং কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক মহিলা ও জীবনের কেবল কয়েকটি দিকই

৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আমার প্রবন্ধ: 'বঙ্গদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ: কৃষ্ণভাবিনী দাস,' **জিজ্ঞাসা**, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৯), প. ১২৮-৪৩।

আধুনিকতার স্পর্শ পেলেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এর ফলে নিজেদের সম্পর্কে শিক্ষিত মহিলাদের ধারণা এবং অন্যদের চোখে তাঁদের ভাবমূর্তি উভয়ই পাল্টে যায়। এর ফলে ভদ্রলোকদের এই স্ববিরোধিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিকে তাঁরা নতুন ধারণা গ্রহণ করতে এবং সেই ধারণার আলোকে নিজেদের জীবনধারা পরিবর্তন করতে তৈরি ছিলেন; আবার, অন্যদিকে, নিজেদের পরিবার ও মহিলাদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিলো যথেষ্ট রক্ষণশীল।

সেকালে মহিলাদের পক্ষে নিজেদের প্রণয়, স্ব স্ব স্বামীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখা অশালীন বলে গণ্য হতো। সুতরাং এটা বিস্তারিতভাবে বলা শক্ত যে, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া পরিবারের গণ্ডিতে মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবন কতোটা প্রভাবিত করেছিলো। অবশ্য ঐতিহ্যিক মহিলারা আধুনিকাদের তীব্র সমালোচনা করে যা লেখেন তা থেকে মনে হয় যে, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিলো। আধুনিকারা যৌনতা সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর জন্যে প্রযোজ্য দ্বৈত মানকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেন। ফলে পুরুষদের বহুবিবাহের রীতি এবং বিবাহাতিরিক্ত যৌন সম্পর্ক উভয়কেই এই মহিলারা নিন্দা করেন। সমান অধিকার না-চাইলেও, এখন তাঁরা ব্যাপকতর অধিকার প্রত্যাশা করছিলেন। নিম্নের দুটি অনুচ্ছেদের মতো রচনা পূর্ববর্তী মহিলাদের পক্ষে লেখা অসম্ভব ছিলো এবং এ থেকে আধুনিকাদের যে-সামগ্রিক পরিবর্তন হয়েছিলো, তা প্রতিবিম্বিত হয়।

> ১. শিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা উপাধি গ্রহণে ব্যস্ত ও নিজ নিজ সুখ অন্বেষণেরত; পিঞ্জরাবদ্ধ বঙ্গবাসিনীদের নিঃশব্দ অশ্রুপাত তাঁহাদের চক্ষু আকর্ষিতে অক্ষম। আজ যদি আমরা, যেমন ইংরাজ মহিলারা পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা ও গোলযোগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম; আজ যদি আমরা স্ত্রীলোকের অবলা ও নগ্র নাম বিসর্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপনে না রাখিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে চীৎকারস্বরে কোলাহল করিতাম; তাহা হইলে হয়ত বঙ্গবাসীদের কর্ণ আমাদের যন্ত্রণা রবে আকৃষ্ট হইত।[৪]
>
> ২. সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

৪. কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, পৃ. ৩০০-০১।

> পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।...উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[৫]

আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সূচনাতে মহিলারা সেই পুরুষদের কাছেই "মুক্তির" জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের শিকল পরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অন্তত কিছু সংখ্যক মহিলা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হন। তাঁরা তাই মহিলাদের উন্নতির জন্যে ক্ষুদ্রাকারে হলেও একটি আন্দোলন শুরু করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এবং সরলা দেবী মহিলাদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে যে-প্রযত্ন করেন, তা থেকে এ বিষয়ে মহিলাদের অধিকতর সচেতনতা প্রকাশ পায়। তা ছাড়া, রোকেয়ার মতো স্বল্প সংখ্যক মহিলা এ-ও অনুভব করেন যে, মহিলারা যদি তাঁদের জীবিকার জন্যে পুরোপুরি পুরুষদের ওপর নির্ভর করেন, তা হলে তাঁদের কখনোই "মুক্ত" করা যাবে না। পূর্ববর্তী দু-একজন মহিলা, যাঁরা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রোকেয়ার পার্থক্য এই যে, তিনি কেবল শিক্ষকতা ও চিকিৎসাবৃত্তির মতো তথাকথিত অভিজাত পেশাকেই মেয়েদের পক্ষে উপযোগী বলে মনে করেন নি, বরং, তাঁর মতে, কৃষিকাজ ও ব্যবসাও তাঁদের পক্ষে সমান উপযোগী।[৬] এই ধরনের সচেতনতা থেকেই বঙ্গদেশে "ফেমিনিজ্‌ম্‌"-এর সূচনা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা যদি মহিলাদের দ্রুত আধুনিকায়নের আনুকূল্য না-ও করে থাকে, তা হলে অন্তত ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা তা করেছিলো। দেশ বিভাগের ফলে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত কলকাতায় গমন করেন। এ সময়ে ভদ্রলোকদের ওপর, বিশেষ করে বাস্তুত্যাগীদের ওপর অর্থনৈতিক সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়। তা ছাড়া, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার অভূতপূর্ব বিকাশ হয়। বাংলাদেশের প্রধানত চাকুরিজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর

৫. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', রোকেয়া-রচনাবলী, পৃ. ২৯৩০।
৬. ঐ, পৃ. ৩০।

ওপর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে। বাস্তবিকই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বেশ কিছু মুসলমান মহিলা উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এ ধরনের পরিবর্তনের মুখেই, মহিলাদের আধুনিকায়নের প্রতি সহজাত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, ভদ্রলোকরা মহিলাদের উচ্চ-শিক্ষা ও চাকুরি নেওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ, এই মহিলাদের মধ্যে পর্দা প্রথাই যে পুরোপুরি লুপ্ত হয়, তাই নয়, কর্মজীবী মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের ভূমিকা পুনর্নির্ধারিত হয়। তদুপরি, প্রথম বারের মতো, মহিলারা তাঁদের পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। অবশ্য, এ সব সত্ত্বেও, সন্দেহ হয়, পুরুষরা মহিলাদের আদৌ সমান বলে মনে করেন কি না এবং মহিলারাও সে রকম দাবি করেন কি না।

পরিশিষ্ট এক

বাঙালি মহিলাদের আধুনিকায়ন এবং ঠাকুর পরিবার

বাঙালি মহিলাদের অগ্রগতির জন্যে গোড়ায় উনবিংশ শতাব্দীতে যখন কাজ শুরু হয়, তখন খুব অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এ আন্দোলনে অবদান রাখেন নি। মহিলাদের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন যদি একটি মাত্র পরিবারের নাম উল্লেখ করতে হয়, তাহলে তা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। নিম্নের আলোচনা থেকে দেখা যাবে মহিলাসহ ঠাকুর পরিবারের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বাঙালি মহিলাদের অগ্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এদের "স্বাধীনতা"র আদর্শ কেমন ছিলো, এ আলোচনা তার প্রতিও আলোকপাত করবে।

সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ঠাকুর মহিলাদের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও,[১] এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সবকটি কন্যাকে শিক্ষা দিলেও, সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম অন্তরের সঙ্গে মহিলাদের আধুনিকায়নে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি মহিলাদের এমন "স্বাধীনতা-"র দাবি করেন, যা সম্ভবত অর্ধশতাব্দী পরেও বঙ্গদেশে অজ্ঞাত ছিলো।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে লণ্ডনে (১৮৬২-৬৩) শিক্ষা লাভ করেন।[১ক] তিনি ১৮৬৩ সালের জুন মাসে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং অতঃপর বৎসরাধিক কাল চূড়ান্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন।[১খ] ১৮৬৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি আহমেদাবাদে (বোম্বাই-এর নিকটবর্তী) সহকারী জাজ হিশেবে কার্যে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য.   ।

১ক. তিনি ১৮৬২ সালের মে মাসে লনডন পৌঁছেন এবং লনডন থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে।

১খ. মোট ১৮৯ জন প্রার্থীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ৪৩তম স্থান অধিকার করেন। মোট পঞ্চাশজন প্রতিযোগীকে সিবিল সার্বিসের জন্যে নির্বাচিত করা হয়।

১৮৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।[২] বোধ হয় বেশির ভাগ সময়ে বঙ্গদেশের বাইরে কাটানোর জন্যেই তিনি সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করেন নি। মহিলাদের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান সম্পর্কে বঙ্গদেশীয় লোকেরা আরো কম জানেন।

বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন যে, তিনি অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন:

> আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে বন্দেখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হ'ত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।... এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত।[৩]

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আরো প্রবল হতে থাকে। ইংলণ্ডে পুরুষ ও মহিলারা কেমন স্বাধীনভাবে একত্রে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে অংশ গ্রহণ করেন এবং পারিবারিক জীবনে মহিলাদের কী চমৎকার একটা প্রভাব থাকে—সত্যেন্দ্রনাথ তার বিবরণ দিয়েছেন। তদুপরি, তিনি বহু বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলাকে দেখতে পান যাঁরা তাঁদের সমগ্র সময় ও শক্তি সমাজের কল্যাণকাজে ব্যয় করেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, ইংরেজ মহিলাদের তুলনায় বাঙালি মহিলাদের জীবন কতো খর্বিত। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিকূলতার জন্যে বাঙালি মহিলারা তাঁদের মন এবং বুদ্ধি কোনোটাই বিকশিত করতে পারেন না।[৪]

ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে-চিঠিপত্র লেখেন, তা থেকে বোঝা যায় তিনি নিপীড়িত বাঙালি মহিলাদের জন্যে কী গভীর সহানুভূতি বোধ করতেন:

> ইংলণ্ডে এখন এতদিন থাকিয়া ইহা একপ্রকার বাড়ির মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পূর্বাপেক্ষা কত বলপূর্বক মনে আঘাত করে।

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইত্যাদি, পৃ. ৫-১৬।

৩. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, (দ্বিতীয় সং; কলকাতা: বৈতানিক ১৯৬৭), পৃ. ৫।

৪. ঐ।

তিনি আরো লেখেন:

> এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে সৌভাগ্য এখনো অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবন-উদ্যানের পুষ্প তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণবিশীর্ন করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা।[৫]

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সমাজসংস্কারকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, এই সমাজসংস্কারকগণ প্রায়শ অন্যের জন্যে সংস্কারে উপদেশ দিতেন আর নিজেদের পরিবারসমূহ যদ্দুর সম্ভব ঐতিহ্যের কাছাকাছি রাখতেন। অপর পক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ যা বলতেন তা বাস্তবে পালনও করতেন। তিনি জানতেন যে, বদান্যতা নিজের ঘর থেকেই শুরু হয়। পূর্বোক্ত চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ আরো লিখেছিলেন: 'আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে,' অবশ্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেন যে, 'তোমার আপনার উপরই তাহার অনেক নির্ভর করে।'[৬]

একবার সচেতন হওয়ার পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ এই চিন্তায় নিবিষ্ট হন যে, কী করে সংস্কারের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে আধুনিক করে তুলতে পারেন। তক্ষুণি যে-সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতে পারলেন, তা হলো, স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী (সংক্ষেপে জ্ঞানদা) দেবীকে বিলেতে পাঠানোর জন্যে পিতাকে অনুরোধ জানানো। তিনি ভেবে দেখেন যে, ইংলণ্ডে এলে জ্ঞানদা সহজেই লেখাপড়া শিখতে এবং বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী আয়ত্ত করতে পারবেন। জ্ঞানদানন্দিনী ইংলণ্ডে যাবেন—এর জন্যে তিনি-যে কতো প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন, তা বোঝা যায় মাস দুয়েক পরে ১৮৬৪ সালের জানুআরি মাসে স্ত্রীকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে। এই পত্রে তিনি এমন আশা ব্যক্ত করেন যে, ইংলণ্ডে গেলে জ্ঞানদানন্দিনী দারুণ উপকৃত হবেন:

৫. জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র পত্র, সংখ্যা ২ (১৬.১১.৬৩). পুরাতনী. পৃ. ৪৬-৪৭।

৬. ঐ. পৃ. ৪৬।

> তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্তি ও উন্নতির এতটুকু স্থান নাই। তুমি এদেশে আইস, তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে।[৭]

তিনি জ্ঞানদাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন:

> আমার তাহাতে কিছুই স্বার্থপরতা নাই, আমি কেবল তোমার হিতের জন্যই লিখিয়াছি।...আমি এখন কেবল বাবা মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।... তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রী হৃদয়কে সহস্রগুণে বলবান কর,...। তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্ত ততই উপকার করিতে পারিবে।[৮]

সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন যে, একজন বাঙালি মহিলার পক্ষে ইংলণ্ডে যাওয়া সহজ ছিলো না, কারণ বাঙালি মহিলার পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, আচার-ব্যবহার, লজ্জা-ভয় এবং অন্যান্য বহু জিনিশ প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং তিনি চিঠির মাধ্যমে বারবার জ্ঞানদাকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে থাকেন এবং এই বলে আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাঁর ভ্রমণ হবে নিরাপদ এবং তাঁর ইংলণ্ড বাস হবে উপভোগ্য। 'তুমি ইংলণ্ডে আসিলে তোমার আপনার যে কত উন্নতি হইবে তাহা তুমি আপনি জান না।'[৯] পরের মাসে তিনি পুনরায় লেখেন: 'তুমি এ দেশে আইস, তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে।'[১০]

জ্ঞানদানন্দিনী ইংলণ্ডে যেতে সম্মত হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ অন্তত সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজি হন নি। এ জন্যেই জ্ঞানদানন্দিনীর ইংলণ্ড যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। হতাশ সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন:

> তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবা মহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চির-জীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ রাখি। আমি ত তাই বুঝিতে পারি

৭. পত্র সংখ্যা ৫ (১৮ ২.১৮৬৪), **পুরাতনী**, পৃ. ৫৩।
৮. পত্র সংখ্যা ৩ (৩.১১.৬৩) **পুরাতনী**, পৃ. ৪৯-৫০।
৯. পত্র সংখ্যা ৪ (১৮.১.৬৪) **পুরাতনী**, পৃ. ৫১।
১০. পত্র সংখ্যা ৫, **পুরাতনী**, পৃ. ৫৩।

না বাবামশাইয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে তোমার শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকেরা উন্নত ও স্বাধীন হইলে সমাজ যে কত উৎকৃষ্টভাব ধারণ করে, ইংলণ্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। তুমি যদি ২৫ বছর অন্তঃপুরে যেমন আছ এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বৎসর আসিয়া ইংলণ্ডে যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ডের দুই বৎসর অন্তঃপুরের ২৫ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইবে।[১১]

তাঁর পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ নিরাশ এবং দুঃখিত হন। অবশ্য স্ত্রীকে আধুনিক করে তোলার এবং তাঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে অর্থবহ করে তোলার আশা তিনি ত্যাগ করেন নি। ইংলণ্ড থেকে ফেরার পর তিনি স্ত্রীকে পশ্চিম ভারতে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে যান। এর ফলে স্ত্রীকে পৈতৃক বাড়ি থেকে কর্মস্থলে না-নিয়ে যাওয়ার জনপ্রিয় রীতি ভঙ্গ হয়। তিনি স্ত্রীর পোশাকের সংস্কার করেন এবং তাঁকে শিক্ষা দান করতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি অবরোধ প্রথা সংক্রান্ত দেশাচারসমূহ একটির পর একটি করে ভাঙতে থাকেন। এই ঘটনাসমূহের কোনো কোনোটি এখন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু এ সব সমসাময়িক সমাজে যথেষ্ট হৈচৈ-এর সৃষ্টি করেছিলো। জ্ঞানদানন্দিনী-যে কলকাতায় ফেরার সময়ে জাহাজ থেকে নেমে গাড়িতে করে জোড়াসাঁকোয় যান, তিনি-যে প্রথা-বিরুদ্ধ পোশাক পরিধান করেন, তিনি-যে গবর্নর-জেনারেল প্রদত্ত এক ভোজ সভায় যোগদান করেন, তিনি-যে ইংলণ্ডে যান এবং তিনি-যে বাড়ির নিজস্ব নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন,—এ সবই তাঁর আত্মীয়দের রাগান্বিত এবং অন্যদের সমালোচনামুখর করে।[১২] কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যেহেতু অন্য মহিলাদের সামনে তাঁর স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিশেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেজন্যে জ্ঞানদা পর্দা প্রথার সঙ্গে যুক্ত দেশাচারসমূহ একে একে অগ্রাহ্য করতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথের সামাজিক অবস্থান ছিলো খুব উঁচুতে। তা ছাড়া তিনি স্বাধীন ও যথেষ্ট আয়ের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তিনি

১১. পত্র সংখ্যা ৮ (২.৭.৬৪), **পুরাতনী**, পৃ. ৫৮-৫৯।
১২. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

সমাজের সমালোচনা তোয়াক্কা করতেন না এবং বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের রীতিনীতি মেনে চলতেও বাধ্য ছিলেন না।

অবরোধ মোচনই যদি সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র লক্ষ্য হতো তা হলে তাঁর নারীমুক্তির আদর্শকে সাহসী বলা গেলেও সীমিত প্রকৃতির বলতে হতো। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিলো অনেক বিস্তৃত। সেকালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অপ্রতুলতা বিষয়ে বহু সমাজসংস্কারকই নিশ্চয় সচেতন হয়ে থাকবেন, কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতি ঠিক কেমন ছিলো, তা জানার উপায় নেই; কেননা, হয় এ বিষয়ে তাঁরা আদৌ কিছু লেখেন নি, নয়তো এ জাতীয় রচনা এখন লুপ্ত। সৌভাগ্যক্রমে, স্ত্রীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে আমরা স্পষ্ট-ভাবে জানতে পারি, সেকালের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিলো। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়েও তাঁর মনোভাব আলোচ্য চিঠিপত্র থেকে জানা যায়।

স্ত্রীকে লেখা তাঁর একটি পত্রে তিনি বাঙালিদের বিবাহিত জীবন এভাবে অঙ্কন করেন:

> আমাদের দেশের আচারের বল অত্যন্ত অধিক—প্রত্যেকের নিজের শক্তি অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল দুর্দশার মূল। রোজ এক মুষ্টি আহারে উদর পূরণ করা—তাহার পর ঘটা করিয়া বিবাহ করা—তারপর ছেলেপিলে হলো তো আর কে গোলযোগ করে। বালিকা ভার্যা গৃহিণী হইলেন—আর তাহার কি করিবার অবশিষ্ট আছে? এইরূপে ঘরকন্না লইয়া এক রকম করিয়া দিনটা চলে গেলেই হলো।...আর অন্য কিছু করিবার চিন্তাও আবশ্যক থাকে না।[১৩]

সত্যেন্দ্রনাথ এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে এই দুর্দশার কারণ সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাসমূহের অপরিসীম প্রভাব এবং পুরুষ ও মহিলাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিশেবে বাস করতে পারার অক্ষমতা। অবশ্য আধুনিক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় বিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কবিষয়ক তাঁর আদর্শ ছিলো ভিন্ন ধরনের। তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে তিনি স্ত্রীকে লেখেন:

> আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীনপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা তাই সত্য কিনা? যদিও আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব

১৩. পত্র সংখ্যা ২, পুরাতনী, পৃ. ৪৭।

> কি। যে পর্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা জান—আমি বাবা-মহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ, ফলিবার জন্য, উপযুক্ত সরস জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপুরের প্রাচীর মধ্যে শুষ্কপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।. . . . বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যা দান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন। আমরা যখন আপনারা স্বাধীনপূর্বক নূতন প্রেমের সহিত বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করিতে পারিব, তখন সুখী হইব না?[১৪]

কোনো বাঙালির পক্ষে পিতা কিংবা স্ত্রীকে এভাবে লিখতে পারা সেকালে নিতান্ত অসাধারণ বলে গণ্য হতো। এটা সন্দেহের বিষয় যে, পঞ্চাশ বছর পরেও, তাঁর বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথসহ, কেউই স্ত্রীকে এ সব লেখার কথা ভাবতে পারতেন কি না। সমসাময়িক অন্যান্য সমাজসংস্কারকের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর নারীমুক্তির আদর্শকে স্পষ্টত স্বতন্ত্রধর্মী বলে মনে হয়। কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ মহিলাদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বাইরে থেকে তাঁদের অবরোধ মোচন করে এবং সাধারণ শিক্ষা দিয়ে। অপরপক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের মুক্ত করতে চান ভেতর থেকে, স্বাবলম্বী করে। তিনি-যে তাঁর স্ত্রীকে কেবল ভালো শিক্ষাই দিয়েছিলেন, তাই নয়, স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশেও তিনি সহায়তা করেন। তাঁর অজেয় প্রযত্নের দ্বারাই তাঁর নিরক্ষর ও বৈদগ্ধবর্জিত স্ত্রীকে পরবর্তীকালের সুসংস্কৃত মহিলায় পরিণত করেন। ১৮৬৮-৬৮ সালে তিনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় স্ত্রীকে যে-পত্রাদি লেখেন, তা থেকে দেখা যায় যে, জ্ঞানদা কী কী বই পড়ছেন এবং জনৈক ইংরেজ মহিলার কাছে নিয়মিত পাঠ নিচ্ছেন কি না, এ বিষয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারভাবে উদারনীতিতে বিশ্বাসী,—সুতরাং তাঁর বিশ্বাস ও কর্মে কোনোরূপ অসমাঞ্জস্য ছিলো না। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কিত আদর্শে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিলো এবং তিনি এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য সংস্কারকগণের সঙ্গে তাঁর আর একটি পার্থক্য এই যে, তিনি নারীমুক্তির পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি-যে স্টুআর্ট

১৪. পত্র সংখ্যা ৩, পুরাতনী, পৃ. ৪৮-৪৯।

মিলের *Subjection of Women* গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন,[১৫] তা থেকেই এটা বোঝা যায়।

স্ত্রীকে আধুনিক করে গড়ে তুলে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে নারীমুক্তির প্রতি তাঁর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আবার জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও যেভাবে নতুন ধারণা গ্রহণ এবং সেই ধারণা অনুসারে নিজেকে পরিবর্তিত করার জন্যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা-ও সমান উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহ হয় মাত্র সাত বছর বয়সে। সে সময়ে তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তখন কন্যা এবং পুত্রবধূদের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। তাই এঁদের শেখানোর জন্যে বৈষ্ণবী এবং ইংরেজ মহিলাদের নিয়োগ করা হয়েছিলো। সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথও জ্ঞানদাসহ আলোচ্য মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে সহায়তা করেন। এই পারিবারিক পরিবেশেই জ্ঞানদার সামান্য লেখপেড়া শুরু হয়। তবে তিনি লেখাপড়া শেখায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ১৮৬৪ সালের শেষভাগে সত্যেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পর। তখন তিনি ইংরেজি ভাষার কেবল সামান্য কিছু শব্দ জানতেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যে শুধু ভালো ইংরেজি ও বাংলা শেখেন, তাই নয়, তিনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন এবং রীতিমতো সাংস্কৃতিক গুণান্বিত মহিলা হিশেবে পরিচিত হন। তিনি মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষাও শিখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি যখন ফ্র্যান্সে যান, তখন সামান্য ফরাসি ভাষাও শেখেন।[১৬]

পত্রাকারে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা-য় ১৮৭১ সালে।[১৭] পরে ভারতী-র মতো উঁচু মানের পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়।[১৮] তা ছাড়া তিনি ১৮৮৫-৮৬ সালে বালক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

স্ত্রীশিক্ষা এবং সমাজসংস্কার বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি বর্তমানকালে কিছু ঐতিহ্যিক বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সে যুগে এ সব রচনায় আধুনিকতার অভাব ছিলো না।

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনভাবে লিখেছেন যেন সত্যেন্দ্রনাথকৃত আলোচ্য অনুবাদ ১৮৬৮ সালের আগেই প্রকাশিত হয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি, পৃ. ২৮); এ অনুবাদ আদৌ প্রকাশিত হয়েছিলো কি না সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। মিলের গ্রন্থটি ১৮৬৮ সালের আগে প্রকাশিত হয় নি।

১৬. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১৭. 'বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদ', বামাপ, কার্তিক ১২৭৮। লেখাটিতে তাঁর নাম অবশ্য উল্লিখিত হয় নি।

১৮. ভারতীতে, তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে।

জীবনধারায় এবং মনোভাবে তিনি ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকের আলোকিত কোনো-মহিলার চেয়ে কম আধুনিক ছিলেন না। তিনি-যে নির্বিচার পাশ্চাত্যায়নের সমর্থন করেন নি, তার কারণ রাজনীতি সচেতন ভদ্রলোক সমাজই তখন মনোভাবের দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী এবং পাশ্চাত্যবিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি-যে কেবল সীমিত মাত্রায় নারীমুক্তির জন্যে ওকালতি করেছিলেন এবং সন্তান লালন, গৃহকর্ম ও রান্নাবান্নাকেই মহিলাদের প্রধান ভূমিকা বলে গণ্য করেন,[১৯] তার কারণ, তখনো বাঙালি মহিলাদের সচেতনতা feminism-এর পর্যায়ে উপনীত হয় নি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর স্বামীকে সাহায্য করেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অবরোধ মোচন করতে অথবা তাঁকে স্বাধীন নারীর দৃষ্টান্ত হিশেবে দাঁড় করাতে পারতেন না। নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে প্রতিপন্ন করেন।[২০] তিনি-যে মহিলাদের ক্রিয়াকলাপে একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন, তা-ও ছিলো খুব প্রশংসনীয়। সে যুগের মহিলাদের জন্যে তিনি একটি শালীন পোশাকের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মহিলাদের মধ্যে ব্লাউজ ও পেটিকোট প্রচলন করেন। বাঙালি মহিলাদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে সমাজসংস্কারকগণ যখন আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন বামাবোধিনী পত্রিকা-র মাধ্যমে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পাঠিকাদের জানান যে, যে-কেউ চাইলে তিনি "সংস্কৃত-পোশাকে"র বিষয়ে পরামর্শ দেবেন এবং এ পোশাকের আলোকচিত্র পাঠাবেন। শাড়ি পরিধান করার বর্তমান ভঙ্গিও জ্ঞানদা প্রচলন করেছিলেন। এখন একে বড়ো কোনো সংস্কার বলে মনে না-ও হতে পারে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মহিলাদের পোশাক আদৌ বাইরে যাওয়ার অথবা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে পরার উপযুক্ত ছিলো না, – এ কথা বিবেচনা করলে তাঁর অবদানকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয়।[২১]

সামাজিক মনোভাবের দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বেশ রক্ষণশীল ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের ওপর তাঁর প্রভাবও ছিলো অপরিসীম। সুতরাং ঠাকুর পরিবারে অবরোধ প্রথা কম বেশী কঠোর নিয়মের সঙ্গে পালিত হতো। তা সত্ত্বেও, সত্যেন্দ্রনাথ এ পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা ও পর্দা প্রথা বিষয়ে কিছু সংস্কার

১৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: 'স্ত্রীশিক্ষা', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮।

২০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪৪), পৃ. ৬৭-৬৮।

২১. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট তিন।

চালু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তত ১৮৭০-এর দশক নাগাদ তাঁদের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে অবরোধের কড়াকড়ি খানিকটা হ্রাস পায়। বস্তুত, তাঁর প্রভাবে তাঁর কমবয়সী আত্মীয়দের অনেকেই নরম ও উদারপন্থী মনোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গোড়াতে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক হিশেবে হাতেখড়ি দেন কিঞ্চিৎ জলযোগ নামে একটি প্রহসন রচনা করে। এই প্রহসনে তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী পুরুষ এবং "স্বাধীন" নারী উভয়কে ব্যঙ্গ করেন। তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। উৎসাহবশত তিনি কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে তীব্র আক্রমণ করেন। এ প্রহসনে তিনি কেশবচন্দ্রের নাম দেন পতিতপাবন সেন এবং তাঁর নারীমুক্তি বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করেন। এ প্রহসনে তিনি স্বাধীন নায়িকা ও তার স্বামীর যে চিত্র অঙ্কন করেন, তা-ও কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক লক্ষণাক্রান্ত ছিলো না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বস্তুত তাঁর প্রহসনের মাধ্যমে এটাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে, নারীস্বাধীনতা ভালো নয়।[২২]

কিন্তু বড়ো ভাই-এর দৃষ্টান্ত দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্রুত পাল্টে যান। তিনি নিজেই বলেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি এ বিষয়ে কেমন উদার হয়ে ওঠেন।[২৩] এ কারণেই, যথেষ্ট জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রহসনটি দ্বিতীয়বার আর মুদ্রণ করেন নি। তদুপরি, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অবরোধ প্রথার এতো বিরোধী হয়ে ওঠেন যে, স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে যেতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তিনি কলকাতার জনবহুল রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। চারদিকের লোকেরা স্বভাবতই অবাক বিস্ময়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।[২৪]

বাহ্যত তাঁর বৈপ্লবিক আচরণ সত্ত্বেও, তিনি কখনো সত্যেন্দ্রনাথের মতো আন্তরিকভাবে উদার হতে পারেন নি, --একথা অবশ্য উল্লেখ করা শ্রেয়। কলকাতার রাস্তায় স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালেও, তিনি স্ত্রীকে ভেতর থেকে কখনো "স্বাধীন" করে তোলার চেষ্টা করেন নি। সুতরাং সত্যিকার অর্থে তাঁর স্ত্রী কখনো স্বাধীন হতে পারেন নি। কাজী আবদুল ওদুদসহ কোনো কোনো লেখকের

২২ কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশব সেনের ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক খুব তিক্ত ছিলো।

২৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮।

২৪. ঐ।

মতো, কিঞ্চিৎ জলযোগ প্রহসনের নায়ক পূর্ণচন্দ্রের মতোই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও একটি বিবাহাতিরিক্ত প্রণয় সম্পর্ক ছিলো। প্রহসনের নায়িকা বিধুমুখী তার স্বামীকে শুধু আত্মহত্যা করার হুমকী দিয়েছিলো, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেন।[২৫] বস্তুত তখন মহিলারা প্রত্যেকটি বিষয়েই পুরুষদের ওপর এতো নির্ভরশীল ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব না-হলেও শক্ত কাজ ছিলো। তাঁদের সামান্য শিক্ষা দান করা এবং অবরোধ থেকে খানিকটা মুক্ত করা শিক্ষিত নগরবাসীদের মধ্যে তখন ফ্যাশন হয়ে উঠেছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সত্যেন্দ্রনাথের অন্য এক ছোটোভাই হেমেন্দ্রনাথও সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে জোড়াসাঁকোয় থাকতেন না। সুতরাং পরিবারের মহিলাদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারতেন না। সে দায়িত্ব অনেকাংশে হেমেন্দ্রনাথের ওপরই অর্পিত হয়। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে নিরক্ষর মহিলা এবং বালিকাদের জন্যে একটি পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেন। এই পাঠ্যক্রম অনুসারে, তাঁদের কেবল লেখাপড়াই শেখানো হতো না, সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গীত ও নৃত্যের পাঠও দেওয়া হতো।[২৬] কলকাতার সেকালের বেশীর ভাগ বালিকা বিদ্যালয়ে সূচীকর্ম শেখাতো, কিন্তু সঙ্গীত-নৃত্য তখনও তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে মহিলাদের আধুনিকায়নে রবীন্দ্রনাথের অবদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি উদারনৈতিক ধারণাসমূহ স্বীকরণ করেন নি, ইংরেজ সমাজের দ্বারাও তিনি প্রভূত

২৫. কী কারণে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন, তা স্পষ্ট জানা নেই। সম্ভবত সন্তানহীন জীবনে স্বামীর অবহেলাই এর কারণ। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, **রবীন্দ্রজীবন**, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৩-২০, ১৯৪-৯৭; সুব্রত রুদ্র, **কাদম্বরী দেবী** (কলকাতা: আশা প্রকাশনী, তারিখ নেই), পৃ. ২১-২৪; চিত্রা দেব, **ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল**, পৃ. ৭২-৭৪।

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **আর্ট রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা**, যত্রতত্র। ক্ষিতীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথের পুত্র। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী সেকালে সাংস্কৃতিক গুণান্বিতা মহিলা হিশেবে সুপরিচিত হন।—দ্রষ্টব্য: চিত্রা দেব, **ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল**, পৃ. ৮৯-৯২, ৯৪-১০০।

পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে ১৮৭৮-৭৯ সালে তিনি যখন প্রথমবার ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি যে-চিঠিপত্র লেখেন এবং ১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যে-রোজনামচা লেখেন উভয় থেকেই বোঝা যায়, ইংরেজ সমাজ এবং সে সমাজে মহিলাদের স্বাধীনতা দৃষ্টে তিনি কতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত একটি পত্রে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর মনোভাব এভাবে ব্যক্ত করেন:

> মেয়েপুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাইত স্বাভাবিক। মেয়েরা ত মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তাঁদের সমাজের একাংশ করে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেলামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজবিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা অসমাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে।...এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।[২৭]

তাঁর এ মন্তব্যাদি কিছু অকালপক্ক হলেও তিনি এ অনুচ্ছেদে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থতার অবকাশ নেই। সত্যেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে তাঁর স্ত্রীকে যে-চিঠিপত্র লিখেছিলেন এ অনুচ্ছেদ পাঠকদের সে গুলিকেই মনে করিয়ে দেয়। ইংরেজ সমাজে মহিলাদের মর্যাদা এবং নর-নারীর সম্পর্ক দৃষ্টে অন্তত সে সময়ে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতামহ রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়রা ১৮ বছরের "রবি" কে এমন পত্রাদি লিখতে দেখে সচকিত হয়ে পড়েন। বস্তুত, তাঁর পিতা তাঁকে শীঘ্রই ইংলণ্ড থেকে ফিরিয়ে আনেন।[২৮]

পরবর্তীকালে পরিণত রবীন্দ্রনাথ আর অতো "বৈপ্লবিক" ছিলেন না বটে, কিন্তু তবু তিনি মহিলাদের আধুনিকায়নের সপক্ষে লিখতে থাকেন। তাঁর লেখায় তিনি একদিকে বাঙালি মহিলাদের অসম্মান ও হীনাবস্থার কথা চিত্রিত

২৭ 'য়োরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র', ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৬, পৃ. ৩৫৮।
২৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

করেন এবং এভাবে তাঁদের প্রতি পাঠকদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পান; অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে চিত্রিত মহিলারা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যিক। নিষ্ঠুর দেশাচারের দ্বারা তারা নিপীড়িত। তারা নীরবে গুরুজনদের ন্যায়-অন্যায় আদেশ মেনে চলে এবং সকল অসম্মান নীরবে মেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথের এ সব রচনায় বাল-বিধবার শোচনীয় অবস্থা,[২৯] একান্নবর্তী প্রথার নিপীড়ন,[৩০] বহুবিবাহ প্রথা,[৩১] এবং বাল্য বিবাহের কুফলের[৩২] চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কথাও বলা হয়েছে।[৩৩] অশিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলী-বর্জিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। কঠোর অবরোধ প্রথার চিত্রও উপন্যাসের বহু স্থানে বিধৃত। তাঁর কোনো কোনো নায়িকা দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারে না অথবা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ করতেও পারে না। এ সব চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথের পাঠক সেকালের দেশাচারসমূহের সমালোচনা না-করে পারেন না।

অবশ্য তাঁর শেষ দিকের রচনায় পাঠক উল্টো দিকের চিত্রও দেখতে পান। এ সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকাদের ছবি এঁকেছেন। তাঁর শেষ দিকের নায়িকারা ব্যক্তিত্ব এবং জীবন ও জগতের প্রতি মনোভাবে সত্যিই ভিন্নধর্মী। তাঁর চিত্রিত পটভূমিও অন্য রকম। প্রধানত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলেও, এই মহিলারা যথেষ্ট পরিণত এবং নিজেদের কথা নিজেরাই ভাবতে সক্ষম। এরা এই প্রথম বারের মতো শোবার ঘর ও রান্নাঘর থেকে বৈঠকখানায় বেরিয়ে এসে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং ভাবের আদান-প্রদান করতে আরম্ভ করে। তারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিশেবে চিত্রিত এবং আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখে যা রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

২৯. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হলো: মোহিনী ('করুণা', ১৮৭৭-৭৮), কুসুম ('ঘাটের কথা', ১৮৮৪), সোনামণি ('অতিথি' ১৮৯৫) দামিনী ও ননীবালা (চতুরঙ্গ, ১৯১৬), কুসুম ('ত্যাগ', ১৮৯২), এবং শৈলবালা (প্রজাপতির নির্বন্ধ, ১৯১১)।

৩০. 'দেনাপাওনা' (১৮৯১), 'ত্যাগ' (১৮৯২), 'অপরিচিতা' (১৯১৪), 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) ইত্যাদি।

৩১. দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মধ্যবর্তিনী' (১৮৯৩) গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়।

৩২. যে বালবিধবাদের কথা ৩১ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে, তারা ছাড়াও কুমু ('দৃষ্টি দান', ১৮৯৯), শশিমুখী (গোরা, ১৯১০), 'কঙ্কাল' (১৮৯১) গল্পের নায়িকা ইত্যাদির শিশু বয়সে বিবাহ হয়।

৩৩. অসুস্থ হয়ে পড়ার পর 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার কোনো চিকিৎসা পর্যন্ত হয় নি।

মোহিনী, শৈল, কাদম্বিনী এবং সোনামণির[৩৪] মতো প্রথম দিককার বিধবাদের তুলনায় বিনোদিনী, দামিনী, ননীবালা, মঞ্জুলিকা এবং সোহিনীর[৩৫] মতো বিধবা নিঃসন্দেহে ভিন্ন ধরনের। শেষ দিকের বিধবারা খুব ঐতিহ্যিক নয়, যেমন নয় বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের বালিকাবধূরা। নিরুপমা এবং বৃন্দাবনের স্ত্রী নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে এবং পরিণতিতে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়।[৩৬] এই অত্যাচারে তাদের আদৌ কোনো কষ্ট হয়েছিলো কি না, বলা যায় না। কুসুম, হৈমন্তী এবং বিনুও[৩৭] একান্নবর্তী প্রথার শিকার। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালই একমাত্র ব্যতিক্রম। মৃণাল একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের অসুখী সদস্য। এই পরিবারে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রতি মুহূর্তে ব্যাহত। পরিণতিতে সে এই অত্যাচার সহ্য করতে অস্বীকার করে। ১৫ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর, সে তার স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে এবং নিজেকে দেখতে পায় উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে, যেখানে সে তার দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস করতে পারে।[৩৮] রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গল্প ও কবিতায় একান্নবর্তী প্রথার নিন্দা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হওয়ার কারণ— এ গল্পের নায়িকা মৃণালের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে বাঙালি মধ্যবিত্তদের বহু-যত্নে-লালিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথ এমন বলিষ্ঠ একটি গল্প লিখলেন কী করে। উত্তরে বলা যায়, তিনি সারা জীবনই যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তবে শেষ জীবনে, বিশেষ করে ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর, তিনি অধিকতর সাহসী হন। এই পর্যায়েই তিনি কথ্য বাংলায় ও নতুন ছন্দে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন এবং বলিষ্ঠ সামাজিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। সবুজপত্র প্রকাশের পর দু-তিন বছরের মধ্যে তিনি 'স্ত্রীর পত্র' 'হৈমন্তী' এবং 'অপরিচিতা' ছোটো গল্প গুলি, চতুরঙ্গ এবং ঘরে বাইরে উপন্যাস দুটি এবং বলাকার কবিতাসমূহ রচনা করেন।

৩৪. বিনোদিনী (**চোখের বালি**, ১৯০৩), দামিনী ও ননীবালা (**চতুরঙ্গ**), মঞ্জুলিকা ('মঞ্জুলিকা', **পলাতকা**, ১৯১৮), এবং সোহিনী ('ল্যাবরেটরি', ১৯৪০)।

৩৫. কাদম্বিনী ('জীবিত ও মৃত', ১৮৯২)।

৩৬. বৃন্দাবনের স্ত্রী ('সম্পত্তি সমর্পণ', ১৮৯১)।

৩৭. বিনু ('ফাঁকি', **পলাতকা**)।

৩৮. S. N. Ray, 'Variations on the theme of individuality ; Hinduism, The Bengal Renaissance and Rabindranth Tagore', **The Visva Bharati Quarterly**, Vol. 41, Nos. 1—4 (May, 1976-Apr., 1976), p. 208.

রবীন্দ্রনাথ নিজেই খুব বড়ো একটি যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একজন সংবেদনশীল মানুষ হিশেবে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রথা ব্যক্তির ওপর কী অত্যাচার করে। এরূপ যৌথ পরিবারে মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। আগেই আলোচিত হয়েছে কিভাবে তাঁর স্ত্রী জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে যেতে এবং প্রথমে শিলাইদহ ও পরে শান্তিনিকেতনে বাস করতে বাধ্য হন।[৩৯] তাঁর মৃত স্ত্রী যে-অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সে কথা মনে করেছিলেন এবং সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই একই সঙ্গে তাঁর পরিবার ও বাঙালি সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন।

অবরোধ প্রথার প্রতি তাঁর শেষ দিকের নায়িকাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সাহসী। এদের কেউ কেউ বস্তুত অবরোধ সংক্রান্ত সকল আইন ভঙ্গ করে। এরা বেপরোয়া যুবতী— অবাধভাবে এরা বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং এমন কি, যৌন বিষয়েও আলোচনা করে। প্রসঙ্গত বিভা, কেতকী, সুরীতি, সোহিনী এবং নীলার কথা মনে করা যেতে পারে।[৪০] এলা অতীনকে কিভাবে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে এবং নিহত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিক আবেগে কিভাবে তার বক্ষ নগ্ন করে, তা ও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।[৪১] সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার আচরণ ছিলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রথাবিরুদ্ধ। সোহিনী এবং নীলার আচরণও কম প্রথাবিরুদ্ধ নয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ এ সব চরিত্রই এঁকেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দশকে। প্রকৃত পক্ষে, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, দ্রুত নগরায়ণ হেতু শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের জীবন ধারায় কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনই সমসাময়িক সমাজের চিত্র বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেন। তাঁর জীবনের শেষ দশকে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অত্যাধুনিকতার পরিচয় দেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন। অতিশয় ফ্যাশন দুরস্ত ২৩ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ১১ বছর বয়স্ক একটি নিরক্ষর এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলী বর্জিত বালিকাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। তাঁর আত্মীয়রা অবশ্য এ বালিকাকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা তাঁর পুরোনো ধাঁচের নামটি পর্যন্ত পরিবর্তন করেন। এ বালিকাবধূ বাংলা এবং সংস্কৃত, এমন কি,

৩৯. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪০. বিভা ('রবিবার', ১৯৩৯), কেতকী (শেষের কবিতা, ১৯২৯), সুরীতি ('প্রগতিসংহার', ১৯৪১) সোহিনী ও নীলা ('ল্যাবরেটরি', ১৯৪০)।

৪১. চার অধ্যায়, ১৯৩৪।

খানিকটা ইংরেজিও শেখেন। একবার তিনি নাট্যাভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন।[৪২] কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে তাঁর প্রত্যাশিত সঙ্গিনীকে হয়তো পান নি। বিয়ের আগে তিনি বোম্বাই-এর আনা তরখরের[৪৩] মতো সাংস্কৃতিক গুণান্বিত মহিলাকে কাছ থেকে জেনেছিলেন। তা ছাড়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিভা দেবীকে তো নিজেদের সংসারেই দেখেছিলেন। পুরোপুরি পিতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন সেজন্যে, অথবা তাঁর তখনো ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় নি সেজন্যে, তিনি এ বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাছাড়া, মেয়েদের বাল্য বয়সে বিয়ে দেওয়ার দেশাচারকেও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর প্রথম দিককার অধিকাংশ নায়িকাই বাল্যকালে বা বয়ঃসন্ধিকালে বিবাহিত। এই মেয়েরা স্বভাবতই অশিক্ষিত এবং বিবাহপূর্ব প্রেম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁর গোরা (১৯১০) উপন্যাসের নায়িকা সুচরিতা অবশ্য শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণান্বিত। এমন কি, সে বিবাহপূর্ব প্রণয়ে লিপ্ত। সর্বোপরি, তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং সে পরিণত ব্যক্তির মতো কথাবার্তা বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে মাত্র ১৭/১৮ বছর বয়সী বলে উল্লেখ করেন।[৪৪] তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে **প্রবাসী** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তার বয়স ১৪/১৫ বলে উল্লেখ করেন।[৪৫] একই উপন্যাসের ললিতাকেও বেশ পরিণত বলে মনে হয়, কিন্তু তার বয়স মাত্র ১৩ কি ১৪।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং তাঁর নায়িকাদের বিবাহ-বয়সও বৃদ্ধি পায়। নীচের পীঠিকা থেকে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা হতে পারবে:

৪২. চিত্রা দেব, **ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল**, পৃ. ৭৮।

৪৩. আত্মারাম পাণ্ডুরাং-এর কন্যা আনা ছিলেন দারুণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত। বিলেতে পাঠানোর আগে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্যে আনাদের পরিবারে রাখেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এর ফলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য আদবকায়দা শিখতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই আনার প্রেমে পড়েন এবং আনার নাম দেন নলিনী। সমকালীন ও পরবর্তী বহু কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ 'নলিনী' শব্দটি ব্যবহার করেন।

৪৪. **গোরা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড** (কলকাতা: পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ১৯৬১) পৃ. ৩।

৪৫. **প্রবাসী**, ভাদ্র ১৩১৪, পৃ. ২৭৯।

সারণি ৮

প্রকাশকাল/ রচনাকাল	নায়িকার নাম	রচনার নাম	বিবাহকালীন বয়স/বছর পর্যন্ত অবিবাহিত	মন্তব্য
১৮৮৪	কুসুম	'ঘাটের কথা'	৭	
১৮৯২	সুরবালা	'একরাত্রি'	১১	
১৮৯৫	সোনামণি	'অতিথি'	৫	
১৮৯৯	কুমু	'দৃষ্টিদান'	৮	
১৮৯৯	হেমাঙ্গিনী	'দৃষ্টিদান'	১৫	কুলীনকন্যা
১৯০১	কুড়ানী	'মাল্যদান'	১৬	অপরিণতদেহ
১৯০৩-০৫	হেমনলিনী	নৌকাডুবি	১৭/১৮	ব্রাহ্ম
১৯০৭-১০	সুচরিতা	গোরা	১৭/১৮	ব্রাহ্ম
১৯০৭-১০	ললিতা	গোরা	১৩/১৪	ব্রাহ্ম
১৯১৪	হৈমন্তী	'হৈমন্তী'	১৭	বাংলাদেশের বাইরে মানুষ
১৯১৪	কল্যাণী	'অপরিচিতা'	১৬	বাংলাদেশের বাইরে মানুষ
১৯১৮	দীপালি	'পাত্রপাত্রী'	২৫	সংকর বিবাহজাত কন্যা
১৯২৭-২৮	কুমুদিনী	যোগাযোগ	১৯	
১৯২৮-২৯	লাবণ্য	শেষের কবিতা	২৪/২৫	পাশ্চাত্য প্রভাবিত
১৯২৮-২৯	কেতকী	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৩২-৩৩	ঊর্মিমালা	দুইবোন	ঐ	
১৯৩৪	সরলা	মালঞ্চ	৩০	
১৯৩৪	এলা	চারঅধ্যায়	২৯	

মহিলাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আবেগের চিত্রাঙ্কন করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেকালে সমাজের এই রীতি ছিলো যে, বিবাহ করলে স্বামী তার স্ত্রীর দেহ ও মনের ষোলো আনা অধিকার দাবি করতো এবং স্ত্রীও এই দাবি বিনা বিতর্কে মেনে নিতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের নায়িকারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বলে, এই অধিকারের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। তাঁর নায়িকারা মনে করে, স্ত্রীর অন্তর জয় করে নেওয়ার জিনিশ।

এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে ঘরে বাইরে উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ, রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই সত্যেন্দ্রনাথের মতোই, নিরক্ষর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে একজন য়োরোপীয় মহিলা নিয়োগ করে এবং স্ত্রীর হৃদয় জয় করার প্রয়াস পায়। সে তার বন্ধু সন্দীপের সঙ্গে স্ত্রী বিমলার পরিচয় করিয়ে দেয়। বিমলা দ্রুত সন্দীপের প্রেমে পড়ে এবং এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সহজেই তার সতীত্ব হানি করা সম্ভব হতো। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক দারুণ এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কিন্তু নিখিলেশ সত্যিকারভাবে মানবিক আদর্শ ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সে জানে যে, 'ব্যক্তি নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইলে এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ককে সৃজনশীলভাবে অর্থবহ করে তুলতে চাইলে অবশ্যই ঝুঁকি নিতে হয়।'[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত সকল আধুনিক নায়িকারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত। এই মহিলারা অতৃপ্ত এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্বেষণে লিপ্ত। বিনোদিনী, আনন্দময়ী, সুচরিতা, ললিতা, বিমলা, মৃণালিনী, কল্যাণী, হৈমন্তী, দামিনী, কুমুদিনী, নন্দিনী, এলা এবং সোহিনী[৪৭] সকলকেই এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই মহিলাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। তাদের সবাই গুরুজনদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সমর্থ এবং প্রয়োজনবোধে সে কর্তৃত্ব অস্বীকারও করতে পারে। এভাবে তারা সেই সনাতন মূল্যবোধকেই অস্বীকার করতে পারে যার ওপর গোটা সমাজ দণ্ডায়মান। শেষ পর্যন্ত নীরবে পরাজয় মেনে নিলেও, যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী স্বামীর সঙ্গে শয্যায় যেতে অস্বীকার করে। গোরা উপন্যাসের ললিতা তার পারিবারিক ধর্মকে মেনে নিতেও অসম্মত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ চরিত্রগুলির কোনোটিই ১৯০১ সালের পূর্বে অঙ্কিত নয়, বস্তুত একটি (বিনোদিনী) অঙ্কিত হয় ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে, তিনটি (আনন্দময়ী, সুচরিতা ও ললিতা) ১৯০৭ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে এবং অন্যগুলি ১৯১৪ সালের পরে। এই সাহসী চরিত্রসমূহ চিত্রিত করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বাঙালি মহিলাদের আধুনিকায়নকে প্রভাবিত ও উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই নারীমুক্তির পূর্বশর্ত বিবেচনা করেন। তাঁর চিত্রিত প্রথম দিকের নায়িকারা তেমন শিক্ষিত না-হলেও, শেষ দিকের নায়িকারা

৪৬. S. N. Ray, 'Variations on the theme...', P. 204.

৪৭. আনন্দময়ী, সুচরিতা ও ললিতা গোরা উপন্যাসের, বিমলা ঘরের বাইরে-র কল্যাণী 'অপরিচিতা'-র, কুমুদিনী যোগাযোগের (১৯২৭-২৮) এবং নন্দিনী রক্তকরবী-র (১৯২৪)।

শিক্ষায় অগ্রসর। এই নারীদের কেউ কেউ-যেমন লাবণ্য (শেষের কবিতা) এবং এলার (চার অধ্যায়) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও আছে। এমন কি, ঊর্মিমালা উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে য়োরোপ গমন করে। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে তেমন শিক্ষারই পক্ষপাতী যা ব্যক্তি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। এ কারণেই তাঁর শেষ দিকের নায়িকারা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যতোটুকু পেয়ে থাকুন না কেন, ধারালো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণ বিকশিত চরিত্রের অধিকারী। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত আছে। এলা ও সৌদামিনীর[৪৮] মতো তাদের কেউ কেউ রাজনীতি সচেতন। সেকালের বাঙালি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সোহিনীর বিজ্ঞানমনস্কতাও উল্লেখযোগ্য।

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষিত নায়িকারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধন থেকে ক্রমশ অধিকতর মুক্ত হয়ে ওঠে। প্রথম দিকের নায়িকারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম যা-ই হোক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি খুব অনুগত ছিলো। কিন্তু গোরা উপন্যাসেই প্রথম আনন্দময়ী, সুচরিতা ও ললিতার মতো অন্যথায় যথেষ্ট ধার্মিক নারী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে। তাঁর শেষ দিকের নায়িকারা ধর্মের প্রতি প্রায় উদাসীন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি এই পরিবর্তিত মনোভাবকে নিঃসন্দেহে আধুনিকতার অঙ্গ বলে গণ্য করা যায়।

নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনায়ই প্রথম এমন নর-নারী দেখা গেলো যারা বিবাহ বা অন্যসূত্রে সম্পর্কিত না-হলেও বন্ধু হতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে একত্রে কাজ করতে পারে।[৪৯] তাঁর চিত্রিত বিবাহাতিরিক্ত ও বিবাহ-পূর্ব প্রণয়চিত্রও বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত প্রথম। সবশেষে, তাঁর শেষ দিকের নায়িকাদের একক পরিবারের সদস্য হিশেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এরা স্বভাবতই প্রথম দিকের নায়িকাদের তুলনায় অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

কিন্তু এ সত্ত্বেও যে নারীমুক্তির চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেন, তা আদর্শ-স্থানীয় নয়। তাঁর নারীরা মূলত পুরুষদের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর। সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে তারা প্রধানত ঐতিহ্যিক, কারণ তারা সমসাময়িক কালের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয় নি। তা ছাড়া, এই নারীরা প্রায় সবাই নগর-বাসী হলেও, পর্দা ও শিক্ষা ব্যতীত তাদের জীবনধারায় অন্যত্র নগরায়ণের

৪৮. 'বদনাম', ১৯৪১।

৪৯. M. Ray, **Bengali Women**, p. 48.

ছাপ অত্যন্ত নগণ্য। মহিলাদের প্রথা বিরুদ্ধ পোশাক, সাজগোঁজ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত জীবন ধারার প্রতিও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বিদ্বেষ ছিলো।

তিনি মহিলাদের আধুনিকায়নের প্রতি অবদান রাখলেও, শিক্ষিত মহিলাদের চাকুরি গ্রহণ করার বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি অথবা হয়তো অপছন্দ করতেন। তাঁর নায়িকাদের প্রায় কেউই চাকুরিজীবী নয়।* একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পুরোপুরি নারীমুক্তি চাইলে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আবশ্যিক। ১৮৭০-এর দশকেই জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন যে, জীবিকার জন্যে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না-হলে, মহিলাদের কোনো অপমান ও অসম্মান অথবা শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হবে না।[৫০] ১৮৮০-এর দশকে এই মতবাদের সমর্থনে আরো রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো।[৫১] কিন্তু ১৯৩০-এর দশকেও রবীন্দ্রনাথ এ মতবাদ মেনে নিতে অথবা একে স্বাগত জানাতে পারেন নি। অথচ তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, অর্থবলে বলীয়ান পুরুষরা নিজেদেরকে মহিলাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে এবং বিস্মৃত অতীতকাল থেকেই পুরুষরা তাদের "বাহুবল ও অর্থবল" দিয়ে মহিলাদের ওপর আধিপত্য খাটিয়ে আসছে।[৫২] মহিলাদের "অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের" প্রয়াস এবং "অর্থনীতির ওপর পুরুষদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের" বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম তাঁর মতে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৫৩] বর্তমান দাসত্ব থেকে মহিলাদেব মুক্তির জন্যে ওকালতি না-করে, তিনি "নারীত্ব" কে আদর্শায়িত করেন। "নারীত্ব,' তাঁর মতে ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। তিনি তাই সেই সীতাকে গৌরবান্বিত করেন "যিনি সারা জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে পুরস্কার হিশেবে কেবল দুঃখের পবিত্র মহিমাই অর্জন করেন"।[৫৪]

ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর অনেক অসঙ্গতি ছিলো। তিনি যা লিখেছিলেন,

* শেষের কবিতা, উপন্যাসের লাবণ্য একটি ব্যতিক্রম।

৫০. 'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রী', জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬০, ২৬৫।

৫১. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'স্ত্রী স্বাধীনতা', সোপান, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৮৭৯), পৃ. ১১৫; 'স্ত্রীশিক্ষা', সোমপ্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ ১২৮৯, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত, পৃ. ৫৭৬-৭৭; সিদ্ধেশ্বর রায়, 'লোকসংখ্যা', নব্যভারত, ফাল্গুন ১২৯১, পৃ. ৪৭০।

৫২. R.N. Tagore, **Creative Unity** (London : Macmillan & Co., 1922), p. 162.

৫৩. R.N. Tagore, **Personality** (London : Macmillan & Co.; 1919), p. 181.

৫৪. **Creative Unity**, p. 163.

সব তাঁর নিজের জীবনেই পালন করেন নি। শেষ দিকের রচনায় তিনি বাল্য-বিবাহের দারুন বিরোধিতা করলেও নিজের সবকটি কন্যাকেই অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বড়ো মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ে হয় ১৪ বছর ৮ মাস বয়সে, মেজ মেয়ে রেণুকার ১০ বছর ৮ মাসে, এবং মীরার ১৪ বছর ৬ মাসে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ২১ বছর ২ মাস বয়সে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা করলে দেখা যাবে, সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে স্ববিরোধের পরিমাণ ছিলো অনেক কম।

সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা ইন্দিরার বিয়ে হয় ২৬ বছর বয়সে। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় বেশ কিছু দিন থেকে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরার প্রণয় চলছিলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করার সুযোগও দেন নি। মাধুরীলতার বিয়ে হয় শরৎকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে। শরৎকুমারের বয়স ছিলো মাধুরীলতার দ্বিগুণেরও বেশী এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের কম।[৫৫] সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে যে যুবকের সঙ্গে রেণুকার বিয়ে দেন তার বয়স ছিলো কমপক্ষে রেণুকার আড়াই গুণ। রেণুকার বিয়ে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি বন্ধু জগদীশ বসুকে যা লেখেন তা হলো: 'একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম কর।...ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।'[৫৬] বিয়ের ব্যাপারে তিনি তাঁর কন্যাদের কোনো রকম মতামত নিয়েছিলেন কি না, জানা যায় না। বস্তুত, এই বিয়েগুলি ঠিক করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিন জামাতাকেই তিনি যৌতুক বাবদ নগদ

৫৫. শরৎকুমার চক্রবর্তী ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র। তিনি ১৮৯৪ সালে দুটি বিষয়ে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম এ. উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৬ সালে বি.এল.। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি জামাতা হিশেবে খুবই প্রার্থিত পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জামাতা হিশেবে পাবার জন্যে যে কতোটা ব্যাকুল হয়েছিলেন তা বোঝা যায় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা এবং শরৎকুমারকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে। (প্রিয়নাথ সেনকে পত্রাদির জন্যে দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড এবং শরৎকুমারকে লেখা চিঠিপত্রের জন্যে দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮০।) এক পর্যায়ে শরৎ ও তাঁর আত্মীয়রা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হন, কিন্তু তাঁরা ২০,০০০ টাকা যৌতুক দাবি করেন। ১০,০০০ টাকা দিতে রবীন্দ্রনাথ আগেই সম্মত হয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

শরৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক পরে অবশ্য তিক্ত হয়ে যায়। শরৎকুমার বস্তুত নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করেন।

৫৬. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

অর্থ প্রদান করেছিলেন, তা ছাড়া তিন জনকেই তিনি অর্থ ব্যয় করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করেছিলেন।[৫৭]

তদুপরি কন্যাদের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও দেন নি। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লরেটো স্কুলে লেখাপড়ার জন্যে পাঠানো হলেও, তিনি নিজে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের মতো যথার্থভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি না, সন্দেহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা ১৮৯২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বিএ উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু এ সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সমকালীন সমাজকে তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন,—সম্ভবত সাহিত্যিক হিশেবে তিনি অতো বড়ো ছিলেন বলেই। তাঁর শেষ দিকের লেখায় লাবণ্য, এলা, সরলা, ঊর্মিমালা, সুরীতি, অচিরা, বিভা, সোহিনী এবং নীলার মতো আধুনিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[৫৮] এই চরিত্রগুলোকে আদৌ অবাস্তব বলে আখ্যায়িত করা চলে না, কেননা তিনি এমন উচ্চশিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণান্বিত মহিলা বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নগরে, বিশেষত কলকাতায়, দেখেছিলেন। আজকের বাঙালি মহিলারা অধিকতর আধুনিক। উনবিংশ শতকের অবরুদ্ধ এবং অসম্মানের দিনগুলি এখন প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এ সমাজ পরিবর্তন একদিনে বা একজনের চেষ্টায় হয় নি। অসংখ্য সমাজকর্মীর মহৎ প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালি মহিলারা বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন। মহিলাদের এই আধুনিকায়নে ঠাকুর পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁদের বলিষ্ঠ রচনার মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজকে নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। নারীত্ব এবং রোম্যানটিক প্রণয়ের যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প-উপন্যাসে, নাটক ও কাব্যে অঙ্কন করেন তা শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে এ পরিবারের সদস্যরা নারী-মুক্তির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। গোড়াতে এ সব দৃষ্টান্ত দেখে সাধারণ মানুষেরা চমকে গেলেও, ক্রমশ অধিক সংখ্যক নরনারী এ সব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে থাকেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদম্বরী দেবী, স্বর্ণকুমারী

৫৭. শরৎ বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ অ্যামেরিকায় যান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। তৃতীয় জামাতা নগেন্দ্রনাথ অ্যামেরিকায় যান কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৫৮. ঊর্মিমালা (দুইবোন) এবং অচিরা ('শেষ কথা', ১৯৪০)।

দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিভাদেবীসহ ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন মহিলাও বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিলেন। বাঙালি মহিলারা প্রথমে সসঙ্কোচে এবং পরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একেই অনসরণ করেন।

পরিশিষ্ট দুই

বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৮৬৩-১৯২৩

১৮৫০-এর দশক নাগাদ সমাজ সংস্কারকগণের অনেকেই মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই অবরোধ প্রথা সংক্রান্ত দেশাচার অগ্রাহ্য করার সাহস ছিলো, সেজন্যে মুষ্টিমেয় বালিকাই বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে পেরেছিলেন। এমন কি, যে-বালিকারা এ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো তারাও সামান্যই লেখাপড়া শিখতে পারতো, কারণ দু'তিন বছরের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে যেতো। এই জন্যেই সংস্কারকদের কেউ কেউ বাড়িতে শেখানোর একটি কার্যক্রম গ্রহণ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে শেখা যেতে পারে এমন একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র **মাসিক পত্রিকা** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন ১৮৫৪ সালে। পত্রিকার সূচনায় তিনি বলেন যে, এ পত্রিকা লেখা হবে সচরাচর যে-ভাষায় কথাবার্তা হয় তেমন সহজ ভাষায়, যাতে মহিলারা তা পড়ে সহজেই বুঝতে পারেন। এই সাময়িকীতে প্যারীচাঁদের একাধিক জনপ্রিয় রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো এ দিক দিয়ে পত্রিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পত্রিকাটি মাত্র চার বছর চলেছিলো এবং সেকালের নগণ্য সংখ্যক "শিক্ষিত" মহিলার পক্ষে এ পত্রিকার মান ছিলো খুবই উঁচু।

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ১৮৫৯ সালে। সামাজিক ভাবধারায় গোড়ার দিকে তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে সমাজসংস্কার কার্য আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই একদল যুবককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। তাঁরা প্রবলভাবে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থন করেন এবং সমগ্র হিন্দু বিবাহ-প্রতিষ্ঠানটিই যুক্তি ও সুবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে পুনর্গঠিত করতে চান। এভাবে তাঁরা বাঙালি মহিলাদের দুঃখের বোঝা খানিকটা লাঘব করার প্রয়াস পান। ১৮৬১ সালে তাঁরা সঙ্গত সভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সদস্যগণ সমাজ সংস্কারকে ব্রাহ্ম আদর্শের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করেন।

এঁরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে মেয়েদের তাঁরা আদৌ শিক্ষিতই করতে পারবেন

না, তাঁদেরকে আধুনিক ও "স্বাধীন" করে তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং ১৮৬৩ সালে তাঁরা বামাবোধিনী সভা নামে আর একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিলো। তার মধ্যে একটি ছিলো বামাবোধিনী পত্রিকা নামে মেয়েদের জন্যে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। এ ছাড়া তাঁরা এমন আরো গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন যা বিশেষত মেয়েদের জন্যে উপযোগী হবে। তখন এ ধরনের গ্রন্থাদিব খুব অভাব ছিলো।[১] সাময়িক-পত্রটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে এর পাঠকরা এ পত্রিকা পড়ে বাংলা ভাষা ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, সন্তানপালন, গৃহকর্ম এবং ধর্মসহ নানা বিষয় শিখতে পারেন। এ পত্রিকায় সমাজ সম্পর্কে প্রকাশিত দীর্ঘ আলোচনাসমূহের লক্ষ্য ছিলো মহিলাদের কুসংস্কার, এমন কি, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করার। বামাবোধিনী সভা এই পত্রিকার মাধ্যমে একটি স্ত্রীশিক্ষা পাঠক্রমও চালু করে। এই পাঠক্রমের নাম দেওয়া হয় অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী। পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালের অগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক হন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক হন বসন্তকুমার দত্ত ও ক্ষেত্রমোহন দত্ত।

পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক উমেশচন্দ্র দত্ত তখন ২৩ বছরের যুবক। অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হাবান এবং বাড়ি থেকে দূরে অনাত্মীয়দের মধ্যে বাস করতে শুরু করেন। ফলে তিনি এক ধরনের স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী হন। চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখলেও, তিনি মেধাবী ছাত্র হয়ে ওঠেন। ১৮৫৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[২] এ সময়ে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং তাঁর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গৎ সভার সদস্য হন এবং দু বছরের মধ্যেই বামাবোধিনী সভা সংগঠিত করেন। বস্তুত ত্যাগের আদর্শ নিয়েই তিনি বামাবোধিনী পত্রিকা আরম্ভ করেন। বন্ধুদের তুলনায় তাঁর সুবিধে ছিলো এই যে, তাঁর কোনো পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছিলো না[৩] এবং তিনি খানিকটা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি

১. 'উপক্রমণিকা', বামাপ, ভাদ্র ১২৭০, পৃ. ১।

২. যোগেশচন্দ্র বাগল, উমেশচন্দ্র দত্ত, ইত্যাদি (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৩), পৃ. ৭-৯।

৩. তিনি বিয়ে করেন ২৭ বছর বয়সে। বিয়েব জন্যে এ বয়স তখন খুব বেশি বলে বিবেচিত হতো। তিনি একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন, এ-ও একটি কারণ যার জন্যে তিনি এতো "বেশি" বয়সে বিয়ে করতে পারেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বছর দেড়েক লেখাপড়া শিখেছিলেন।[৪]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, বামাবোধিনী পত্রিকা ছিলো সুপরিকল্পিত। এ পত্রিকায় কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা হতো এবং এর ভাষা ছিলো সহজবোধ্য। ফলে পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার এক হাজার খণ্ড দ্রুত নিঃশেষিত হয়-- বস্তুত দ্বিতীয়বার ছাপতে হয়।[৫] পত্রিকাটি দীর্ঘ ষাট বছর ধরে জনপ্রিয়তার সঙ্গে চালু ছিলো। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর কোনো বাংলা সাময়িকপত্রই এতো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এর নিয়মিত গ্রাহকের সংখ্যা ছিলো পাঁচ থেকে ছ শ। এই গ্রাহকদের অনেকেই ছিলেন মহিলা। আশ্চর্যের বিষয় এঁদের প্রায় অর্ধেকই কলকাতার বাইরে মফস্বলে বাস করতেন।[৬] এ পত্রিকা প্রধানত ব্রাহ্মদের জন্যে প্রকাশিত এবং ব্রাহ্মদের দ্বারা লিখিত হলেও, এর অনেক গ্রাহকই ছিলেন হিন্দু, এমন কি, কিছু সংখ্যক মুসলমান ও খৃস্টান গ্রাহকও ছিলেন। এই পত্রিকা যে ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন করে সমসাময়িক অন্যান্য সাময়িকীর তুলনায় তা সত্যি উল্লেখযোগ্য। এমন কি, এ পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্মীয় রচনায়ও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আক্রমণ করা হতো না। এই বামাবোধিনী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে ভিন্নধর্মী ছিলো। তা ছাড়া, তত্ত্ববোধিনী ছিলো প্রধানত ধর্মীয় পত্রিকা। অপরপক্ষে, বামাবোধিনী-র লক্ষ্য ছিলো সাধারণভাবে সামাজিক সমস্যাদি এবং বিশেষভাবে মহিলাদের আধুনিকায়ন। এ কারণেই এ পত্রিকা অধিকতর পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলো।

যে মহিলারা বিদ্যালয়ে না-গিয়ে লেখাপড়া শিখতে চাচ্ছিলেন, বামাবোধিনী পত্রিকা তাদের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী ছিলো। এ পত্রিকার দ্বারা পরিচালিত অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রমের সহায়তায় বিবাহিত মহিলাসহ বেশ কিছু মহিলা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বস্তুত, যে বালিকারা তখন বিদ্যালয়ে যেতো, তার চেয়ে এই মহিলারা ভালো শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কারণ, বিদ্যালয়ে তখন কেবল পড়তে, শিখতে এবং অল্প কিছু অঙ্ক করতে শেখানো হতো এবং তা-ও শেখানো হতো মাত্র ৩-৪ বছর। বামাবোধিনী পত্রিকা তার পাঠিকাদের ব্যাপকতর ও পূর্ণতর শিক্ষা দানের প্রয়াস পায়। যে-সব বই তাঁদের পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা যে-সব রচনা লিখতেন, তা থেকে মনে হয় অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম যেমহিলারা অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের লেখাপড়ার মান বেশ উঁচু ছিলো।

৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, উমেশচন্দ্র দত্ত, পৃ. ৯-১০।
৫ বামাপ, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৮৯।
৬. বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৬৭-৬৮।

এই পত্রিকায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান এই যে, সে মহিলাদের নিজেদের সম্পর্কিত ধারণাকে উন্নত করতে প্রেরণা দেয়। বামাবোধিনী-র পাতায়ই এর প্রমাণ মেলে। এর অনেক পাঠিকাই এ পত্রিকায় লেখার উৎসাহ পান। এই সব রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে, লেখিকারা অনেকেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। এর পৃষ্ঠায়ই প্রথম আভাস পাওয়া গেলো যে, মহিলারা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করতে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছেন। কোনো কোনো রচনায় সাহসের সঙ্গে তাঁরা দেশাচারসমূহ আক্রমণ করেন, বিশেষ করে পর্দা প্রথাকে; কারণ এই প্রথা তাদের চারদিক থেকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্দী করেছিলো। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে সর্বপ্রথম যে মহিলা-সমিতি কটি স্থাপিত হয় সেগুলো বামাবোধিনীব পাঠিকাদের উদ্‌যোগেই হয়েছিলো। দেশ ও বিদেশের নাম-করা মহিলাদের জীবনী প্রকাশ করে এ পত্রিকা পাঠিকাদের জন্যে অনুকরণীয দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সংক্ষেপে, বাঙালি মহিলাদেব আধুনিকায়নে বামাবোধিনী একটি খুবই গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদর্শ নারীত্ব ও বিবাহ সম্পর্কে এ পত্রিকা অনবরত যে-প্রচার চালায়, তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমন কি, এ পত্রিকা পাঠ করে পুরুষ পাঠকরাও মহিলাদের প্রতি ক্রমশ অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন!

সমাজ সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বামাবোধিনী-র অবদান কোনো অংশে কম নয়। এ পত্রিকা বিধবাদের পুনর্বিবাহ, অযাজকীয় (সিবিল) বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে প্রবল সমর্থন জানায়। তা ছাড়া, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, কন্যাপণ এবং যৌতুক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে। বস্তুত, তখনকার হিন্দুসমাজে যে সব অযৌক্তিক দেশাচার ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো এ পত্রিকা তার সবগুলির বিরুদ্ধেই লড়াই করে। নিয়মিত সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে বামাবোধিনী বঙ্গীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিলো।

অবশ্য বামাবোধিনী-র সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত এর রজত জয়ন্তী সংখ্যায় যে-৫৪ জন প্রধান লেখক-লেখিকার নাম উল্লেখ করা হয়, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম, বিশেষ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম। এই লেখকদের একজনও মুসলমান অথবা খৃস্টান ছিলেন না। অন্য দিক দিয়ে দেখলে এঁদের বেশির ভাগ ছিলেন নগরবাসী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সুতরাং এই পত্রিকার পাতায় যে-মতবাদ প্রকাশিত হয় তা পল্লী অথবা মুসলিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

বামাবোধিনী-র লেখক-লেখিকাগণ যে-রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন, তা অনেকটা মধ্যপন্থী বলে পরিচিত প্রথম দিকের কনগ্রেস সদস্যদের মতো।

তাঁরা এমন মত পোষণ করেন যে, বিধাতার কৃপায়ই ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে বামাবোধিনী জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে এবং সরকারের সমালোচনা শুরু করে। অবশ্য জাতীয়তাবাদী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পত্রিকা অংশত মুসলিম-বিরোধী রূপ নেয়। এর উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অন্য সব বাংলা সাময়িকপত্রের মতোই এ পত্রিকাও, কোথাও কোথাও বেশ অন্যায়-ভাবেই মুসলিম শাসনের নিন্দা করে এবং হিন্দু যুগের একটি গৌরবারোপিত ভাবমূর্তি গড়ে তোলে।

নারীমুক্তিতে নিয়োজিত হলেও মহিলাদের অবরোধ মোচন, প্রথাবিরুদ্ধ পোশাক, চাকুরি এবং পাশ্চাত্যায়নের প্রতি বামাবোধিনী কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে। সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় মহিলারা পর্দার অন্তরালে না পর্দার বাইরে পুরুষদের মধ্যে বসবেন —এই প্রশ্নে ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, তখনই অবরোধ সম্পর্কে বামাবোধিনী-র মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কেশবচন্দ্র সেন চেয়েছিলেন যে, মহিলারা পর্দার অন্তরালে বসবেন। অপরপক্ষে, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, রাখালচন্দ্র রায় এবং অন্য যাঁরা "স্ত্রী স্বাধীনতা দল"-ভুক্ত ছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন যে, মহিলারা পর্দার বাইরে বসবেন। উমেশচন্দ্র কেশবের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে রক্ষণশীল যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, অবরোধ মোচন স্ত্রীস্বাধীনতার অঙ্গ নয়, বরং এটা মহিলাদের স্বেচ্ছাচারেরই প্রমাণ দেয়।

এ সময়ে কয়েক বছর তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন যাতে অবরোধ প্রথাকে অংশত সমর্থন জানানো হয়। মহিলাবিষয়ক তখনকার অন্য একমাত্র সাময়িকী অবলাবান্ধবে-র তিনি এই বলে সমালোচনা করেন যে, পত্রিকাটি বৈপ্লবিক।[৭] যে-মহিলারা কিঞ্চিৎ প্রথাবিরুদ্ধ জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি তাঁদের বিদ্রূপ করেন।[৮] এই রক্ষণশীলতার জন্যে তাঁর বন্ধুরা তাঁর ওপর স্বভাবতই চটে যান। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর পত্রিকার প্রধান লেখক। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি কেশবপন্থী

৭. 'অবলাবান্ধব', বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ৯৬-৯৭।

৮. 'নরনারী', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৩৩৬-৩৮; 'স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি', বামাপ, আষাঢ় ১২৮০, পৃ. ৬৯-৭২; 'বঙ্গমহিলার খেদোক্তি', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬।

এবং গঠনতন্ত্রপন্থী উভয় উপদলের সহানুভূতি হারান। ফলস্বরূপ, *বামাবোধিনী*-র প্রকাশ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং এ সমাজের সহকারী সম্পাদক হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষণায় *বামাবোধিনী* পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।[৯] এবারে এর দৃষ্টিভঙ্গি আবার "প্রগতিশীল" হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাঙালি মহিলাদের জন্যে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। এর মধ্যে *অন্তঃপুর* ছিলো অন্যতম। *অন্তঃপুর* ছিলো পুরোপুরি মহিলাদের রচিত ও সম্পাদিত। কিন্তু *বামাবোধিনী*-র একক কৃতিত্ব এই যে, এই পত্রিকাই প্রথম সাময়িকী যা সম্পূর্ণ মহিলাদের উন্নতির জন্যে নিবেদিত ছিলো। তা ছাড়া এটিই প্রথম সাময়িকী যাতে সর্বপ্রথম মহিলারা নিয়মিতভাবে তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। বস্তুত, বাঙালি মহিলাদের সাহিত্য রচনার প্রাথমিক প্রয়াস খুঁজতে গেলে *বামাবোধিনী*-ই অমূল্য উপকরণ হিশেবে বিবেচিত হবে। প্রকাশের অল্পকাল পরেই *বামাবোধিনী* এর পাঠিকাদের সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। তাঁরা কেবল এ পত্রিকার গ্রাহকই হন নি, অনেকে প্রকাশের জন্যে এ পত্রিকায় চিঠিপত্র ও রচনাদি পাঠাতে শুরু করেন। এ পত্রিকার পাতায় মহিলাদের লেখা চতুর্থ সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে এবং দ্বিতীয় বর্ষ থেকে 'বামারচনা' বলে এতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংযোজিত হয়।

গোড়ার দিকে *বামাবোধিনী*-র লেখিকাদের তেমন আত্মবিশ্বাস ছিলো না এবং রচনাসমূহের মানও উন্নত ছিল না। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিচিত্র বিষয়ে লিখতে শুরু করেন এবং পুরুষদের মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হন অথবা না-ই হন, অন্তত সামাজিক প্রশ্নে অসঙ্কোচে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। বামারচনার এই বিভাগ দ্রুত এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, *অবোধবন্ধু*, *অবলাবান্ধব* এবং *বঙ্গমহিলা*-র মতো সমসাময়িক কয়েকটি পত্রিকা একই নামে অনুরূপ বামারচনা বিভাগ খোলেন। সত্যি সত্যি *বামাবোধিনী* মহিলাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু এবং রাধারানী লাহিড়ীর মতো কয়েকজন মহিলা যারা *বামাবোধিনী*-তে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাঁরা সাহিত্যিক হিশেবে

৯. *বামাবোধিনী*-র কোনো সংখ্যা ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয় ১৫মে ১৮৭৮ তারিখে (জ্যৈষ্ঠের শুরুতে)।

যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বামাবোধিনী-র প্রথম পঁচিশ বছরের ৫৪ জন প্রধান প্রধান লেখক-লেখিকার মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন মহিলা।

বঙ্গীয় রেনেইসান্সের ঐতিহাসিকগণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। এই আন্দোলনের প্রধান অংশই নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে নিয়োজিত হলেও, মহিলারা এ আন্দোলনের প্রতি কতোটা এবং কেমন সাড়া দেন সে সম্পর্কে আলোচ্য ঐতিহাসিকগণ আদৌ কোনো বিবরণ দেন নি অথবা সামান্যই বিবরণ দিয়েছেন। ফলে, বঙ্গদেশের উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস আংশিক এবং অগভীরভাবে রচিত হয়। এ আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের প্রতিক্রিয়া আবিষ্কৃত ও নিরূপিত হলে তবেই পূর্ণতর ও অধিকতর সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা সম্ভব। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে তবেই জানা যাবে এ আন্দোলন মহিলাদের কতোখানি এবং কেমন করে প্রভাবিত করেছিলো। এমন একটি গবেষণার জন্যে বামাবোধিনী অমূল্য উপকরণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, পানাসক্তিসহ সমাজসংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের প্রতি মহিলাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো বামাবোধিনী-র পাতায় তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই মহিলাদের একের মনোভাব অন্যের মনোভাব থেকে বেশ আলাদা ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বিবাহিত মহিলা, অবিবাহিত মহিলা ও বিধবারা, শহরবাসী ও গ্রাম্য মহিলারা, রক্ষণশীল হিন্দু মহিলা ও "প্রগতিশীল" ব্রাহ্ম মহিলারা বিধবা বিবাহের প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাড়া দেন। বঙ্গমহিলা, পরিচারিকা, অবোধবন্ধু, দাসী, অন্তঃপুর ইত্যাদি সমসাময়িক পত্রিকায় মহিলাদের যে-রচনাসমূহ প্রকাশিত হয় সেগুলি বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সঙ্গে তুলনা করে মহিলাদের মনোভাব আরো ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে।

বামাবোধিনী ৬০ বছর ধরে চালু ছিলো। তার মধ্যে ৪৪ বছরই এ পত্রিকা এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হয়।[১০] জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মতো নতুন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার মুখে সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি বাঙালিদের

১০. উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-র সম্পাদনা করেন ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। ১৯০৭ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যুর পরও আরো ষোলো বছর এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বামাবোধিনী সম্পাদনা করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩।

মনোভাব কিভাবে বিবর্তিত হয় এবং সরকারও কিভাবে নতুন রূপ নেয় এ পত্রিকার বিশ্লেষণ তার একক সুযোগ দান করে।

বামাবোধিনী বাস্তবিকই একটি অদ্বিতীয় সামাজিক দলিল। এর ব্যবহার ছাড়া উনিশ শতকীয় বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত মহিলাদের ইতিহাস, পুরোপুরি পুনর্গঠিত করা সম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট তিন

বাঙালি মহিলাদের পোশাক

আধুনিকায়নের পূর্বে বাঙালি মহিলাদের পোশাক ছিলো অতি সরল ও সাধারণ—মাত্র একখানি পাঁচগজী শাড়ি, আর কিছু নয়। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষ-ভ্রমণ সম্পর্কে লেখা ফ্যানি পার্কসের গ্রন্থ থেকে মনে হয়, সেকালে শাড়ি খুবই দামি হতে পারতো, কোনো কোনো শাড়ির পাড় হতো সোনার কাজ-করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাঙালি মহিলারা একমাত্র শাড়িই পরিধান করতেন। ফ্যানি পার্কস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'শাড়ির নীচে অন্য কোনো বস্ত্রই ব্যবহার করা হয় না।'[১] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে এর মিল আছে। তিনি লিখেছেন যে, কেবল শীতকালেই মহিলারা সম্বৎসরের শাড়ির ওপর একটি চাদর পরতেন।[২] অন্য কোনো বস্ত্র অথবা জুতো পরা মহিলাদের জন্যে পুরো-পুরি নিষিদ্ধ ছিলো। জুতোসহ মেয়েদের অন্য কোনো বস্ত্র পরা সম্পর্কে সেকালের লোকেরা-যে কী সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন তা প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা থেকে বোঝা যায়। স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিকায়ন বাঙালি মহিলাদের তাবৎগুণ কিভাবে বিনষ্ট করবে তার বিবরণ দিতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে, আগামী দিনের "আধুনিক" ও "পুরুষালি" মহিলারা হয়তো নিজেরাই ঘোড়ার গাড়ি চালাবেন, চুরুট টানবেন এবং বুট পরবেন।[৩] ঈশ্বর গুপ্ত যদি বা একথা মহিলাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব নিয়েও লিখে থাকেন, তা হলেও একথা সত্যি যে, তখন মহিলাদের গাড়ি চড়া, ধূমপান করা অথবা জুতো পরা নিষিদ্ধ ছিলো। ১৮৬৪ সালের গোড়াতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিলেতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে স্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন, তখন তিনি সহানুভূতির সঙ্গে স্ত্রীর কাছে এই প্রশ্ন রাখেন: 'পায়ে মোজা বা পাদুকা পরিতে কি কোন কষ্টবোধ কর?'[৪]

১. F. Parks, P. 59, 60.

২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, পৃ. ১৪, ২৯।

৩. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৫ (১৮.২.৬৪) পুরাতনী, পৃ. ৫৪।

মহিলাদের জুতো পরার ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তের মতো সত্যেন্দ্রনাথের কোনো সংস্কার ছিলো না। সুতরাং তিনি যা লেখেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তখনকার জনপ্রিয় মনোভাব ছিলো জুতো পরার দারুণ বিরুদ্ধে এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতো অভিজাত পরিবারের মেয়েরাও তখন জুতো পরতেন না। ১৮৬৭ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয় যে, এক চাকরানি একজন য়োরোপীয় মহিলাকে পুরুষ বলে ভুল করে, কারণ এই মহিলার পায়ে জুতো এবং পরনে সেলাই করা বস্ত্র ছিলো।[৫] বাঙালি মহিলাদের পোশাক যে অপ্রতুল ও অশোভন ছিলো—একথা সেকালের বহু পুরুষ ও মহিলাই লিখেছেন। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ১৮৬৩ সালে যা লেখেন তা হলো: বাঙালি মহিলারা এমন পোষাক পরেন যে, তা পোশাক না-পরারই সামিল।[৬] এমন মনে করার কারণ কী তিনি অবশ্য তার ব্যাখ্যা দেন নি। অবশ্য বাঙালি মহিলারা কী পোশাক পরতেন ফ্যানি পার্কস তার মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামতও তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, শাড়ির জমিন এতো পাতলা ছিলো যে, তাকে 'স্বচ্ছ বলাই শ্রেয়। এবং তা আচ্ছাদন হিশেবে অর্থহীন। এর মধ্য দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন এবং চামড়ার রঙ দেখা যেতো।' 'সুতরাং,' তিনি বলেন, 'তাঁদের বস্ত্র দেখে আমি বুঝতে পারলাম কেন স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের অন্তঃপুরে যেতে দেওয়া হয় না। এর পর এ বিষয়ে আমার বিস্ময় দূরীভূত হয়।'[৭] রাজকুমার চন্দ্র ১৮৬৩ সালে যা লেখেন তা থেকে ফ্যানি পার্কসের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাজকুমার তদুপরি স্নানের পর সিক্ত বসনে এই মহিলাদের কেমন দেখাতো তার একটি বর্ণনা দেন:

> এখন যে সকল বস্ত্র তাহারা পরিধান করে তাহা বস্ত্র না-বলিলেও হয়। আর যখন স্নানান্তে জল হইতে তাহারা ওঠে তখন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে কিনা তা হঠাৎ নয়নগোচর হয় না, আর বাবু ভেয়েরা যত সরু কাপড় পান, ততই আনন্দ পূর্বক যত দাম হউক না কেন, তাহা ক্রয় করিয়া আপন প্রণয়িনীগণকে দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন...।[৮]

১৮৬৮ সালে বামাবোধিনী পত্রিকা-য় বলা হয় যে, লম্বা শাড়ি পরলেও প্রকৃত পক্ষে বাঙালি মহিলারা প্রায় উলঙ্গই থাকেন এবং এরূপ পোশাক প্রকাশ্যে জন

৫. 'রহস্য', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩, পৃ ২৭৬।
৬. জ্ঞানদাকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৪, পুরাতনী, পৃ. ৫১।
৭. F. Parks. P. 59, 60.
৮. রাজকুমার চন্দ্র, দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম (কলকাতা: লেখক, ১৮৬৩), পৃ. ৬-৭।

সমক্ষে পরিধান করার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়।[৯] অন্য একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, যে-পুরুষরা মহিলাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময়ে খোলা পালকিতে যেতে দেন না অথবা মহিলাদের পক্ষে ট্রেনে চড়াকে লজ্জাজনক মনে করেন, তাঁরাই আবার মহিলারা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরলে অথবা খোলা জায়গায় স্নান করলে আপত্তি করেন না। এতে আবো বলা হয়, যে-মহিলারা অতিশয় লজ্জাবশত এমন কি পিতা, শ্বশুর এবং ভাশুরের সঙ্গে দেখা অথবা আলাপ করেন না, তাঁরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাকে অথবা পুরুষদের দৃষ্টির সামনে পুকুরে স্নান করাকে অন্যায় মনে করেন না।[১০]

যে-পুরুষরা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও অবরোধ মোচন করার উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন, তাঁরাই প্রথম অনুভব করেন যে, বাঙালি মহিলাদের পোশাকের সংস্কার করা প্রয়োজন। তাঁদের মনে হয় যে, মহিলাবা যথাযথ ও শালীনভাবে পোশাক না-পরলে তাঁদেরকে বাইরে যেতে দেওয়া অথবা পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া সম্ভব নয়। ১৮৬৪ সালে বামাবোধিনী পত্রিকা-য় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত সঙ্গৎ সভাব সদস্যগণ মহিলাদের পোশাকের সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন, যদিও ঠিক কী পরিবর্তন করা দরকার সে সম্পর্কে তাঁরা কিছু পরামর্শ দেননি।[১১] কিন্তু এ বছরের নবেম্বর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহিলাদের পোশাকের সমস্যা নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কারণ তিনি স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বোম্বাই নিয়ে যাবেন বলে পরিকল্পনা করছিলেন। পাশ্চাত্য পোশাক পরা তাঁর পক্ষে উচিত হবে কি না, এ প্রশ্ন তাঁকে রীতিমতো ভাবিত করে। শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতার এক ফরাসি দর্জিকে তাঁর স্ত্রীর জন্যে এক প্রস্থ "প্রাচ্য" পোশাকের পরিকল্পনা করতে বলেন। আদেশ অনুসারে এই পোশাক তৈরি হয় বটে, তবে, জ্ঞানদার ভাষায়, এ পোশাকটি এমন জটিল ছিলো যে, তিনি একা এটি পরতে পারতেন না প্রত্যেকবার পরার সময়ে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথ সাহায্য করতেন।[১২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শোভন অথচ জটিল পোশাকটি সেকালের বঙ্গদেশে যথার্থই একটি নব প্রবর্তিত বস্তু বলে বিবেচিত হতে পারে।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাইতে এক পার্সি পরিবারে কয়েকমাস বাস করেন। এ পরিবার এতোই পাশ্চাত্য প্রভাবিত ছিলো যে, সেই সময়েই এই পরিবারে

৯. 'সূক্ষ্ম বস্ত্র', বামাপ, কার্তিক ১২৭৫, পৃ. ১২৪-২৬।
১০. 'স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭৬, পৃ. ৭২।
১১. বামাপ, পৌষ ১২৭২, পৃ. ১৪৩।
১২. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, পৃ. ২৯।

ইংলণ্ডে লেখাপড়া শেখা দুই কন্যা ছিলেন। এই পরিবারে বাসকালেই জ্ঞানদা পাশ্চাত্য আচার ও আদব-কায়দা শেখেন এবং ধীরে ধীরে কিছু বৈদগ্ধ্য অর্জন করেন। তা ছাড়া এ সময়েই তিনি তাঁর অদ্ভুত পোশাক পরা ছেড়ে দেন এবং পারসি কায়দায় শাড়ি পরতে শুরু করেন। তবে তাঁর শাড়ি পরায় পার্থক্য ছিলো এই যে, তিনি আঁচলটি ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে না-দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। তদুপরি, তিনি শাড়ির নীচে একটি পেটিকোটও পরতে শুরু করেন।[১৩] ব্লাউজ পরার রীতিও তিনি সম্ভবত পারসি মেয়েদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। কলকাতা ত্যাগ করার পর থেকেই তিনি এক জোড়া জুতোও পরতে আরম্ভ করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এভাবে ভদ্রলোক ঘরের মহিলাদের একটি পোশাকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরবর্তী মহিলারা তাঁর পোশাকের সবগুলি উপকরণ যদি-বা গ্রহণ না-ও করে থাকে, অন্তত তার শাড়ি পরার ভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন।[১৪]

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রবর্তিত পোশাক সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয় নি। তবে ১৮৬৫ সালে মার্চ মাসে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সময়ে রাজলক্ষ্মী মৈত্রেয় (পরবর্তী সময়ে সেন) নামে ১৩ বছরের একটি বালিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো একটি 'সংস্কৃত' পোশাক পরিধান করে। *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় এই পোশাক কী কী উপকরণে গঠিত ছিলো, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নি, কিন্তু একটি বাঙালি বালিকাকে এমন পোষাক পরতে দেখে গবর্ণর-জেনারেল খুশি হয়েছিলেন এ কথা বলা হয়।[১৫] পরবর্তী সময়ে অধিক সংখ্যক মহিলা এই দুটি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ বসু অ্যাণ্ড কম্পানি নামে এক পোশাক ব্যবসায়ী *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় এই বলে বিজ্ঞাপন দেয় যে, বাঙালি মহিলাদের জন্যে এই কম্পানি নতুন ধরনের 'সংস্কৃত' পোশাক তৈরি ও সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে। এ বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয় যে, এই পোশাক "প্রগতিশীল" ও সভ্য সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হবে।

এই বিজ্ঞাপন থেকে মনে হতে পারে যে, নতুন ধরনের 'সংস্কৃত' পোশাক দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছিলো। কিন্তু তা সত্য নয়। মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙালি

১৩. ঐ, পৃ. ২৯-৩১।

১৪. কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবী নাকি এই ভঙ্গি খানিকটা পরিবর্তন করেন এবং বর্তমান কালে সুচারু দেবীর ভঙ্গিটিই প্রচলিত আছে।

১৫. বামাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃ. ১৮।

ভদ্রলোকই সাহস করে তাঁদের মহিলাদের এ ধরনের পোশাক পরতে দিয়েছিলেন। পুরোপুরি পাশ্চাত্য পোশাকই গ্রহণ করবেন, না কিছু পাশ্চাত্য উপকরণ সহযোগে প্রচলিত বাঙালি পোশাকেরই সংস্কার করে নেবেন—এ বিষয়ে তখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিই মনস্থির করতে পারেন নি। মনোমোহন ঘোষ এ সমস্যার সমাধান করেন স্ত্রী স্বর্ণলতার জন্যে পুরোপুরি পাশ্চাত্য পোশাক গ্রহণ করে (হয়তো আরো কেউ কেউ এটা করে থাকবেন)। স্বর্ণলতা শাড়ির বদলে লম্বা গাউন পরা আরম্ভ করেন।[১৬] স্কার্ট পরলে পা দেখা যাবে, উর্ধ্বাঙ্গে শুধুমাত্র ব্লাউজ পরলে বুকের উপরের দিক খোলা থাকবে—এই জন্যে তিনি স্কার্ট এবং ব্লাউজ পরেন নি। সেকালের অধিকাংশ লোকই ছিলেন রক্ষণশীল। সে কারণে তাঁরা নিজেরা পাশ্চাত্য পোশাক পুরোপুরি গ্রহণ করলেও, মহিলাদের জন্যে পাশ্চাত্য পোশাকের কোনো কোনো উপকরণের অতিরিক্ত আর-কিছু গ্রহণ করে নি।

বাঙালি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বাঙালি মহিলাদের পোশাক কিভাবে উন্নত করা যায়, সে নিয়ে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিতর্ক চলতে থাকে। ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেশব সেন-প্রতিষ্ঠিত বামাহিতৈষিণী সভায় এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সমিতির বহু সদস্যই বাঙালি মহিলাদের জন্যে য়োরোপীয় পোশাক গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু দরিদ্র বাঙালিদের জন্যে এ পোশাক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ হবে বলে মনে করেন। বোম্বাই এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের মহিলারা, উত্তর ভারতের মুসলমান মহিলারা এবং চীনা মহিলারা সে-পোশাক পরতেন, সেগুলোকে যথেষ্ট ভালো বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এ সব পোশাকের কোনোটি গৃহীত হলে বাঙালি মহিলাদের 'বাঙালি' চেহারা হয়তো বিনষ্ট হবে।[১৭] তাঁরা এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব আরোপ করেন যে, বাঙালি মহিলাদের পোশাক এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁদের দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহিলাদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। আলোচ্য সভায় রাজলক্ষ্মী সেনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে, সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলা ব্লাউজ, জ্যাকেট এবং জুতো পরে এসেছিলেন এবং তাঁর মতে এ সব উপকরণ অবশ্যই মহিলাদের প্রামাণ্য পোশাকের অংশ হিশেবে গৃহীত হওয়া উচিত। তিনি অবশ্য উল্লেখ করেন যে, তখন কোনো কোনো রূপজীবিনীও পোশাকের এ সব উপকরণ পরিধান করেছিলো। তিনি তাই প্রস্তাব করেন যে, ভদ্রলোক পরিবারের

১৬. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা', পুরাতনী, পৃ. ২৯।

১৭. সৌদামিনী খাস্তগীর, 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৪৯-৫০।

মহিলাদের সবকিছু পরার পর তার ওপর একখানা চাদর পরা উচিত—যাতে তাঁদের দেখে সহজেই রূপজীবিনীদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।[১৮]

মহিলারা-যে তাঁদের পোশাক উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন, এতে বামাবোধিনী পত্রিকা মহিলাদের প্রশংসা করেন। পত্রিকায় বলা হয়, মহিলারা বাড়ীতে পাজামা, শাড়ি ও ব্লাউজ অথবা শাড়ি ও লম্বা ব্লাউজ পরতে পারেন, এবং বাইরে যাওয়ার সময়ে এ সবের ওপর চাদর ও জুতো পরতে পারেন। এতে আরো বলা হয় যে, যারা জুতো পরা পছন্দ করেন না, তাঁরা জুতো না-ও পরতে পারেন।[১৯]

এ পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দাবি করেন যে, তাঁদের পরিবারের অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির মহিলারা যে-পোশাক গ্রহণ করেছেন তা একই সঙ্গে সুন্দর এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর উপযোগী। এ পোশাক পরে সহজেই চলা ফেরা করা যায়। তাঁর মতে, বাঙালি, য়োরোপীয়, পার্সি, ইহুদি, মারাঠি যাঁরাই এ পোশাক দেখেছেন, তাঁরাই এর প্রশংসা করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, এ পোশাক অংশত য়োরোপীয়, অংশত বঙ্গদেশীয় এবং অংশত মুসলমানি ধরনের হলেও, এটা কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের অনুকরণ নয়। তিনি বলেন, তখন কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিবারে মহিলারা যে পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন, এ পোশাক তার থেকে খুব ভিন্ন নয়। বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের পরিবারের মহিলারা জুতো, মোজা, বডিস, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং শাড়ি পরেন। আর বাইরে যাওয়ার সময়ে এ সবের ওপর একটি চাদরও পরেন। তিনি বলেন, এ পোশাক পরলে একজন মহিলাকে ঠিক কেমন দেখাবে তার বিবরণ দেওয়া শক্ত। তবে তাঁকে লিখলে তিনি এ পোশাকের একটি আলোকচিত্র অথবা এরূপ একটি পোশাক পাঠাবেন বলে অঙ্গীকার করেন। বামাবোধিনী পত্রিকা-র সম্পাদকের মতামত অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন যে মহিলাদের পক্ষে জুতো পরা আবশ্যক।[২০]

১৮৭৪ সালের দিকে তোলা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি আলোকচিত্র থেকে দেখা যায় যে, সব কটি মেয়েই কোনো-না-কোনো ধরনের 'সংস্কৃত' পোশাক পরেছিলেন।[২১] রক্ষণশীল ব্যক্তিরা, এমন কি বামাবোধিনী

১৮. রাজলক্ষ্মী সেন, 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৫১।

১৯. 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৫২।

২০. (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ,' বামাপ, কার্তিক ১২৭৮, পৃ. ২২৫-২৬।

২১. For the Photograph see W.H. Beveridge, **India Called Them.**

সম্পাদক এই মেয়েদের জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য প্রথাবিরুদ্ধ আচরণের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন; কিন্তু তাঁরাও এদের 'সংস্কৃত' পোশাকের কোনো সমালোচনা করেন নি। অন্তত সংবাদপত্রের কোনো প্রতিবেদনে এঁদের পোশাকের নিন্দা করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, জনপ্রিয় মনোভাব ছিলো পোশাক সংস্কারের পক্ষে, এমন কি এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দু-একটি উপকরণ গ্রহণেও তাঁদের আপত্তি ছিলো না।

মহিলাদের পোশাকের উন্নতি হওয়া উচিত,ভদ্রলোকদের মধ্যে এমন ঐক্যমত সৃষ্টির পর, মহিলারা সব রকমের পোশাক পরতে আরম্ভ করেন। ঠিক কী পোশাক পরা যেতে পারে—এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত না-হওয়ায়, মহিলারা বিভিন্ন ঢঙের, এমন কি, পরস্পর মিল নেই এমন সব উপকরণের জগাখিচুড়ি পোশাকও পরতে শুরু করেন। কয়েক বছর অন্যত্র বাস করার পর শা. দাসী ১৮৮১ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি এ সময়ে দেখতে পান যে, কলকাতার মেয়েরা বিচিত্র পোশাক পরছেন—কোনো একজনের পোশাকের সঙ্গে অন্য জনের পোশাকের মিল নেই। তাঁর মতে এই পোশাকগুলো ছিলো য়োরোপীয় ও দেশীয় ঢঙের অদ্ভুত মিশ্রণ। এই পোশাকে মহিলাদের আগের তুলনায় এতো ভিন্ন মনে হচ্ছিলো যে, তাঁদের সবাইকে আদৌ বাঙালি বলেই চেনা যাচ্ছিলো না। শা. দাসী বলেন, কয়েক বছর আগেও যে-মহিলারা ব্লাউজ পরতেন না, তাঁরা এখন ব্লাউজ পরছিলেন। তবে মধ্যবয়সী মহিলারা এখনো ন্যূনতম পরিবর্তন স্বীকার করে যদ্দুর সম্ভব প্রথাসিদ্ধ পোশাক আঁকড়ে ছিলেন, আর বৃদ্ধারা 'সংস্কৃত' পোশাকের রীতিমতো বিরোধী ছিলেন। প্রথাবিরুদ্ধ পোশাক পরার জন্যে তাঁরা বস্তুত কমবয়সী মহিলাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেন।[২২]

আধুনিকতা সমগ্র বাঙালি সমাজকে একই সময়ে বা সমান মাত্রায় প্রভাবিত করে নি। সুতরাং তথাকথিত 'সংস্কৃত' পোশাকও বিভিন্ন পারিবারিক পটভূমির মহিলারা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেন। ফলে দেখতে পাই, ১৯০১ সালেও বহু ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারাও 'সংস্কৃত' পোশাক পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। এ সময়কার *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় প্রকাশিত একটি রচনায় আধুনিকা ব্রাহ্ম মহিলা এবং ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলাদের পোশাকের পার্থক্য এভাবে বর্ণনা করা হয়: ব্রাহ্ম মহিলারা যেমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তার সঙ্গে ঐতিহ্যিক হিন্দু মহিলাদের পোশাকের তুলনা হয় না। হিন্দু মহিলারা তাঁদের শাড়ি আর চাদর নিয়ে সদাই বিব্রত—তাঁরা এগুলোকে যথাস্থানে রাখতে

২২. শ. দেবী, 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ', পৃ. ২৩১-৩৪।

ব্যতিব্যস্ত হন। তা ছাড়া, এঁরা এঁদের ঘোমটা কিছুতেই সরাতে পারেন না। খালি পায়ে হাঁটা খুব অস্বস্তিকর। তবু তাঁরা খালি পায়েই হাঁটেন। এঁদের দেখে স্বভাবতই পথচারীরা হাসেন।[২৩] এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঐতিহ্যিক মহিলারা বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেও জুতো পরতেন না।

এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বাঙালি পুরুষরা অনেকে পাশ্চাত্য পোশাক পুরোপুরি গ্রহণ করলেও মহিলারা তা করেন নি। ১৯৮০-এর দশকে এখনো এ কথা সত্য। মুষ্টিমেয় কিছু অত্যাধুনিক কমবয়সী মেয়ে বিশেষত ছাত্রীরা প্যাণ্টস এবং লম্বা স্কার্ট পরলেও, বিয়ের পর তাঁরা আবার ঐতিহ্যিক শাড়ি পরাই শুরু করেন। এ থেকে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের রক্ষণশীল এবং ঈর্ষাপরায়ণ মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। তাঁরা এখনো মহিলাদের এমন পোশাক পরতে দেন না যাতে পায়ের একাংশ অথবা বুকের উপরের অংশ বেরিয়ে থাকে। মহিলারা যদি এমন আটসাঁট পোশাক পরেন যাতে তাঁদের স্তনের আকার স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তা হলে একখণ্ড সূক্ষ্ম ওড়না অথবা শাড়ি দিয়ে আবৃত করে রাখতে হয়। অবশ্য সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা ক্রমশ পোশাকের ব্যাপারে অ-রক্ষণশীল হয়ে উঠছেন।

২৩. 'বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার পরিচ্ছদ', বামাপ. কার্তিক ১৩০৮, পৃ. ২৪০-৪১।

পরিশিষ্ট চার

সখী সমিতির সদস্যাবৃন্দের তালিকা, ১৮৯১

স্বর্ণলতা ঘোষ
(মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী)
বরদা সুন্দরী ঘোষ
(লালমোহন ঘোষের স্ত্রী)
ললিতা রায়
মনোমোহিনী দত্ত
(রমেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী)
সৌদামিনী গুপ্ত
(বি.এল গুপ্তের স্ত্রী)
থাকমণি মল্লিক
সরলা রায়
প্রসন্নতারা গুপ্ত
হিরণ্ময়ী দেবী
(স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা)
সৌদামিনী দেবী
(স্বর্ণকুমারী দেবীর বড়ো বোন)
বসন্তকুমারী বোস
চন্দ্রমুখী বোস
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
মৃণালিনী দেবী
(স্বর্ণকুমারীর ভ্রাতৃবধূ)
বিধুমুখী রায়
(রজনীনাথ রায়ের স্ত্রী)
প্রসন্নময়ী দেবী
(বাগচীর স্ত্রী)
শ্রীমতী পি, সি, রায়

সুরোবালা দেবী
স্বর্ণকুমারী দেবী
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
(স্বর্ণকুমারীর ভ্রাতৃবধূ)
হেমাঙ্গিনী দেবী
(উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী)
জগত্তারিণী মিত্র
সুশীলা দেবী
শ্রীমতী লালবিহারী দে
শ্রীমতী চন্দ্রমাধব ঘোষ
কমলা বসু
শ্রীমতী এ. মিত্র
সৌদামিনী দেবী
কুমুদিনী দেবী
কাদম্বিনী ঘোষ
হেমন্তকুমারী দেবী
মোক্ষদা দেবী
কাদম্বিনী দেবী
(শ্রীমতী জে.পি. গাঙ্গুলি)
প্রসন্নময়ী দেবী
(মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী)
মোহিনী ঘোষ
(পি. ঘোষের স্ত্রী)
শ্রীমতী জে. শর্মা
শ্রীমতী পি. কে. ঘোষ
শিখরবাসিনী মিত্র

শৈলবালা রায়
(সরলা রায়ের বোন)
শ্রীমতী কে. এন. মিত্র
কুমারী রাধারানী লাহিড়ী
শ্রীমতী টি, এন, চক্রবর্তী
বরদাসুন্দরী দাসী
কেদারকামিনী দেবী
ভুবনমোহিনী দাসী
কুমুদিনী দাসী
প্রমদা দেবী
চণ্ডিদাসী মিত্র
কুসুমকুমারী দেবী
জগৎমোহিনী দেবী
শরৎকুমারী দেবী
মৃণালিনী দেবী
লাবণ্য ঘোষ
প্রমীলাসুন্দরী দাসী
নীরদকালী বসু
রাধারানী মিত্র
মৃণালিনী সরকার
কুমারী কামিনী সেন
কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য
(শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা)
কুসুমকুমারী দত্ত
সরোজিনী মিত্র
কমলকামিনী মিত্র
কাদম্বিনী মিত্র
কাদাম্বিনী বসু
উত্তমকুমারী দেবী
রমাসুন্দরী ঘোষ
কামিনী মিত্র

ভবতারিণী ঘোষ
থাকমণি সরকার
যোগেন্দ্রমোহিনী দাসী
বিনোদমালা দেবী
নলিনীবালা রায়
অন্নদাসুন্দরী দেবী
কৃষ্ণবিনোদিনী দাসী
প্রসন্নময়ী দেবী
বিনোদিনী দেবী
জগৎমোহিনী দেবী
সুশীলামোহিনী মিত্র
বিপিনেশ্বরী মিত্র
শ্রীমতী ঘোষ
কুমুদিনী রায়
শরৎকুমারী দেবী
মোহিনী দেবী
গিরিবালা দেবী
বিরজামোহিনী দেবী
দক্ষবালা দেবী
ভবতারিণী দেবী
সৌরভসুন্দরী দেবী
হেমলতা দেবী
শরৎকুমাবী দেবী
শিবসুন্দরী মিত্র
নিস্তারিণী বসু
গোপালমণি ঘোষ
শ্রীমতী উমাচরণ দাস
শুভারণ্যা সিনহা
জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী
সুকেশী দেবী
বসন্তকুমারী দেবী

মলিনপ্রভা ঘোষ
শরৎকুমারী চৌধুরানী
(অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী)
বিপিলবালা সরকার
সুরসুন্দরী দেবী
শ্রীমতী এল.সি. মিত্র
হরবল্লভা দে

ললিতমণি বসু
অচলা বসু
বনমালা পাল
স্বর্ণলতা পাল
কমলমণি রুদ্র
নিত্যকালী দেবী
জগৎমোহিনী দেবী
বিধুমুখী মিত্র
উপেন্দ্রবালা সরকার
অম্বিকা দেব
সরোজকুমারী দেবী
নবীনকালী বসু
নারায়ণদাসী ঘোষ
শ্রীমতী বসু
মনোমোহিনী ঘোষ
প্রসন্নতারা বসু
সুদক্ষিণা সেন
হরিদাসী দেবী
বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশীলা চক্রবর্তী
বসন্তকুমারী সরকার

অন্নপূর্ণা দেবী
গোলাপকামিনী ঘোষ
হেমাঙ্গিনী গুপ্ত
চমৎকারমোহিনী মিত্র
শ্রীশমোহিনী দেবী
বসন্তকুমারী দাসী
ভুবনমোহিনী দাসী
ডাঃ যামিনী সেন
(কামিনী সেনের ছোট বোন)
তিনকড়ি দেবী
বিধুমুখীরায় চৌধুরানী
প্রেমতরঙ্গিনী দাসী
মোক্ষদামোহিনী কর
ডাঃ বিধুমুখী বসু
সুরেশ্বরী ঘোষ
মনোরমা দাসী
হেমলতা রায়
হেমন্তকুমারী দেবী
ক্ষীরোদমোহিনী দেবী
ক্ষেত্রমণি ঘোষ
ফুলকুমারী দেবী
ক্ষেত্রমণি দেবী
শ্রীমতী কে, সি, ব্যানার্জি
শ্রীমতী পি, এন, ঘোষ
চণ্ডিমণি দাসী
নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী
প্রতিভা দেবী
(স্বর্ণকুমারীর ভ্রাতুষ্পুত্রী)
কুমারী কুমুদিনী খাস্তগীর

উৎস : ভারতী ও বালক, ডিসেম্বর ১৮৯১--জানুআরি ১৮৯২।

পরিশিষ্ট পাঁচ

ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাঙালি মহিলাদের তালিকা, ১৮৮৩--১৯১০*

নাম	বছর	মন্তব্য
	এম, এ	
চন্দ্রমুখী বোস	১৮৮৪	খৃস্টান
নির্মলা সোম	১৮৯১,১৮৯৪	খৃস্টান
হেমপ্রভা বসু	১৮৯৭	ব্রাহ্ম
মার্গারেট গুপ্ত	১৮৯৯	খৃস্টান
রাজকুমারী দাস (চন্দ্রমুখীর বোন)	১৯০১	খৃস্টান
হৃদয়বালা বসু	১৯০৮	খৃস্টান ?
ভিক্টোরিআ মুখার্জি	১৯০৮	খৃস্টান
	বি, এ	
কাদম্বিনী বসু	১৮৮৩	ব্রাহ্ম
কামিনী সেন	১৮৮৬	ব্রাহ্ম
প্রিয়তমা দত্ত	১৮৮৬	খৃস্টান
কুমুদিনী খাস্তগীর	১৮৮৭	ব্রাহ্ম
স্থপ্রভা গুপ্ত	১৮৮৯	
লীলা সিনহা	১৮৯০	খৃস্টান
সরলা ঘোষাল	১৮৯০	ব্রাহ্ম
শরৎ চক্রবর্তী	১৮৯০	
জীবনবালা দত্ত	১৮৯১	ব্রাহ্ম
ইন্দিরা ঠাকুর	১৮৯২	ব্রাহ্ম
প্রিয়ম্বদা বাগচী	১৮৯২	ব্রাহ্ম

* কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ১৮৮৯ সালে এম. বি. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু পাশ করেন নি। তথাপি তিনি চিকিৎসা করার লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি লন্ডন থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন।

নাম	বছর	মন্তব্য
এলেন চন্দ্র	১৮৯৩	খৃস্টান
শশিবালা ব্যানার্জি	১৮৯৩	ব্রাহ্ম ?
সুরবালা ঘোষ	১৮৯৩	
সরলাবালা রক্ষিত	১৮৯৪	
প্রেমকুসুম সেন	১৮৯৬	ব্রাহ্ম
সরলা সেন	১৮৯৭	
শিশিরকুমারী বাগচী	১৮৯৮	ব্রাহ্ম
স্নেহলতা মজুমদার	১৮৯৯	
লিলিয়ান পালিত	১৯০০	টি.এন. পালিতের কন্যা
শান্তা সরকার	১৯০১	
সরলাবালা মিত্র	১৯০১	
কুমুদিনী মিত্র	১৯০৩	ব্রাহ্ম
প্রভাবতী রায়	১৯০৩	
ম্যাবেল সিংহ	১৯০৫	খৃস্টান ?
বাসন্তী মিত্র	১৯০৬	ব্রাহ্ম
হিরন্ময়ী সেন	১৯০৬	
কমলা বসু	১৯০৬	
চারুবালা মণ্ডল	১৯০৭	
সুরবালা সিনহা	১৯০৭	
রমা ভট্টাচার্য	১৯০৮	
বনলতা দে	১৯০৮	
বঙ্গবালা মুখার্জি	১৯০৮	
জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি	১৯০৯	ব্রাহ্ম
নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ	১৯০৮	
প্রতিভা গুহ	১৯০৮	
রোসাবেল সিংহ	১৯০৮	খৃস্টান
ভায়োলেট হৃদয়মোহিনী মিত্র	১৯০৮	খৃস্টান
শোভনবালা রক্ষিত	১৯০৯	
বিভা রায়	১৯১০	
জ্যোতির্ময়ী দত্ত	১৯১০	ব্রাহ্ম

নাম	বছর	মন্তব্য
ম্যারী ব্যানার্জি	১৯১০	খৃস্টান
শিশিরকুমারী গুহ	১৯১০	
লরা সুনীতি ঘোষ	১৯১০	খৃস্টান
	এম. বি.	
বিধুমুখী বসু	১৮৯০	খৃস্টান
ভায়ওলেট মেরী মিত্র	১৮৯০	খৃস্টান
রেচেল কোহেন	১৮৯৭	খৃস্টান
	এল. এম.	
যামিনী সেন	১৮৭৬	ব্রাহ্ম

উৎস: *Calcutta University Calendar, 1911*

পরিশিষ্ট ছয়

লেখিকাদের একটি নির্বাচিত তালিকা, ১৮৬৩-১৯০৫

নাম	মন্তব্য	নাম	মন্তব্য
অমলশশী বসু	ব্রাহ্ম	নিত্যকালী ঘোষ	ব্রাহ্ম
অনুজানন্দিনী রায়		নিস্তারিনী দেবী (কামারহাট্টাবাসী)	
কমনীয়কান্তা	ব্রাহ্ম	নিস্তারিনী দেবী	
করুণাময়ী দেবী		প্রসন্নময়ী দেবী	ব্রাহ্ম
কাদম্বিনী দাসী	হিন্দু	প্রবোধিনী ঘোষ	ব্রাহ্ম
কামনা দেবী	হিন্দু	প্রিয়ম্বদা দেবী	ব্রাহ্ম
কামিনী সেন/রায়	ব্রাহ্ম	বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়	ব্রাহ্ম
কামিনী শীল	খৃস্টান	বসন্তকুমারীরায় চৌধুরানী	
কুন্দবালা দেবী	হিন্দু	বসন্তকুমারী বসু	
কুমুদিনী রায়		বিন্ধ্যবাসিনী দেবী	
কুলবালা দেবী	হিন্দু	বিনোদিনী ঘোষ	
কুসুমমালা দত্ত	ব্রাহ্ম	বিনোদিনী সেনগুপ্ত	
কৃষ্ণকামিনী	হিন্দু	ব্রজবালা দেবী	
কৃষ্ণভাবিনী দাস	হিন্দু	মধুমতী গাঙ্গুলী	ব্রাহ্ম
কৈলাসবাসিনী দেবী	ব্রাহ্ম ?	মনোমোহিনী দাসী	হিন্দু
ক্ষীরোদা মিত্র	ব্রাহ্ম	মানকুমারী বসু	হিন্দু
গিরিবালা দেবী	হিন্দু	মায়াসুন্দরী	
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	হিন্দু	মুক্তকেশী দেবী	
জয়কালী		মুক্তকেশী গুপ্ত	
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	ব্রাহ্ম	মৃন্ময়ী সেন	
তাহেরননেসা	মুসলিম	মোহনমতী দেবী	
দ্বিজতনয়া (কামিনীসুন্দরী)	হিন্দু	যোগমায়া দেবী	ব্রাহ্ম
যোগমায়া গোস্বামী	ব্রাহ্ম	সারদা দেবী	ব্রাহ্ম
রমাসুন্দরী	ব্রাহ্ম	সুখতরী দত্ত	
নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী	হিন্দু	রাজবালা দেবী	

নাম	মন্তব্য	নাম	মন্তব্য
রাজলক্ষ্মী মৈত্র/সেন	ব্রাহ্ম	সুমতী	
রাধারানী লাহিড়ী	ব্রাহ্ম	সুমতী মজুমদার	ব্রাহ্ম
রাসসুন্দরী দেবী	হিন্দু	সুশীলা বসু	ব্রাহ্ম
রেবা রায়		সুশীলাবালা সিনহা	ব্রাহ্ম
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	মুসলিম	সুষমাসুন্দরী দাসী	হিন্দু
লক্ষ্মীমণি দেবী		সৌদামিনী দেবী/রায়	ব্রাহ্ম
লাবণ্যপ্রভা বসু	ব্রাহ্ম	সৌদামিনী সিনহা	খৃস্টান
শরৎকুমারী চৌধুরানী	ব্রাহ্ম	স্বর্ণকুমারী দেবী	ব্রাহ্ম
শৈলজাকুমারী দেবী		স্বর্ণকুমারী দেবী/ঘোষ	ব্রাহ্ম
শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়		স্বর্ণপ্রভা বসু	ব্রাহ্ম
সরলা দেবী	ব্রাহ্ম	স্বর্ণময়ী চৌধুরানী	
সরলাবালা দাসী	হিন্দু	হেমন্তকুমারী চৌধুরানী	ব্রাহ্ম
সরস্বতী সেন	ব্রাহ্ম	হেমন্তকুমারী সেনগুপ্ত	
সরোজকুমারী দেবী	ব্রাহ্ম		
সারদাসুন্দরী রায়	ব্রাহ্ম	হেমাঙ্গিনী চৌধুরানী	ব্রাহ্ম

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ক. অপ্রকাশিত সরকারী দলিল

Widow Remarriage Papers, National Archives, New Delhi.

খ. সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন

Adam, W. *Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1838)*. ed. by A. Basu. Calcutta Univ. 1941.

Calcutta University Calendar 1877-1911. Calcutta : Thacker Spincks, 1877-1911.

General Report on Public Instruction in Bengal, 1863-64, 1871-72, 1881-82, 1890-91, Calcutta : B.S. Press. 1864-92.

Report of the Committee appointed by the Govt. to consider the question of legistative interference for preventing the "excessive abuse" of polygamy, Calcutta : B.S. Press, 1867.

Report on the Administration of Bengal. for the years 1881-82, and *1892-93*. Calcutta : B S. Press, 1882-1894.

Report on the Census of India, 1901. Vol. VI. VIA & VII. Calcutta : B.S. Press, 1902.

Report on Public Instruction in Bengal for 1851-52. Calcutta : B.S. Press, 1852.

Royal Commission on Equal Pay 1944-46. London : His Majesty's Stationery Office, 1946.

Selections from Educational Records, Pt. 2, ed. by J.A. Richey. Calcutta : B.S. Press, 1922.

The Proceedings and Transactions of the Bethune Society. Calcutta : Bishop's College Press, 1870.

গ. সাময়িক পত্র

অবোধবন্ধু, ১৮৬৮-৬৯

অন্তঃপুর, ১৮৯৮-১৯০৩

আর্যদর্শন, ১৮৭৬

জ্ঞানাঙ্কুর, ১৮৭৩-৭৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৩-৮৩
তমোলুক পত্রিকা, ১৮৭৪
ধর্মতত্ত্ব, ১৮৭১
নব্যভারত. ১৮৮৪-৯৪
প্রদীপ, ১৯০০-০৫
প্রবাসী, ১৯১০-১৫, ১৯১৮-৩৩
বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪
বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫-৭৬
বান্ধব, ১৮৭৪
বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৮৫৪-৬০
ভারতী, ১৮৮১-৮৬, ১৯০৮-১৯
ভারতী ও বালক, ১৮৯০-৯৩
ভারতবর্ষ, ১৯২৯, ১৯৪৩
ভারত সুহৃদ, ১৮৭৬
মধ্যস্থ, ১৮৭২-৭৩, ১৮৭৫-৭৬
সমদর্শী ১৮৭৫
সাহিত্য, ১৮৯০-৯২
হিতসাধক, ১৮৬৮
Brahmo Public Opinion, 1879-1883
Calcutta Review, 1851, 1872, 1902

সাময়িকপত্রের সংকলন
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চারখণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। কলকাতা: বীক্ষণ, গ্রন্থম, ১৯৬৩-৬৮।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দুই খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। চতুর্থ সংস্করণ।
Selections from Indian Journals, 2 Vols. ed. by S. Das, Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1963

ঘ. মহিলাদের রচনা

জনৈক ব্রাহ্ম মহিলা। 'বামাবোধিনী ও বামাগণ', বামাপ, কার্তিক ১২৭৬।
জনৈক হিন্দু বিধবা। 'বৈধব্য জীবনের চিত্র', অন্তঃপুর, পঞ্চম বর্ষ (১৯০৩)।
জনৈক হিন্দু মহিলা। 'বাল্যবিবাহের ফল', বামাপ, মাঘ ১২৮৬।

জনৈক মহিলা (বোয়ালিয়া)। 'বঙ্গদেশের মহিলাগণের স্বাধীনতা বিষয়', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।

জনৈক মহিলা (খিদিরপুর)। 'নারীগণের অল্পশিক্ষা', বামাপ, মাঘ-ফাল্গুন, ১২৯২।

———চট্টোপাধ্যায়। 'বামারচনা', বামাপ, চৈত্র ১২৭৩।

———দেবী। 'একটি প্রস্তাব', ভারতী, বৈশাখ ১২৯২।

অজ্ঞাত। 'কুলীন বহুবিবাহ', বামাপ, পৌষ ১২৭৮।

———। 'পত্রোত্তর', বামাপ, বৈশাখ ১২৯৮।

———। 'পারিবারিক সুখ', বামাপ, ভাদ্র ১২৯১।

———। 'বঙ্গকামিনীর খেদ', বামাপ, পৌষ ১২৮২।

———। 'বামারচনা', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪।

———। 'বিবিধ প্রসঙ্গ', অন্তঃপুর, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (১৯০০)।

———। 'লজ্জা', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭২।

———। 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার', ভারতী, ভাদ্র ১২৯০।

———। 'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা', বঙ্গমহিলা, আষাঢ় ১২৮২।

———। 'স্ত্রীশিক্ষা', বামাপ, কার্তিক ১২৭৬।

———। '———', বামাপ, বৈশাখ ১২৭৯।

অনুজানন্দিনী রায়। 'মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার আবশ্যকতা', বামাপ, কার্তিক ১২৯০।

অমলশশী বসু। 'বিধবার দুঃখ', বামাপ, আশ্বিন ১৩০৪।

উপেন্দ্রমোহিনী বসু। 'বামারচনা', বামাপ, বৈশাখ ১২৭২।

কাদম্বিনী দেবী। 'সহধর্মিণী', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮)।

কামনা দেবী। 'আমি ত বিধবা' (কবিতা), বঙ্গমহিলা, অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

কামিনী সেন। 'উদ্দীপনা' (কবিতা), বামাপ, চৈত্র ১২৮৬।

———। *Some Thoughts on the Education of Our Women.* calcutta, 1918.

কুন্দমালা দেবী। 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?', বামাপ, আশ্বিন ১২৭০।

কুমুদিনী রায়। 'হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম', বামাপ, কার্তিক ১২৯১।

কুলবালা দেবী। 'হিন্দু রমণীর বিদ্যা শিক্ষা ও পরাধীনতা', বামাপ, বৈশাখ ১২৯৯।

কুসুমমালা দত্ত। 'স্ত্রীজাতির অবনতি', অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (১৯০০)।
কৃষ্ণকামিনী। 'স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম', বামাপ, শ্রাবণ ১২৮০।
কৃষ্ণভাবিনী দাস। 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি', ভারতী ও বালক, ১২৯৮।
——। ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা। কলকাতা : সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৮৮৫।
——। 'সমাজ ও সমাজ-সংস্কার', ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮।
——। 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী', সাহিত্য, পৌষ ১২৯৮।
——। 'স্বাধীন ও পরাধীন নারী জীবন,' প্রদীপ, ফাল্গুন ১৩০৪।
——। 'জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় মহত্ত্ব', প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭।
——। 'শিক্ষিতা নারী', সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৮।
——। 'শিক্ষিতা নারীর প্রতিবাদের উত্তর', সাহিত্য, মাঘ ১২৯৮।
——। 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬।
——। 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য,' ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮।
কৈলাসবাসিনী দেবী। 'সভ্যতা ও সমাজসংস্কার', অবোধ বন্ধু, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫।
——। হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি। কলকাতা: গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৫।
——। হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা। কলকাতা: গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩।
ক্ষীরোদা মিত্র। 'দূষিত দেশাচারের নিমিত্ত বিলাপ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩।
গিরিবালা দেবী। 'সাধ্বী', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৯০১)।
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'আমাদের বোম্বাই ভ্রমণ', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯।
——। 'বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদ', বামাপ, কার্তিক ১২৭৮।
——। 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার', ভারতী, আষাঢ় ১২৯০।
——। 'স্ত্রীশিক্ষা', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮।
তাহেরননেসা। 'বামারচনা', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭১।
নগেন্দ্রবালা। 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অর্ধশিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদিগের মতামত', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৯০১)।
নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী। 'অবরোধে হীনাবস্থা', বামাপ, বৈশাখ ১৩০২।
——। 'গার্হস্থ্য জীবনে নারী জাতির কর্তব্য', বামাপ, পৌষ ১৩১১।
——। 'প্রয়োজনীয় প্রার্থনা,' বামাপ, আশ্বিন ১৩০১।
——। 'প্রহৃতা স্ত্রী', বামাপ, পৌষ ১৩০৫।
——। 'সঙ্গীতবিদ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক', বামাপ, ভাদ্র ১৩০১।
নিস্তারিণী দেবী (কানপুর)। 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য', বামাপ, পৌষ ১২৯১।

নিস্তারিণী দেবী। 'উদ্বাহ', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা (১৯০১)।
নিস্তারিণী দেবী (কুমার হাট্টা)। 'বিদ্যার সমান বন্ধু নাই', বামাপ, মাঘ ১২৭৮।
প্রবোধিনী ঘোষ। 'বঙ্গমহিলাদিগের অর্থকরী শিল্পচর্চা', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৯০১)।
প্রসন্নময়ী দেবী। 'উচচ শিক্ষা', অন্তঃপুর, পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (১৯০২)।
প্রিয়ম্বদা দেবী। 'স্ত্রীশিক্ষা', অন্তঃপুর, চতুর্থ সংখ্যা, পঞ্চম সংখ্যা (১৯০১)।
বসন্তকুমারী বসু। 'স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার বর্তমান অবস্থা', অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।
বসন্তকুমারী রায় চৌধুরী। যোষিদ্বিজ্ঞান। বরিশাল, ১৮৭৫।
বামারচনাবলী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বামাবোধিনী সভা, ১৮৭২।
বিনোদিনী ঘোষ। 'বামারচনা', বামাপ, পৌষ ১৩০৭।
বিনোদিনী সেনগুপ্ত। 'বিবাহিত জীবন', বামাপ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৭।
ব্রজবালা দেবী। 'আমি কি উন্মাদিনী' (কবিতা)। বঙ্গমহিলা, কার্তিক ১২৮৩।
ম——। 'নব্য বঙ্গ মহিলা', বামাপ, আশ্বিন ১৩১০।
মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়। 'বামাগণের রচনা', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭১।
মনোমোহিনী দাসী। 'সরলতা স্ত্রীজাতির ভূষণ', বামাপ, ভাদ্র ১২৮০।
মানকুমারী বসু। 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, কার্তিক, ১২৯৮।
——। 'বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীগণের অবস্থা', বামাপ, অগ্রহায়ণ ১৩০১।
মায়া সুন্দরী। 'নারী জন্ম কি অধর্ম', বঙ্গমহিলা, শ্রাবণ ১২৮২।
মুক্তকেশী দেবী। 'রমণীর গার্হস্থ্য ধর্ম,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা (১৯০১)।
মোহনমতি দেবী। 'আদর্শ রমণী', অন্তঃপুর, তৃতীয় বর্ষ (১৯০০)।
মৃণ্ময়ী সেন। 'ভারত মহিলার শিক্ষা,' অন্তঃপুর, পঞ্চম বর্ষ (১৯০২)।
যোগমায়া গোস্বামী। 'স্ত্রীপুরুষের কিরূপ সম্বন্ধ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩।
যোগীন্দ্রমোহিনী বসু। 'কৌলীন্য প্রথা', বামাপ, আশ্বিন ১২৭৮।
রমা সুন্দরী। 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রচলিত হইলে...', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২।
——। 'কালীদর্শন', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭০।
——। 'শিল্পকর্ম', বামাপ, ভাদ্র ১২৭২।
রাজবালা দেবী। 'বামারচনা', বামাপ, ফাল্গুন ১২৮০।
রাধারাণী লাহিড়ী। 'স্ত্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি?', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।
রেবা রায়। 'মাতৃ ও শাশুড়ী ভক্তি', বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। মতিচূর, দুই খণ্ড এবং অবরোধবাসিনী। আবদুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া-রচনাবলী-তে সংকলিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩।
শরৎকুমারী চৌধুরানী। 'একাল ও একালের মেয়ে', ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৮।
শা—। 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ', ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮।
শৈলজাকুমারী দেবী। 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যকভাবে প্রচলিত...', বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২।
শ্যামাসুন্দরী। 'সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ,' বামাপ, ভাদ্র ১২৮১।
শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মাণিক্যময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা,' বামাপ, শ্রাবণ ১২৮১।
সরলাবালা দাসী। 'রমণীর ব্রত,' অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৮৯৮)।
——। 'রমণীর জীবনব্রত', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৮৯৮)।
সরলাবালা সরকার। 'মায়ের জাতি,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।
——। 'বঙ্গবালা,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।
সরোজকুমারী দেবী। 'বিদ্যাসাগর,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৯০১)।
(সারদাদেবী)। 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে', বামাপ, কার্তিক ১২৭৩।
সুখতারা দত্ত। 'মদালসা বা আদর্শ জননী,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।
সুমতি মজুমদার। 'বর্তমান ভারত নারীর দুরবস্থা,' বামাপ, শ্রাবণ ১২৯১।
সুশীলা বসু। 'স্ত্রীজাতির কর্তব্য,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৮৯৯।
সুশীলাবালা সিংহ। 'সুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা,' বামাপ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১০।
সুষমাসুন্দরী দাসী। 'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার উপায়', বামাপ, আষাঢ় ১২৯৬।
সৌদামিনী দেবী। 'বামারচনা,' বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭২।
——। 'বামারচনা,' বামাপ, পৌষ ১২৭২।
স্বর্ণকুমারী দেবী। 'সুখী সমিতি,' ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮।
স্বর্ণপ্রভা বসু। 'বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট,' বামাপ, মাঘ ১২৮৬।
স্বর্ণলতা চৌধুরী। 'বৌ-মা,' অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮)।
হেমন্তকুমারী চৌধুরী। 'বঙ্গমহিলার গ্রন্থ প্রচার,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।
——। 'বিদেশী ও বঙ্গীয় নারী,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৯০১)।
——। 'মহিলার পরিচ্ছদ,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (১৯০১)।

——। 'ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (১৯১০)।
হেমন্তকুমারী সেনগুপ্ত। 'সেকালের রমণী,' অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (১৯০১)।
হেমাঙ্গিনী চৌধুরী। 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য,' অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)।

ঙ. সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ

অবোধবন্ধু

'এতদ্দেশে বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা,' ভাদ্র, ১২৭৬।

আর্যদর্শন

'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গণা,' ভাদ্র ১২৮৪।

জ্ঞানাঙ্কুর

'অধুনাতন ও পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা,' পৌষ ১২৮১।
'গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা,' বৈশাখ ১২৮১।
'বঙ্গীয় বিবাহ,' আশ্বিন-কার্তিক ১২৮১।
(চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়), 'বিদ্যা বিড়ম্বনা,' বৈশাখ ১২৮০।
'স্ত্রীশিক্ষা', আশ্বিন ১২৮২।
'স্ত্রীস্বাধীনতা,' শ্রাবণ ১২৮৩।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত। 'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা,' ১ শ্রাবণ ১৭৮৬।
——। 'বর্তমান ব্যবহার,' চৈত্র ১৭৭৭।
——। 'বর্তমান ব্যবহার,' ভাদ্র ১৭৭১।
'নিরীশ্বর বিবাহ,' পৌষ ১৭৯৯।
'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা,' চৈত্র ১৮০২।
'বর্তমান কাল অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার কাল,' আষাঢ় ১৭৯৮।
'বহুবিবাহ,' ভাদ্র ১৭৭৮।
'বহুবিবাহ,' বৈশাখ ১৭৮৮।
'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা,' জ্যৈষ্ঠ ১৮১২।

'সমাজ সংস্কার,' কার্তিক ১৭৮৯।
'সমাজ সংস্কার,' পৌষ ১৭৯৭।
'সমাজের পত্তনভূমি,' পৌষ ১৭৯৬।
'সামাজিক আন্দোলন,' জ্যৈষ্ঠ ১৮১৬।
'সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন,' আষাঢ় ১৭৯৪।
'স্ত্রীজাতির অধিকার ও স্ত্রীস্বাধীনতা,' শ্রাবণ ১৭৯৪।
'স্ত্রীশিক্ষা ও মনু,' শ্রাবণ ১৮০৩।
'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীবিদ্যালয় স্ত্রীনিবাস,' ফাল্গুন ১৮০২।
'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা,' অগ্রহায়ণ ১৮০০।

তমোলুক পত্রিকা
'বঙ্গমহিলার বর্তমান অবস্থা,' প্রথম বর্ষ, ১৮৭৪-৭৫।

নব্যভারত
দিশানচন্দ্র বসু। 'স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ', ফাল্গুন ১২৯৯ ও পৌষ ১৩০০।
'নব্যবঙ্গ,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩।
'বিধবাবিবাহ,' চৈত্র ১২৯৫।
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। 'সংস্কারকের প্রতি,' শ্রাবণ ১২৯২।
'পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দু ধর্ম,' কার্তিক ১২৯২।
'বাল্যবিবাহ,' আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৯৩।
'স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার,' ফাল্গুন ১২৯৩।
সিদ্ধেশ্বর রায়। 'সমাজ সমন্বয়,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। 'স্বামী ও স্ত্রী,' আশ্বিন ১২৯১।
'হিন্দু ধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার,' কার্তিক ১২৯৮।
'নবজীবন ও বিধবাবিবাহ', আষাঢ় ১২৯২।
শিবনাথ শাস্ত্রী। 'শাস্ত্র ও দেশাচার', ভাদ্র ১২৯৮।
— —। 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', ভাদ্র ১২৯৮।

প্রবাসী
কৃষ্ণভাবিনী দাস। 'জলন্দর কন্যা বিদ্যালয়', বৈশাখ ১৩২০।
'নারীশিক্ষা সমিতি', বৈশাখ ১৩২৮।
শিবনাথ শাস্ত্রী। 'নারীর কার্যক্ষেত্র: পারিবারিক ও সামাজিক', অগ্রহায়ণ ১৩১৯।
——। 'মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা', ভাদ্র ১৩১১।

বঙ্গদর্শন

'প্রাচীনা ও নবীনা', বৈশাখ ১২৮১।

বঙ্গমহিলা

ভুবনমোহন সরকার। 'পারিবারিক সংস্কার', মাঘ ১২৮২।
———। 'বঙ্গীয় মহিলা', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩।
———। 'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার', শ্রাবণ ১২৮২।
———। 'বর্তমান সমাজ', পৌষ ১২৮৩।
———। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা', চৈত্র ১২৮৩।
———। 'স্ত্রীশিক্ষা', ভাদ্র ১২৮২।

বান্ধব

'বিবি আর বৌ', অগ্রহায়ণ ১২৮১।
'সুশিক্ষিতার ভ্রম', আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮২।

বামাবোধিনী পত্রিকা

'অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা', পৌষ ১২৭২।
'অবগুণ্ঠন', মাঘ ১২৭৩।
'অবরোধ প্রথার উৎপত্তি', শ্রাবণ ১২৯৮।
'অবলাবান্ধব', আষাঢ় ১২৭৮।
'অভিনয়', ফাল্গুন ১২৭৩।
'অলঙ্কার পরিধান', আষাঢ় ১২৭২।
'আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা', শ্রাবণ ১২৮১।
'ইংরেজী শিক্ষা ও জাতিভেদ', বৈশাখ ১৩০৬।
'উন্নতি শ্রাবণ', ১২৭১।
'একজাতিত্ব', বৈশাখ ১৩০৫।
'এদেশে বামাগণের বহির্ভ্রমণ', আশ্বিন ১২৭৮।
'নববর্ষ', বৈশাখ ১৩১০।
'নব্য বঙ্গমহিলা', ফাল্গুন ১২৭৯।
'নব্য বঙ্গমহিলা', আশ্বিন ১২৮১।
'নরনারী', ফাল্গুন ১২৭৯।
'নারীদিগের কোমলতা', কার্তিক ১২৭৮।

'পত্রোত্তর', বৈশাখ ১২৯৮।
'পুনর্বিবাহ বিষয়ক কথোপকথন', কার্তিক ১২৭২।
'বঙ্গমহিলা—মানসিক', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৬।
'বঙ্গসমাজ ও সংসারের উন্নতিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা', আষাঢ় ১২৮৮।
'বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা', বৈশাখ ১৩১০।
'বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মানসূচক উপাধি', আশ্বিন ১২৮০।
'বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি', অগ্রহায়ণ ১২৮০।
'বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার পরিচ্ছদ', কার্তিক ১৩০৮।
'বামাকুলোন্নতি বিভাগ', বৈশাখ ১২৮০।
'বামাবোধিনী-র তৃতীয় সম্বাৎসরিক জন্মোৎসব', ভাদ্র ১২৭৩।
'বামাহিতৈষিণী সভার সম্বাৎসরিক উৎসব', বৈশাখ ১২৭৯।
'বারবার স্ত্রী ও স্বামী গ্রহণ', আষাঢ় ১২৮১।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। 'উন্নতি ও স্বাধীনতা', আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৭৮।
'বিবাহ ব্যয়', বৈশাখ ১৩১০।
'ব্রাহ্মিকাগণ কর্তৃক মিস মেরী কার্পেন্টারের অভ্যর্থনা', অগ্রহায়ণ ১২৭৩।
'ভারতের দু:খিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে', ফাল্গুন ১২৯৭।
'মিস এক্রয়েড', মাঘ ১২৭৯।
'মেয়ের আদর', আশ্বিন ১৩০২।
'মেয়েছেলের এত অনাদর কেন?', মাঘ ১২৭০।
'লজ্জা', অগ্রহায়ণ ১২৭২।
'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক', জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।
'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সম্বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ', চৈত্র ১২৭৮।
'শিক্ষিতা মহিলার দায়িত্ব', বৈশাখ ১৩১০।
'শিশুদিগের আহার', বৈশাখ ১২৭৩।
'শিশুদিগের পরিচ্ছদ', চৈত্র ১২৭১।
'সন্তান রক্ষা', ফাল্গুন ১২৭২।
'——', অগ্রহায়ণ ১২৭৩।
'সময়', কার্তিক ১২৭১।
'সহধর্মিণী', শ্রাবণ ১৩০৭।
'সৌন্দর্য,' বৈশাখ ১২৭৫।
'স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু বিশেষোহস্তি কশ্চন', মাঘ ১২৭৩।

'স্ত্রী ও পুরুষজাতির সম্বন্ধ', বৈশাখ ১৩৮১।
'স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান?', আষাঢ় ১২৯৯।
'স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ', আশ্বিন ১২৭১।
'স্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি', জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।
'স্ত্রীদিগের কর্তব্য', মাঘ ১২৭২।
'স্ত্রী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা', পৌষ ১২৭১।
'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা', ভাদ্র ১২৭০।
'স্ত্রীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম', আষাঢ় ১২৭৮।
'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা', শ্রাবণ ১২৭৯।
'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন', কার্তিক ১২৭১।
'স্ত্রীশিক্ষা', অগ্রহায়ণ ১২৯৯।
'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা', অগ্রহায়ণ ১২৯৪।
'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা', শ্রাবণ ১২৭৪।
'স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল', পৌষ ১২৮২।
'স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দান', মাঘ ১২৮২।
'স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব', ফাল্গুন ১২৭৬।
'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা সভা', ভাদ্র ১৩০৪।

ভারতী

ইন্দিরা দেবী। 'বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা বিচার', শ্রাবণ ১৩১৯।
সরলা দেবী। 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল', চৈত্র ১৩২৪।
'সাত বছরের সখী সমিতি', আশ্বিন ১৩১৫।

ভারতবর্ষ

'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন', অগ্রহায়ণ ১৩৫০।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্ত্রীশিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। মাঘ ১৩৩৬।

ভারতসুহৃদ

'আমাদের অভাব', শ্রাবণ ১২৮৩।
'শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক স্বেচ্ছাচার', আষাঢ় ১২৮৩।
'সমাজতত্ত্ব: বিবাহ', আষাঢ়, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১২৮৩।
'স্ত্রীশিক্ষা', অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও মনের অসুখ', ১৮৬০।

মধ্যস্থ

মনোমোহন বসু। 'চুক্তি বা মুক্তি বিবাহ', ফাল্গুন ১২৮১।
——। 'প্রণয়রোগ', ২০ শ্রাবণ ১২৭৯।
——। 'বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়', ১৪ ভাদ্র ১২৮৩।

সমদর্শী

'জ্ঞান ও ধর্ম', আশ্বিন ১২৮২।
'বঙ্গীয় ও সার্বভৌমিক ব্রাহ্ম', জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

হিতসাধক

প্যারীচরণ সরকার। 'অসুর বিবাহ: কন্যাপণ', ফাল্গুন ১২৭৪।
——। 'আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা', চৈত্র ১২৭৪।
——। 'বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা', শ্রাবণ ১২৭৫।
——। 'সামাজিক শাসন', ফাল্গুন ১২৭৪।

Bengal Magazine

A Hindustani. 'Civilization Confined to One Sex', Vol. IV (June, 1876).
'A Hindu Family', Vols. VII-VIII (1879–80).
'The Influence of Women in Hindu Society', Vol. VIII (1879).
'Women's Right Questioned', Vol. IX (Jan., 1880).

Brahmo Public Opinion

'Banga Mahila Bidyalaya', 25 Dec., 1879.
'Equality of Sexes', 15 Jan., 1880.
'Female Education', 30 Jan., 1879.
'Personal Recollections of Women's Education', 4 Sept., 1879.
'What We Have Done for Our Women', 28 Aug., 1879.

Calcutta Review

'The Brahmo Samaj and the Native Marriage Act', Vol. LIV, No. 108 (1872).

চ. প্রকাশিত চিঠিপত্র

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলকাতা, ১৯০৯।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ইন্দিরা দেবীর এবং ইন্দিরা দেবীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী: দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮০।

মাধুরীলতার চিঠি, পূ. চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭।

মৃণালিনী দেবী, জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী: চিঠিপত্র, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৭-৬৬।

প্রিয়নাথ সেন ও শরৎকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ: দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮০।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী: পুরাতনী, ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭।

ছ. জীবনী ও আত্মজীবনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘরোয়া। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৪৪।

অশ্রুকণা রচয়িত্রী: গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭।

আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। নারীচরিত। ময়মনসিংহ: বিজ্ঞাপনী প্রেস, ১৮৬৬।

আলো ও ছায়া রচয়িত্রী: কামিনী দেবী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।

ইন্দিরা দেবী। 'জ্ঞানদানন্দিনী দেবী', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮।

'কামিনী রায়', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

কামিনী রায়। 'ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন', বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৯।

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। আত্মজীবনচরিত। নতুন সং। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যা. পা., ১৯৫৬।

কুমুদিনী উপাখ্যান। কলকাতা, ১৮৭২। (বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅমে রক্ষিত কপিতে অন্যান্য তথ্য নেই।)

কুমুদিনী চরিত। কলকাতা, ১৮৬৭। (বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅমে রক্ষিত কপিতে প্রকাশনা অন্যান্য তথ্য অনুপস্থিত।)

'কুমুদিনী জীবনী', বামাপ, বৈশাখ ১২৭৫।

কুমুদিনী মিত্র। মেরী কার্পেণ্টার। কলকাতা, ১৯০৬।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত। কলকাতা : বাসন্তী চক্রবর্তী, ১৯৩৭।
'কৃষ্ণভাবিনী দাস', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯।
গৌরগোবিন্দ রায়। আচার্য কেশবচন্দ্র, তিন খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৩৮।
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'স্মৃতিকথা', ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত পুরাতনী গ্রন্থে সংকলিত। কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। কলকাতা : শিশির পাবলিশিং, ১৯২০।
'তরুদত্ত', ভারতী, কার্তিক ১৩১৭।
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি। জীবনালেখ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : ১৮৭৯। (প্রকাশকের উল্লেখ নেই।)
নবকৃষ্ণ ঘোষ। প্যারীচরণ সরকার। কলকাতা : সাহিত্য সেবক সমিতি, ১৯০২।
'নিস্তারিণী', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।
পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ছেলেবেলার দিনগুলি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট; ১৯৭৫।
প্রভাত বসু। মহারাণী সুচারুদেবীর জীবন-কাহিনী। কলকাতা . লেখক, ১৯৬২।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড। চতুর্থ সং; দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭১, ১৯৬১।
'বনলতা-রচয়িত্রী : প্রসন্নময়ী দেবী', ভারতী. কার্তিক ১৩১৬।
(রামসদয় ভট্টাচার্য)। বামাচরিত। কলকাতা : কাব্য প্রকাশ প্রেস, ১৮৬৫।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত ঘটনা। কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৮২।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৯।
—————। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমার চৌধরানী। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১।
—————। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫।
—————। কামিনী রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৪।
—————। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২।

———। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২।
———। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২।
———। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০।
———। মানকুমারী বসু। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২।
———। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০।
ব্রাহ্মময়ী চরিত (জি. সি. সেন)। কলকাতা, ১৯০৩।
'ভক্ত প্রকাশচন্দ্র', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯।
মন্মথনাথ ঘোষ। 'উমেশচন্দ্র' (ব্যানার্জি), ভারতবর্ষ, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, ১৩৫০।
———। কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র। আদিব্রাহ্ম সমাজ, ১৯২৭।
মহিলাবলী। কলকাতা: মদিয়ানী মিত্র প্রেস, ১৮৬৭।
মহেন্দ্রনাথ রায়। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত। কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১৮৮৪।
'মানকুমারী বসু', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২।
'যামিনী সেন', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৯।
যোগেশচন্দ্র বাগল। উমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৩।
———। রাজনারায়ণ বসু। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৫।
রাখালচন্দ্র রায়। জীবনবিন্দু। কলকাতা, ১৮৭৯।
রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। কলকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৯।
রাসসুন্দরী দেবী। আমার জীবন। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: শরসীলাল সরকার, ১৮৯৮। প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫।
'রেণু-রচয়িত্রী: প্রিয়ম্বদা দেবী', ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭।
লক্ষ্মীমণী চরিত। ঢাকা: গিরিশ প্রেস, ১৮৭৯।
শিবনাথ শাস্ত্রী। আত্মচরিত। প্রথম সিগনেট সংস্করণ। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৯৫২।

——। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলকাতা: এস.কে. লাহিড়ী, ১৯০৪।
'শুভবিবাহ-রচয়িত্রী: শরৎকুমারী চৌধুরানী', ভারতী: অগ্রহায়ণ ১৩১৬।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার বাল্য কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: ট্যাগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬৭।
সুব্রত রুদ্র। কাদম্বরী দেবী। কলকাতা: আশা প্রকাশনী, তারিখ নেই।
সরলা দেবী চৌধুরানী। জীবনের ঝরাপাতা। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮।
——। 'হিরন্ময়ী দেবী' ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২।
সুশীল রায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩।
সৌদামিনী সিংহ। নারীচরিত। কলকাতা: কাব্য প্রকাশ প্রেস, ১৮৬৫।
'স্বর্গীয়া কামিনী রায়', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।
হেমলতা দেবী। 'নারীজগতে কৃষ্ণভাবিনীর স্থান,' প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।
——। 'স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস,' প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৫।
হেমলতা সরকার। 'স্বর্গীয়া ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন,' প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৮।
Banerji, Sir A. R. *An Indian Pathfinder: Memories of Sevabrata Sasipada Banerji*. 2nd ed. Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1973.
Beveridge, W. H. *India Called Them*, London: George Allen & Unwin, 1942.
Chakrabarti, D. *Sasipada Banerji: A Study in the Nature of the First Contact of the Bengal Bhadralok with Working Class of Bengal*. Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences, 1975.
Chaudhuri, N. C. *Autobiography of an Unknown Indian*. 6th Jaico . Impression. Bomby: Jaico, 1976.
Collet, S. D. *The life and Letters of Raja Rammahan Roy*. 3rd ed. Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1962.
Das, A. *Life and Letters of Toru Dutt*. Oxford: Oxford University Press, 1921.
Joardar, H. & S. *Begum Rakeyu: The Emancipator*. Dacca: N. K. Sangstha, 1980.
Kling, B. B. *Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*. Berkely: University of California Press., 1976.
Mazoomdar, P. C. *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*. Calcutta: Baptist Mission Press, 1887.

Mukherji, N. *A Bengal Zamindar : Jaykrisna Mukherji of Uttarpara and His Times*. Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1974.

Nethercot, A. H. *The First Five Lives of Annie Besant*. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1960.

Pal, B. C. *Memories of My Life and Times*. Vol. 1 Calcutta : Modern Book Agency, 1932.

Rule, P. *The Persuit of Progress : R.C. Dutt*. Calcutta : Editions Indian, 1977.

Sanyal, R. G. *A general Biography of Bengal Celebrities both Living and Dead*. Reprint. Calcutta : Riddhi, 1976. First published in 1889.

Sarala Ray Birth Centenary Volume. Calcutta : Sarala Ray Birth Centenary Committee, 1961.

Shaista S. IKramullah, Begum. *From Purdah to Parliament*. London : Crescent Press, 1963.

Sudha Mazumdar. *A Pattern of life : The Memories of an Indian Women*. Delhi : Manohar, 1977.

Tattvabhushan, S. N. *Autobiography* Calcutta : Brahmo Mission Press, n.d.

জ. অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনা

অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্মনীতি। কলকাতা : সুচারু প্রেস, ১৮৫৬।

অজ্ঞাত। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, দুই খণ্ড। কলকাতা : বাল্মীকি প্রেস, ১৮৭৬-৭৭।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচু ঠাকুর, দুই খণ্ড। কলকাতা : বঙ্গবাসী প্রেস ১৮৮৪।

ঈশ্বর গুপ্ত। কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা : জি. সি. চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৫।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা : মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৬১।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল। নিউ ব্যারাকপুর : যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৭৪।

কালীপ্রসন্ন সিংহ। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব। কলকাতা : কাব্যপ্রকাশ প্রেস, ১৮৬৯।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। কলকাতা: এলগিন প্রেস, ১৯০০।

গোলাম মুরশিদ। 'ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ: বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা,' জিজ্ঞাসা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৭)।

———। 'তাহেরননেসা: প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা,' বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় ১৩৮৩-৮৪।

———। 'বঙ্গদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত: কৃষ্ণভাবিনী দাস,' জিজ্ঞাসা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৯)।

———। রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।

চিত্রাদেব। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। দীপ্তি। কলকাতা: নব্যভারত প্রেস, ১৯০১।

———। সোপান, প্রথম খণ্ড। কলকাতা, ১৮৭৯।

নারীশিক্ষা, দুই খণ্ড। কলকাতা: বামাবোধিনী সভা, ১৮৬৮।

নীহাররঞ্জন রায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: বুক এম্পোরিয়াম, ১৯৫২।

প্যারীচাঁদ মিত্র। আধ্যাত্মিকা। কলকাতা: আই.সি.বসু অ্যাণ্ড কোং, ১৮৮০।

———। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত প্যারীচাঁদ রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা: কথাকলি, ১৯৬৮।

———। রামারঞ্জিকা। কলকাতা: ডিরোজরিও, ১৮৬০।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নারীজাগরণ। কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৪৬।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমরচনাবলী, প্রথম খণ্ড। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৮।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে নারী। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫১।

———। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১।

———। বাংলা সাময়িক পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫২।

———। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫১।

মনুসংহিতা। ভরতচন্দ্র শিরোমণি অনূদিত ও সম্পাদিত। কলকাতা: অরুণোদয় ঘোষ, ১৮৬৬।

মনোমোহন বসু। হিন্দু আচার-ব্যবহার, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মধ্যস্থ প্রেস, ১৮৭৩।

যোগেশচন্দ্র বাগল। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৪।

———। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। কলকাতা: মৈত্রী, ১৯৬৮।

রাজকুমার চন্দ্র। দেখেশুনে আক্কেল গুড়ুম। কলকাতা: লেখক, ১৮৬৩।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৩।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বোম্বাই চিত্র। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৮৯।

Ahmed, A. F. S. *Social Ideas and Social Change in Bengal*. Leiden: E.J. Brill, 1965.

Aime-Martin. *The Education of Mothers of Families or, The Civilization of the Human Race by Women*. London: Whittaker & Co., 1842.

Altekar, A.S. *The Position of Women in Hindu Civilization*. 2nd ed. Delhi: Banarsidass, 1956.

Barr, P. *The Memsahibs*. London: Secker Warburg, 1976.

Baumer, R. V. M. (ed.). *Aspects of Bengali History and Society*. Hawaii: The Univ. Press of Hawaii, 1974.

Bethune College Centenary Volume, ed. by K. Nag and L. Ghosh. Calcutta: Govt. of West Bengal, 1951.

Broyelle, C. *Women's Liberation in China*. Atlantic Highlands. Humanities Press, 1977.

Bullough, V.L. *The Subordinate Sex*. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1973.

Cadbury, E., etc. *Women's Work and Wages*. London: T. Fisher Unwin, 1906.

Calcutta University. *Hundred Years of the University of Calcutta*. Calcutta, 1957.

Carpenter, M. *Six Months in India*, 2 vols. London: Green & Co., 1868.

Chakrabarty, U. *Condition of Bengali Women Around the Second Half of the Nineteenth Century*. Calcutta: Author, 1963.

Collet, S.D. *The Brahmo Year Book, 1876.* London : Williams and Norgate, 1876.

Craine, R.I. (ed.). *Transition in South Asia : Problems of Modernization.* Dukin Univ., 1970.

Datta Gupta, B. *Sociology of India* Calcutta : Centre for Sociological Research, 1972.

de Souza, A. *Women in Contemporary India.* Delhi : Manohar, 1975.

Dutt, S. C. *India, Past and Present.* London : Chatto and Windus, 1880.

Evans, R. J. *The Feminists : Women's Emancipation Movements* etc. London : Croom Helm, 1977.

Ghose, L. *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.*, pt. 2. Calcutta : Presidency Press, 1881.

Gupta, A. (ed.). *Studies in the Bengal Renaissance.* Jadavpur : National Council of Education, 1958.

Gupta, A B. *Women in Hindu Society.* New Delhi : Jyotsna Prakashan, 1976.

International Congress on Women *Women in Profession,* Vol. 1. London : T. Fisher Unwin, 1900.

Jain, D. (ed.). *Indian Women.* New Delhi : Govt. of India, 1975.

Jansen, M. B. (ed). *Changing Japanese Attitudes Towards Modernism.* Princeton : Univ. Press, 1965.

Kerr, J *Domestic Life, Character and Customs of the Natives of India* London : W H. Allen & Co., 1865.

Kopf, D. *British Orientalism and the Bengal Renaissance.* Berkeley : Univ. of California Press, 1969.

——. *The Brahmo Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind.* Princeton : Univ. Press 1979.

Liard, M A. *Missonaries and Education in Bengal.* London : Oxford U. Press, 1972.

Lipshitz, S. (ed). *Tearing the Veil.* London : Routledge & K. Paul, 1978.

Majumdar, B.B. *Heroines of Tagore.* Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1968.

Mill, J. *The History of British India* Vol. 1. 2nd ed. London : Baldwin Cradock, and Jay, 1820.

Misra, B.B. *The Indian Middle Classes.* London: Oxford U. Press, 1961.

O'Neill, W.L. *The Women Movement.* London: George Allen and Unwin., 1969.

Oakley, A. *House Wife.* London: Allen Lane, 1974.

Parks, F. *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque during four-and-twenty years in the East with Revelations of Life in Zenana.* Vol. 1, London: Pelham Richardson, 1850.

Pratima, A. *Women's Movement in India.* Delhi: Vikas Publishing House, 1974.

Philips, H. A. D. *Our Administration in India with Special Reference to the Work and Duties of a District Officer in Bengal.* London: W. Thacker & Co., 1886.

Ray, S.N. 'Variations on the Theme of Individuality: Hinduism, the Bengal Renaissance and Rabindranath Tagore'. *Visva-bharati Quarterly.* Vol. 41, Nos. 1-4 (1975-76).

Ross, A. D. *The Hindu Family in the Urban Setting.* Toronto: Univ. of Toronto Press, 1967.

Rover, C. *Love, Morals and the Feminists.* London: Routledge & K. Paul, 1970.

Roy, M. *Bengali Women.* Chicago Univ. Press, 1975.

——, *The English works of Raja Rammohan Roy,* 2 vols., ed. by J. C. Ghose. Calcutta: S. Ray, 1901.

Sastri, S. *History of the Brahmo Samaj.* 2nd ed. Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj, 1974.

Sen Gupta, S. *A Study of Women of Bengal.* Calcutta: Indian Publications, 1970.

Sinha, P. *Nineteenth Century Bengal: Aspects of Social History.* Calcutta: Firma K.L. Mukhapadhyay, 1965.

Status of women in India. New Delhi: Indian Council of Social Science Research, 1975.

Stenton, D. M. *The English Women in History.* London: George Allen and Unwin, 1957.

Strachy, R. *The Cause.* New York: Kennikat Press, 1969. (First published in 1928).

Thompson, W. *Appeal of One Half the Human Race Women against the Other Half Men* etc. New York: Burt Franklin, 1970. (First published in 1825).

Urquhart, M. M. *Women in Bengal.* London : Y.M.C.A., 1925.

Verma. H.N.A. *Indian Women Through the Ages.* New Delhi: Great Indian Publishers, 1976.

Weiner, M. (ed.). *Modernization: The Dynamics of Growth.* 2nd Print. New York: Basic Books Inc., 1966.

Women in Modern India, ed. by E.C. Gedge and M. Choski. Bombay: Taraporewala, 1929.

ঝ. অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

গোলাম মুরশিদ। 'হিন্দু সমাজসংস্কার সচেতনতার ইতিহাস ও বাংলা নাট্য রচনায় তার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭। (এই অভিসন্দর্ভের ওপর ভিত্তি করে রচিত সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।)

নির্ঘণ্ট